সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

কলিকাতা
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি

শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

করকমলে

সূচীপত্র

নিবেদন

শিক্ষানীতি ও শিক্ষারীতি সম্পর্কে এ যাবৎ বহু মনীষী বহু মতবাদের সৃষ্টি করেছেন। তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনার অবসর চিরদিনই থাকবে। দেশ ও পাত্রভেদে এই আলোচনার ক্ষেত্র কালের গতিতে নতুন নতুন দিকে প্রবাহিত হতে বাধ্য। আমাদের দেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিক্ষাভাবনা কোন্ পথে চালিত হওয়া উচিত—এ বিষয়ে সামান্য যা চিন্তা করেছি, বর্তমান পুস্তকে তা নিবদ্ধ করা গেল।

শিক্ষাসমস্যা বস্তুতঃ মানুষ গড়ারই সমস্যা। আর আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার দেশে তা হয়ে দাঁড়ায় নতুন-মানুষ গড়ার সমস্যা। বিদেশীর হাতে যখন দেশ শাসনের ভার ছিল তখন বহু দিক দিয়ে আমরা ছিলাম দায়মুক্ত, আর আজ দায়িত্বের আমাদের অন্ত নেই। সেই দায়ভার গ্রহণ ও বহন করবার জন্যে দেশের নরনারীর শিক্ষা হওয়া চাই সর্বাঙ্গীণ। আর, সে ব্যবস্থা যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল।

শিক্ষার সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রসঙ্গও এসে পড়েছে এই বইতে অনেক স্থলে। তার কারণ এর প্রত্যেকটি বিষয় পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সমাজের আদর্শ কী হবে, সেই অনুসারে শিক্ষারও প্রণালী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং আবার শিক্ষার ফলেই সমাজের আদর্শ ব্যক্তির মধ্য দিয়ে বাস্তব রূপ গ্রহণ করে—এ দুইই সত্য। সমাজের দু'চার জনের নয়, সকলেরই ব্যক্তিগত উদয় বা বিকাশ হয়েছে আজকের আমাদের সমাজবাদী রাষ্ট্রেরও লক্ষ্য; তেমনি শুধু পুঁথিগত লেখাপড়াই নয়, তারসঙ্গে আরো দশটা বিষয় আছে,—সবদিক দিয়ে পরিমাণ মতো তাদের সুষ্ঠু চর্চা হওয়াই প্রকৃত শিক্ষা এবং সেই শিক্ষার যাচাই হবে পরিণতির ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীর মধ্যে 'পরিপূর্ণ দৃষ্টি'-র উন্মেষ দ্বারা ; এইরূপ সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার দরকার এখন 'সর্বোদয়'-সমাজের মানুষ গড়বার জন্য,—মোটের উপর, এই কথা ক'টিই বলতে চেয়েছি নানা প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে।

সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার আলোচনার অনুষঙ্গরূপে কোনো একটা বিশেষ কর্মসূচীর কাঠামো নির্দেশ ক'রে দেওয়া অথবা পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ক'রে দেবার চেষ্টা বর্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়,—ঐরূপ শিক্ষাবিষয়ে আলোচনা জাগিয়ে তোলা আর সেই চিন্তারই আবহাওয়া-বিস্তারের কিছু সহায়তা করা, এটুকু করতে পারলেই যথেষ্ট মনে করব।

সর্বাঙ্গীণ-শিক্ষার অন্তর্গত সব-কিছু বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা এতে নেই। তা পরবর্তী প্রয়াসের বিষয়। যে ক'টি বিষয়ে আশু বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার, সে ক'টি বিষয় নিয়েই অধ্যায়গুলি রচিত হয়েছে। প্রসঙ্গগুলি তিন-চার বছর আগেকার লেখা। এর মধ্যে অনেক প্রস্তাব আছে, এতদিনে যা আর কথার স্তরে নেই, সে বিষয়ে কাজ চলছে। যেমন, জনশিক্ষা ও লাইব্রেরির বিস্তার, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সর্বার্থসাধক পরিকল্পনায় খেলাধুলা, ব্যায়াম, চিত্রাঙ্কণ, সঙ্গীত, বিজ্ঞান ও বিভিন্ন হাতের কাজ,—এমনকি, সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যেও সমাজসেবার চর্চা, অন্যদিকে কারাজীবন সংস্কার –প্রভৃতি চালু হতে দেখা যাচ্ছে। জাতীয় সরকার এবং জনসাধারণ এজন্য ধন্যবাদার্হ। সরকারী এবং বেসরকারী দুই মহলই মিলেমিশে কাজ করলে সামনে যে অভীষ্ট পথে আমরা এগোতে পারব,—এটি খুবই আশা করা যেতে পারে।

স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীনতার ব্যবহার আমরা সম্যকরূপে করতে আরম্ভ করিনি। সে জন্যে যে নৈরাশ্য ও অধৈর্যের বোধ মনকে তখন পীড়িত করতো তার কিছু পরিচয় এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদেই আছে। আজকের দিনে (১৯৫৬) লিখতে বসলে অতটা অসন্তোষ প্রকাশ পেত না,– কিন্তু প্রতীকার আর এখন হবার নয়। বইটি প্রকাশ করতে নানা কারণে এত সময় অতিবাহিত হয়েছে যে, পরিবর্তন ও পরিবর্জনের জন্য আর ধ'রে রাখা সম্ভব নয়। এই জন্যেই আরও দু'এক স্থলে কিছু অদল-বদল করবার ইচ্ছা থাকলেও তা করা গেল না। "পরিবেশবাদ ও প্যাবলব" প্রসঙ্গে জীবনমানস ও আচরণের উপর বস্তুর প্রভাবের কথায় একটু বেশি জোর পড়েছে। মনে হতে পারে যে, লেখক সম্পূর্ণভাবে ঐ বস্তুবাদী মতেরই সমর্থক। জীবের ব্যক্তিধর্ম ও উত্তরাধিকার, তার অবয়ব ও মনের গঠনে কম কাজ করে না– বিজ্ঞানীরা চিরদিনই প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে তা নির্দেশ করে আসছেন। উত্তরাধিকারের উপর কোনো হাত নেই কিন্তু নিয়ন্ত্রণ বহুল পরিমাণে সম্ভব ব'লেই শিক্ষার ক্ষেত্রে তার বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তার স্বাভাবিক প্রবণতা শুভকর্মে নিয়োজিত ক'রে পরিবেশ সৃষ্টি দ্বারা মানুষের চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, আধুনিক বিজ্ঞান এই কথারই সাক্ষ্য দেয়।

বইখানির প্রকাশ থেকে ভালোই হোক আর মন্দই হোক, এর জন্যে প্রথমে স্মরণীয় আমার কাছে নেপথ্যগত শ্রীযুক্ত অনিলমোহন গুপ্ত, তার পরে প্রকাশক শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। অনিলবাবুর প্রস্তাবমতো প্রহ্লাদবাবু আমাকে

তাঁর 'শিক্ষাব্রতী' পত্রিকায় রচনা দেবার জন্য লেখেন। সেই যোগাযোগের অন্যতম পরিণতি এই গ্রন্থ। 'শিক্ষাব্রতী'তে 'জনসংস্কৃতি' (এ গ্রন্থের 'জনসমাজ') প্রবন্ধটি প'ড়ে যিনি অযাচিতভাবে একখানি স্নেহমধুর পত্র দিয়ে আমাকে উৎসাহিত ও ধন্য করেছিলেন, ভারতের প্রখ্যাত সেই শিক্ষাবিদ্ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসুর কথা আজ স্বতই মনে জাগছে। প্রকাশক মহাশয়ের কাছে শুনেছি, ঐ স্তরের আরো কোনো কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি লেখাটিকে ভালো বলেছিলেন। পাণ্ডুলিপি প'ড়ে নানা প্রস্তাব ও পরামর্শ দ্বারা সাহায্য করেন শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত সুধেন্দু দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দেব, শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র দত্ত এবং শেষদিকের দুটি রচনা পরিমার্জিত ক'রে দেন শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত; শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু, শ্রীযুক্ত নিমাই চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নিকট নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। যুগান্তর, গল্পভারতী, লোকসেবক, শিক্ষাব্রতী প্রভৃতি পত্রিকায় কোনো কোনো রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সহৃদয় সম্পাদকগণের নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞ আছি। ইতি—

শান্তিনিকেতন
২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর।

1663

সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা

স্বাধীনতার পরে

বলা হয়ে থাকে "স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার"; কিন্তু এ হল ভাবের কথা, আদর্শের কথা। বাস্তবে যা সত্য, সে কথাটি হচ্ছে—"স্বাধীনতা মানুষের কর্মগত অধিকার।" অন্তত, এই কথাটিই আমাদের এখনকার শ্লোগান হওয়া উচিত। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি নামে, কার্যত কে কতটা স্বাধীন হয়েছি, অন্য কারোর স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার স্বীকার করেছি বা ক'জনে? বড় বড় সব চাকরির ঘাঁটিগুলি দখলে এসেছে, এই যদি একটা অধিকার হয়ে থাকে, তবে বলতে হবে বিদেশীর বদলে দেশীয় আমলাতন্ত্র হয়েছে,—এইমাত্র তফাৎ। প্ল্যান নিজেরা করছি, কিন্তু তার পিছনের দিকটায় উঁকি মেরে যা দেখা যায়, সেখানে পরবশ্যতার ছাপ অস্পষ্ট নয়। যন্ত্রপাতি, মালমশলা, কারিগর, বিশেষত তাগাতাবিজের ভারেই নবজাতক শিশু স্বাধীনতার প্রাণ ওষ্ঠাগত। চালচলনে, শিক্ষাসহবতে? বিদেশী চালের ভাত আমাদের হাঁড়িতে আগে এমন বাড়েনি, যত বেড়েছে স্বাধীনতার পরে থেকে। দু'শ বছরের শিক্ষা সত্যই এবারে পুরোনো হয়ে কাজ দিচ্ছে। ঘাটেপথে দেখেশুনে এটাই কেবল মনে হয়, স্বাধীনতাকে চেয়েছিলাম আমরা, যেন নেক্-টাইটাকে টাইট্ ক'রে বাঁধবার জন্যই। সাহেবদের সরাতে চেয়েছি শুধু একটু স্বস্তি পাবার জন্য, কারণ, ওরা সামনে থাকতে, এত বেপরোয়া হতে কোথাও হয়তো অশিক্ষিত পটুত্বে বাধা ছিল। আগে পরের ইচ্ছায়, পরের কাজে বিদেশী বনতে হত, এখন স্বেচ্ছায় সেটা হতে পারছি,—জন্মগত অধিকারের এই দিকটা কায়েম হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাইরে থেকে পরের চোখে এটা পরাধীনতার পচা সংস্করণ বলে ঠেকছে কিনা, সেটা কি একবার ভেবে দেখা ভালো নয়?

মাটি খুঁড়ে বার করছি আমরা মানুষের অস্থি, তাকে ঢাকে ঢোলে সিংহাসনে বসিয়ে পাড়া প্রদক্ষিণে আমাদের উৎসাহের অন্ত নেই। টাকা-পয়সায় লাগাচ্ছি দেশের মহাপুরুষদের মূর্তি শীলমোহর; কিন্তু জ্যান্ত মানুষগুলি যে পথে-ঘাটে অনাহারে অসম্মানে ছটফটিয়ে মরছে, তাদের মানুষের মতো বাঁচিয়ে রাখবার

জন্য সে-পরিমাণে উৎসাহ জাগছে কি? না, সেই মানুষগুলোকেও দলে বেঁধে নিয়ে তাদের জোরে মানুষ মারারই স্বাধীনতাকে আরো ফলাও করে তুলছি। স্বাধীনতার কথা যারা চিন্তা করে গেছেন, তাঁরা কিন্তু বলেছেন, "গণদেবতার পূজা সকল পূজার আরম্ভে, আমাদের শাস্ত্রে বলে। স্বদেশসেবায় এই প্রথম পূজার পদ্ধতি হচ্ছে এমন সকল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যাতে জনগণ সুস্থ হয়, সবল হয়, শিক্ষিত হয়, আনন্দিত হয়, আত্মসম্মানে দীক্ষিত হয়, সুন্দরকে নির্মলকে আবাহন করে আনে আপন প্রাত্যহিক জীবিকার ক্ষেত্রে, এবং যাতে আত্মরক্ষায় আত্মকল্যাণ সাধনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে সকলে সম্মিলিত হতে পারে। আমার সামান্য শক্তিতে ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে এই কাজে মন দিয়েছি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে। আমি জানি, দেশকে পাওয়া বলতে বোঝায় তাকে তার পরিপূর্ণতার মধ্যে পাওয়া। দেশের যথার্থ স্বাধীনতা হচ্ছে তা-ই যাতে তার সমস্ত অবরুদ্ধ শক্তি মুক্তিলাভ করে।" দেশের ঋষি, কবি এবং মনীষী রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন এই কথা।—চাই "সমস্ত অবরুদ্ধ শক্তির মুক্তি।" তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, "সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের কথা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার অভাব আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে—তখন দেশের জনসংঘের এই চিত্তদৈন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে এ দেশে স্বরাজ কায়েম হতে পারে, এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। ইংরাজিতে একটা কথা আছে, 'সিদ্ধিই সিদ্ধিকে টানে'; 'তেমনি স্বরাজই স্বরাজকে আবাহন করে আনে'।" কবির শেষ কথাটি বিশেষ করেই লক্ষ্য করবার বিষয়। তিনি বলছেন, "স্বরাজই স্বরাজকে আবাহন করে আনে।" সুতরাং, স্বরাজ ভিতরে থেকে পাওয়ার জিনিস। ভিতরে স্বরাজ পেলে, বাইরে তার প্রকাশ বিচিত্রভাবে আপনি প্রকাশ পাবে। সেই ভিতরের স্বরাজ আমাদের চিন্তায় আগে আসা চাই। একদিন যেটুকু এসেছিল, তার প্রভাবই প্রকাশ পেয়েছে, সশস্ত্র স্বদেশী আন্দোলনে, পেয়েছে অহিংস সত্যাগ্রহে। কিন্তু তখনো যে-পরিমাণে সে প্রেরণা বহির্মুখী আড়ম্বরে ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল, সেইদিক দিয়ে আমাদের সতর্ক করে চলেছিলেন দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। পজিটিভ দিকে তিনি মাত্র এইটুকুই চেয়েছিলেন যে,—"যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-উপার্জনে আনন্দ-বিধানে সম্মিলিত হয়েছে,

সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজ লাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে। তারপরে একটা দীপের থেকে আর-একটা দীপের শিক্ষা জালানো কঠিন হবে না; স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্র বৃদ্ধির পথে।" —স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি মাত্র গ্রামই ছিল কবির প্রথম লক্ষ্য। কিন্তু গান্ধীবাদের বিশ্ব-পরিবেশকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আজো কি আমরা গ্রামোন্নয়নে যথোচিত দৃষ্টি দিয়েছি? পরিকল্পনায় উৎসাহ প্রকাশ পেয়েছে বরং শহরেরই সংগঠনে। মানে কলকারখানায় বা মাল উৎপাদনে এমন ছক বাঁধা চাই, যাতে গ্রামের লোক বৃত্তিহারা হয়ে শহরের কাঁচা পয়সা লুটতে আরো প্রলুব্ধ হয়ে, উড়ে আসে পতঙ্গের মতো শহরের বাজারে। মনোভাব কি এই যে, "মারি মারব আমাদের আমরাই, হাতের সুখ বিদেশীকে করতে দেব কেন?" নয় তো, কৃষক আর তাঁতীকে ভাতে মারা, আঙুল কাটা এবং ভিটে ছাড়ার যে নজির তুলে একদিন আমরা বিদেশী রাষ্ট্রশাসনের বিরুদ্ধে লোককে উস্‌কিয়েছি,—আজ আমাদের কার্যপ্রণালীতে গ্রামের সাধারণকে বেকার করার আশঙ্কা সৃষ্টি করতে দ্বিধা দেখা যায় না কেন?

স্বাধীনতার প্রকৃষ্ট যাচাই হয় তখনই, যখন নিজের মতো করে অন্যের স্বাধীনতাকেও শ্রদ্ধা করা যায়, তাকে স্বীকার করা যায় সম-উৎসাহে প্রতিকার্যে। সেই প্রেরণা ভিতরে জাগানোই হচ্ছে স্বাধীনতার মূল কাজ। আমরা অনেক মাথা ঘামিয়ে থাকি, কাগজ-পত্র অনেক ব্যয় করি, কত উপায় উপকরণ নিয়ে আমরা নাড়া-চাড়া করছি,—কিন্তু দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে সেই আত্মবৎ পরের স্বাধীনতার প্রেরণা জাগছে কোথায়? স্বাধীনতাকে ব্যবহার করছি নিজের ক্ষমতাকেই কেবল অবাধে নানা দিকে বাড়ানোর জন্য। মাথাওয়ালাদের মাথার নানা প্রণালী উদ্ভাবনের মূল লক্ষ্য রয়েছে আপন শক্তি-সম্প্রসারণের সুযোগকে পাকাপোক্ত করা। যতক্ষণ এই নিগূঢ় ইচ্ছা অবচেতনে থেকে কাজ করবে, ততক্ষণ উপায় ও উপকরণের বহরে কমতি হবে না কিছু মাত্র; যত তা জটিল হবে ততই বাড়বে তার মূল্য, মাথাভারী আমলাতন্ত্রের সঙ্গে খাতাভারী অর্থবান গদীয়ানের দল মিলে ততই দুর্মূল্য করে চলবে কেবল মানুষের বাঁচা। আপনাকে আপনার অধীন করে সুখ কী, সকলকে আপনার অধীন করে রাখাই আসলে জানি আমরা স্বাধীনতা।

আপনাকে আপনার অধীন করা স্বাধীনতা জানলে চোখ পড়ত আগে আত্মবশ্যতার দিকে। সুখের ধারণা জোগাত আমাদের সেই ধ্রুব কথা—

আত্মবশ্যতাই সকল সুখের আকর, পরবশতা গর্হিত। এখন জানি পরের চোখে আমরা কতদিকে কত বড় হতে পারি। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখাই তার পক্ষে প্রতিবন্ধক। সুতরাং যে কোন উপায়ে সকলকে ছাড়িয়ে সকলের চোখে বড় হওয়াই আমাদের একমাত্র কাম্য। এতে পরের পছন্দ কল্পনা করে আমাকে খাওয়া-পরায় শিক্ষাদীক্ষায় পরবশ হয়ে চলতে হচ্ছে। দেশের মনোবৃত্তির এই ফাঁক খুঁজে ঢুকে পড়ছে ডাইনে-বাঁয়ে যত তালবেতালের দল। যত প্ল্যান আঁটি, যতই না তা নিয়ে খাটি, কিন্তু, মূলে নিজেদের চিন্তার ভিতরে যতক্ষণ খাঁটি স্বাধীনতার প্রেরণাকে কায়েম না করতে পারছি, ততক্ষণ এক পা এগোলেও আসলে দু'পা পেছিয়ে চলব। অশোক-চক্র সামনে ঝুলিয়ে রাখব, কিন্তু লোকের অবধি থাকবে না পশ্চাৎদিকে। আজ নিরন্নের হাহাকার সেই দিকে কম নেই। এর সহজ সমাধানে এত মাথা খাটছে, কিন্তু সহজে ক'টা লোক বিষয়-সম্পদ-শালী হবার স্বাধীনতা স্বীকার করেছি বা সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছি? জমানো সম্পদ ও ভূম শস্যাদি ভাগ করে সকলকে কিছু কিছু দিলে সহজেই স্বাধীনতার চেহারা ফিরত। এটাই হচ্ছে কর্মগত স্বাধীনতার রূপ। এই প্রেরণা ভিতর থেকে আসা চাই, তা না এসে স্বাধীনতার সঙ্গে এল দেশে চোরাকারবার জমানোর মতলব। স্বাধীনতার নাম নেব অথচ বাইরের চোখে ফেঁপে ওঠবার এই জমানো বৃত্তিকেও পুষ্ট করব,—এখন এই দু'মুখো তাগিদের চোটে আমরা পরিকল্পনায় এমন সব প্যাঁচ খাটাতে শুরু করেছি যাতে, সমাধান দুরূহ থেকে দুরূহতর হয়ে ওঠে, এবং আরো বেশি করে আমাদের এই রকমই মাথা খাটাবার দুরূহ চেষ্টার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। সহজটাকে এড়িয়ে যাবার কৌশলেই যতসব দুশ্চেষ্টার জটিল আবির্ভাব। সহজ সত্য দিয়ে আমরা যেটুকু পেয়েছি, সেটুকুর প্রমাণ যদি এই স্বাধীনতা হয়, তবে তার জোরেই কি বলা চলে না যে, স্বাধীনতার প্রসারের জন্য চাই অকৃত্রিম আরো সেই দেশপ্রীতি, সেই মানবপ্রীতি। আর, বাহ্য বিষয় দিয়ে বড়ো হওয়ার পুঁজিবাদী দৃষ্টি ছেড়ে, সকলের স্বাধীনতার জন্য বিষয়ের সমবণ্টন নীতিরই পোষকতা কার্যত করবার সময় যে এখনই উপস্থিত,—এই অনিবার্য সহজ সত্যটিকেও সেই সঙ্গে আমাদের স্বীকার করতে হবে। এ ছাড়া আর যত কিছুই করি, সে কেবল বাজে জোড়াতাড়া। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "দেশের সেবার মধ্যে দেশের প্রতি প্রীতির প্রকাশ কোনো বাহ্য অবস্থান্তরের অপেক্ষা করে না, তার নির্ভর একমাত্র আন্তরিক সত্যের প্রতি। আজ যদি দেখি সেই প্রকাশ অলস উদাসীন, তবে বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্যস্বরাজ

পেলেই অন্তরের সেই জড়তা দূর হবে, এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে।" কবির কথা কতদূর সত্য আজ তা আমরা বুঝতে পারি। অবস্থান্তর ঘটেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আন্তরিক সত্য বস্তু সেই দেশের প্রতি প্রীতির যে-পরিমাণে মিথ্যা ছিল, সেই পরিমাণেই আমরা রয়েছি পিছিয়ে। স্বাধীন ভারতে কাজের অপেক্ষাকৃত সুযোগ পেয়েও আলস্য উদাসীনতা ছেড়ে মানুষের সেবার দিকে উদ্যোগী হলাম কই? সেই উদ্যোগ দেখা দেওয়ার লক্ষণ,—নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর অতল ব্যবধান নয়।

যাদের মনে একদিন স্বাধীনতার সাড়া জেগেছিল তারা ফাঁসি গিয়েছিল, ধনসম্পদ ছেড়েছিল, এমন কি শিক্ষা ও কৃতিত্বের সমস্ত ভাবী উন্নতি চুকিয়ে দিয়ে, গ্রামে গ্রামে গিয়ে তারা ডেরা পেতেছিল। কিসের জন্যে?—না, নিজেরা যে সম্পদ ভিতরে পেয়েছে সেই স্বাধীনতা প্রেরণার সুধাস্পর্শে গণচেতনাকে নিজেদের মতো করে জাগিয়ে তুলবার জন্যে। কই, সেদিন তো সে-সম্পদ তারা একা নিজের ভিতরে জমিয়ে রেখেই সুখ পায়নি! আজ সে প্রেরণা কেবল ভাবের নয়, কাজে খাটাবার দিন। বিষয়-ব্যবস্থা, জীবিকা ও জীবনযাত্রা সকল দিকে সকলের জন্য সুগম করা চাই, যেমনটি হলে সকলেরই সমানভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ ঘটে। কবি বলেছেন এই কথাটিকেই "সমগ্রবৃদ্ধি"র পথ। মানুষমাত্রেরই 'সমগ্রবৃদ্ধি' হতে হবে, খণ্ডভাবের কোনোদিকে বিশেষ বৃদ্ধি নয়।

মহাত্মাজির প্রিয় শিষ্য বিনোবাজি আজ একটি সত্য প্রেরণারই বলে কাজের পথ কেটে চলেছেন 'ভূ-দান' যজ্ঞের প্রবর্তনায়। তাঁর কর্মপথ স্বাধীনতার নীতির সঙ্গে সঙ্গত। কেন না, তিনি বলেছেন, যেই যা দান করবে, তা স্বেচ্ছায় হওয়া চাই। ভূমির সমানাধিকার মিলনে আশা করা যায়, ক্রমে ক্রমে এই ভিত্তি থেকেই আর-সমস্ত দিকেই এইভাবে স্বেচ্ছাব্রত সম্পদবণ্টনে নিজের মতো সকলের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ করবার প্রচেষ্টা জাগবে। তার ফলে ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণভাবে মানুষের সমাজেরও স্বাধীনতা বা আত্মবিকাশের ধারা প্রসারিত হয়ে চলতে থাকবে। কিন্তু তা না হয়ে, কেবল যদি শেষে খাওয়াপরার স্বাধীনতায় এসেই এ আন্দোলনের গতি ঠেকে যায়, তবে সেও হবে আরেক দুর্দৈবের ব্যাপার! তবে আশা করা যায়, জনসমাজের ভিতর থেকেই তখন আবার মুক্তিকামী বিরুদ্ধ শক্তি জাগবে। এবং যতদূর জানা আছে, মহাত্মাজির আদর্শও সর্বাঙ্গীণ জীবনেরই অনুসারী। খাওয়া ও পরার অভাব এখন এমনই উৎকট যে, আশু এ সমস্যারই সমাধান আগে আবশ্যক। তাই

ভূমির বন্টন দিয়ে গ্রামের সাধারণের বাঁচার উপায় দেখতে হচ্ছে আগেই। দেশের বিপুল জনসংঘ এই উপায়ে বাঁচবার স্বাধীনতা পেলে, তারাই যে সম্পদ সৃষ্টি করবে, তার থেকে বাকি লোকের পক্ষে জীবনযাত্রার স্থূল দিক—অপেক্ষাকৃত সুসহ হয়ে উঠবে। তখন শিক্ষা ও শিল্প এবং যত রকমের উন্নতির ব্যবস্থা আছে, ক্রমে ক্রমে সবই ভেবে-চিন্তে সমৃদ্ধ করে তোলা সহজ হবে। কিন্তু মনে রাখা চাই,—সবদিকের সমৃদ্ধিই আমাদের কাম্য। যেমন মানুষের সর্বশ্রেণীর উন্নয়ন, তেমনি চাই–সর্ববিষয়ে উন্নয়ন। কোনো একদিক, দুদিকে মাত্র নয়। কারণ তা না হলে, অসম্পূর্ণ আংশিক সমাজও তার আংশিক জীবনযাত্রার উন্নতির নীতিই ঘনিয়ে আনবে সমাজে সমগ্রের বিপদ। এই আদর্শ স্মরণ করেই আমরা সর্বাঙ্গীণ সমাজ ও শিক্ষার উন্নতি উদ্দেশে আজ স্বাধীনতার দিনগুলিকে কাজে তৈরী হবার দিন বলে সংবর্ধনা করছি।

স্বাধীনতা, শিক্ষা ও সংগঠন

ভারতের একদিন শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষারম্ভের সময় দীক্ষামন্ত্রে বলত—আমরা একসঙ্গে চলব, সংঘবদ্ধ হয়ে ভোগ করব, একত্রে মিলিত হয়ে বীর্য প্রকাশ করব, আমাদের শিক্ষাদীক্ষা তেজস্বিভাবে হোক, কেহ কাহাকেও বিদ্বেষ করব না।

সহনা ববতু সহ নৌ ভুনক্তু
সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনা বধীতমস্তু।
মা বিদ্বিষাবহৈ।

এ বাণীর মধ্যে থেকে জানা যাচ্ছে, এদেশে সমবায়-পন্থা ও সর্বজনীনতার প্রেরণাবিস্তারই হয়ে আছে আদিকাল থেকে শিক্ষার মূল লক্ষ্য। ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষে সব-কিছু আয়ত্ত করবার চেয়ে, সকলে মিলে তা আয়ত্ত করাই শ্রেয়। এ কথার মতো গণতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শ আর কী থাকতে পারে? ভারতবর্ষ এ আদর্শের কথা সেদিন থেকেই বলে আসছে, যেদিন সে ছিল স্বাধীন। আজও স্বাধীন ভারতে আমরা এই একটি কথার তাৎপর্যের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করি। দল-নিরপেক্ষ উদার জনশিক্ষার বিপুল বিস্তার আমাদের একান্ত কাম্য।

স্বাধীনতার জন্য যাঁরা এতদিন প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের অনেকের কাছে স্বদেশের স্বাধীনতা, অনেকের কাছে আবার শুধু সংসার ভরে মানুষের স্বাধীনতাই ছিল কামনার বিষয়। তাঁরা নিজেরা জীবন কাটিয়ে গেছেন এই দেশেরই এই মানুষেরই নানা ক্ষুদ্রতার মধ্যে; এদেরই স্বাধীনতার জন্য গেছেন বর্ণনাতীত লাঞ্ছনা সয়ে। তাঁরা আমাদের ক্ষুদ্রতার থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, দুর্ভোগের লাঘব করতে লেগেছিলেন—সে সব শুধু অতীতের ইতিহাস হিসাবেই দেখার বিষয় নয়, সে সব দৃষ্টান্ত জাতির সুচিরসম্পদ। তাঁদের রক্তজলকরা অর্জিত ধনের উত্তরাধিকারী হয়েছি আমরা। জ্ঞানে কর্মে, জীবনে ও অনুভবে মানুষকে সকলদিকেই আরো বড়ো মুক্তি দেবার কর্তব্যভার বর্তেছে

আমাদের উপর। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই জাতীয় দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করা ও কার্যত যোগ্য করাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় শিক্ষার সার্থকতা।

কিন্তু আজ শিক্ষারও আগে মানুষের ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে—বেঁচে থাকা,—নেহাৎ জৈব অস্তিত্ব রক্ষা করা। বেঁচে থাকার জন্য,—খাওয়াপরা, ঘর-বাড়ি, জীবিকা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, এ ক'টি হচ্ছে মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন। এ প্রয়োজন অপরিহার্য। কিন্তু এই অপরিহার্য প্রয়োজনের বিষয় ক'টি সম্বন্ধেই এখন অনিশ্চয়তা ও অব্যবস্থা রয়েছে প্রতিপদে। এই কয়টি বিষয়ে সাধারণ সকল মানুষের স্বার্থ সমান। সমস্বার্থে তারা একদলের লোক। অথচ তাদের মধ্যেই দেখা যায় এই নিয়েই বাধছে দলাদলি। স্বার্থ তাদের কিন্তু বিপন্ন হয় দলাদলিতেই। রাজনীতির খেলা চলছে সর্বত্র। শিক্ষানীতি, শিক্ষালয় এবং শিক্ষার্থী-সমাজকেও আজ প্রভাবিত করছে রাজনৈতিক মতামতে।

জনসাধারণের সেবার ধুয়া আছে সকলেরি মুখে। কিন্তু সেবা করা নিয়েও দলাদলির অন্ত নেই। সেবকদলের নিকট সে-লোকগুলিই হয় সেবার যোগ্য, যতক্ষণ যারা চলে দলের মতে, কাজে লাগে দলের স্বার্থে। এই করে জনসাধারণকে ভাঙিয়ে খাচ্ছে বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের দল। জনসাধারণ নিজেদের জুড়ে দিচ্ছে তাদের মতের ঘানিতে। মানুষকে বাঁচাতেই নাকি মত, কিন্তু মতের দায়েই মানুষ শেষে মারা পড়ছে। বিরুদ্ধবাদী মানুষের কোথাও স্থান না থাকলেই যেন ভালো হয়। মানুষের কাছে মানুষের অস্তিত্বের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই—একমাত্র ভোটযুদ্ধের শিকার হওয়া ছাড়া।

জনসাধারণের স্বার্থই যদি দলগুলির প্রধান লক্ষ্য হত, তবে সকল দল থেকেই দেখা হত—সকল মানুষই যাতে বাঁচে। তার উপযোগী প্রাথমিক প্রয়োজনের বিষয়গুলির ব্যবস্থা সমভাবে সকলেরই ক্ষেত্রে যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই নীতি অনুসৃত হত সর্বাগ্রে। জীবনযাত্রার সেই স্তর পর্যন্ত ব্যবস্থা চলত ঐক্যমতের একটি সর্বজনীন মণ্ডলীর হাতে। এ কাজ রাষ্ট্রের। সুতরাং দেশের রাষ্ট্র হত নির্দলীয়। তা না হয়ে, কার্যত ঘটেছে বিপরীত।

সভ্যজগতের রাষ্ট্রশক্তির উৎস নিহিত লোকমতের মধ্যে। লোকমতের বিপুলতাই এখন হচ্ছে ভোটযুদ্ধজয়ের প্রধান অস্ত্র। দলাদলির টানা-হ্যাঁচড়া চলছে সেইদিকে প্রাধান্যলাভ লক্ষ্য করে। মানুষকে বাঁচানোটা তাই মুখ্য হয়ে ফিরছে শুধু লোকের মুখে মুখে, জনসেবার নাম করে যে যার দলীয় বিশেষ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রদখলের চেষ্টায় ভিতরে ভিতরে আছে অভিযানে মত্ত।

সেই অভিযানের স্থবিধার্থে নিজ নিজ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই অনেকে শিক্ষাপ্রচারের উপযোগিতা দেখে থাকেন। কিন্তু জনশিক্ষা হওয়া উচিত বিশুদ্ধ, তথ্যনিষ্ঠা, যুক্তিবোধ ও বিচারশীলতার প্রসার মুখ্য করেই। বিচার-প্রবণতা জাগলে, লোকে সকল দলের অভিমতই নিজেরা স্বাধীনভাবে যাচাই করে নিতে সক্ষম হবে।

ভোটের কল্যাণে একবার কোনো ক্রমে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল হয়ে গেলে শীর্ষস্থলে পদস্থ হয়ে বসে গিয়ে এক-এক ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিগুলি যখন বিগ্‌ড়ায়, তারা যখন গদীর জাদুতে কায়েমী স্বার্থের উপাসক হয়ে ওঠে, তখন তাদের মধ্যে বিশ্বাস-ঘাতকতা, স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিলে জনসাধারণের দিক থেকে সহজে কিছু করবার থাকে না। ব্যক্তিগতভাবের বিচ্ছিন্ন চেষ্টায় প্রতিকার সাধন তো একরূপ অসম্ভবই হয়ে পড়ে; এমন কি, সংঘবদ্ধ আন্দোলনেও ফল পাওয়া হয় দুষ্কর। যে একাধিপত্য রোধ করবার জন্য গণতন্ত্রের উদ্ভব, সেই একাধিপত্যেরই হাতে জনসাধারণ পড়ে পড়ে বেপরোয়া মার খেতে থাকে। নিজের ভোটখড়্গে নিজেরই গলা কেটে চলে তারা ছিন্নমস্তার মতো।

জীবনের বৈষয়িক দিক জুড়ে আছে রাজনীতি। বৈষয়িক বাঁচাটাই যখন আজ সবচেয়ে জরুরি, তখন রাজনীতিকে এড়ানো সহজ নয়। তাই শিক্ষাকে রাজনীতির পক্ষাপক্ষ সংস্রবহীন করে রাখা সমীচিন হলেও, রাজনৈতিক সমস্যার দিক থেকে শিক্ষার কার্যকারিতা অবশ্যই বিচার্য।

চোখের উপর ভাসছে কত ছবি, শোচনীয় কত জীবনযাত্রা! মানুষের এই শোকাবহ পরিণতির প্রতি উদাসীন হয়ে থাকলে, গোটা সমাজকেই তার জের একদিন ছিন্নমূল করে ছাড়বে। জনসাধারণের দুর্দশাগ্রস্ত ভাঙাভিতের উপর কারো জীবনযাত্রাই নিরাপদ নয়, হোক তা যতই ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধ,—হোক তা যতই দোর্দণ্ড-প্রতাপ; রাজামহারাজ, দল, সম্প্রদায় হোক না যে কেউ, কারোরই এড়াবার উপায় নেই।

একদিকে বায়ুর চাপ যেমনি হল বেশি, অন্যদিকে অমনি ঘটবে বায়ুর স্বল্পতা। তখনি উঠবে ঝড়। এতো জানা কথা। সে ঝড়ে গাছ ওপড়াবে, ঘর ওড়াবে, ঘাড় ভাঙবে, বাজে পোড়াবে, বন্যায় ভাসাবে,—চারদিক দিয়ে বাধাবে হুলুস্থুল। ধর্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে এই ঝড়ই তো দেখা দিয়ে আসছে বিপ্লবে বিদ্রোহে। দেশে-দেশে এ ঝড় লেগেই আছে।

একে ঠেকাতে হলে চাই শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ,—সেই "সহনা ববতু"—সকলে

মিলে ভোগ করার নীতি,—চাই তার শিক্ষা শৈশবের হাতেখড়িরও আগে থেকে। সব-কিছু বিষয়-ঐশ্বর্যের মতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পুঁজিবাদের বাতিল চাই, বিদ্যার চাই সর্বজনীন সম্‌-প্রসারণ। যে-কোনো বিষয়ের মূলগত কথাগুলি কিছু কিছু করে জেনে রাখা সকলেরই পক্ষে অত্যাবশ্যক। অর্থ বা রাষ্ট্রাধিকারের চেয়ে এর প্রয়োজন কম নয়। ধনে, মানে, ভূমিতে, বিদ্যায় সর্বত্রই ইচ্ছা করলে কায়েমী স্বার্থকামীরা বিশেষ অধিকারের বলে সাধারণ অশিক্ষিতদের অনায়াসেই ঠেকিয়ে ফিরতে পারে। অশিক্ষিত সাধারণের একমাত্র সম্বল গায়ের জোর। শিক্ষিতদের বুদ্ধির কাছে তা নিয়ে এঁটে ওঠা কঠিন। অপরের সদাশয়তা ও সাহায্যের মুখ চেয়ে থাকা নিরাপদ নয়। সাধারণের পক্ষে নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য, স্বাবলম্বনের দ্বারা জীবনযাত্রার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবার জন্য—শিক্ষিত হওয়া চাই সকলেরই। কিন্তু শিক্ষিত হওয়াও যথেষ্ট হবে না, হুঁশিয়ার হওয়া দরকার রাষ্ট্রশক্তি নিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে। সেটা যাতে কারো কায়েমী সম্পত্তি হয়ে না ওঠে, সেটি দেখা চাই সর্বক্ষণ। দেশে স্বল্পমেয়াদী নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তিত থাকলে শক্তি-নিয়ন্ত্রণের অধিকার জনগণের অনেকটা আয়ত্তে থাকতে পারে। প্রতিনিধিদের অযোগ্যতা বা বিগড়োবার উপক্রম দেখলেই অগৌণে তাকে সরিয়ে নূতন ব্যক্তিকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ থাকা চাই অব্যাহত। আশা করা যায়, বাধ্য হয়ে তাতে যোগ্যতার পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখতেই লোকে সচেষ্ট হবে। একে মন্দের ভালো মাত্র বলা চলে। কারণ নির্বাচনপ্রথা বর্তমান থাকলেই ভোটের বেচা-কেনা নিয়ে ফটকাবাজারও কিছু-না-কিছু চালু থাকবার আশঙ্কা সর্বদা থেকেই যাবে। মূলে শিক্ষা ও সংগঠন না থাকলে জনগণের স্বাধীন মত পরিপুষ্টি লাভ করবে না এবং তারা শক্তির অভাবে ভয়ে-ভাবনায় বাধ্য হবে দলা-দলির বাজারে ছন্নছাড়া হয়ে ফিরতে। যে-সমাজে শিক্ষা ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ-শক্তি সম্পূর্ণই জনগণের করায়ত্ত, সে-সমাজের পক্ষেই স্বাধীনতার গৌরব করা শোভা পায়।

আজ স্বাধীনতার দিনে একটি কথা খুবই মনে হয়। দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে না হোক্, অন্ততঃ মধ্যবিত্ত সাধারণের মধ্যে একদিন দেখা দিলে ধর্মান্দোলনের প্রেরণা। ব্রাহ্ম-সমাজ, আর্য-সমাজ, সেই সঙ্গে হিন্দু সমাজের থেকেও ধর্মের নব ব্যাখ্যায় উৎসাহ জেগেছিল প্রচুর পরিমাণে। তারপরে এল কর্মের যুগ। মিশন, আশ্রম, সঙ্ঘ ও সমিতিতে মিলে সেবা ও চরিত্র গঠনের আহ্বানে যুবকদের উদ্বোধিত করে তুলল। ক্রমে রাষ্ট্রচেতনার বিকাশ হল। রাজনৈতিক সংগঠনের

সঙ্গে শিক্ষার এবং সমাজেরও সেবার উদ্যম প্রবল হয়ে উঠল। পল্লীর প্রান্তে "স্বরাজ-আশ্রম" বা "কংগ্রেস অফিসের" ধ্বজা উড়ল। আপামর জনসমাজ নিজেদের ভিতর থেকে যুগ-প্রবর্তনায় সেখানে গিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হল। যোগ্য পরিচালক না মিলুক, নিজেরাই অনেকস্থলে তারা অভূতপূর্ব এক আত্ম-উদ্ভাবিত উপায়ে স্বদেশ সেবার প্রয়োজনীয় বিবিধ শিক্ষায় দীক্ষিত হল। সশস্ত্র সংগ্রামের আয়োজনেও অনেকে প্রস্তুত হল তারা এরই মধ্যেই। স্বাধীনতা, আত্মসংগঠন, সেবা ও সংগ্রামের নামে অর্থ ও লোকজন আপনি অনেক স্থলে কেমন করে জুটে গেছে! সংগ্রামের এক পর্যায় শেষ হল। স্বাধীনতা এল। কিন্তু আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, লোকের মধ্যে সংগঠন বা আদর্শবাদের সে সাড়া নেই। শিক্ষার উৎসাহ কোথায় উবে গেছে! সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহে-গড়া সেই কেন্দ্রগুলির আর দেখা মেলে না। দেশের গভর্ণমেণ্ট বা দেশবাসী সাধারণ কারো পক্ষেই এ ঘটনা গৌরবের নয়, স্বাস্থ্যকর তো নয়ই। জন্মের পরই অনেক শিশুকে পেঁচোয় পায়; বাড় বন্ধ হয়ে গিয়ে তারা বয়সেই কেবল বাড়তে থাকে;—নবজাত স্বাধীনতা আবার সে দশা না প্রাপ্ত হয়, তবেই ভালো।

আন্দোলনগুলি এক-একটা বড় শিক্ষা। সাধারণের মধ্যে শিক্ষার আন্দোলন তো দূরের কথা, কোনো-একটা আদর্শ নিয়ে কোনো-একটা আন্দোলনই আজ তেমন ব্যাপ্ত বা বেগবান হচ্ছে না। আগেকার সেই গ্রামে-গ্রামে প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ-আশ্রম, বিদ্যাশ্রমের মতো স্বতোদ্ভূত জীবন্ত জনপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আজ সব চেয়ে বেশী। সব চেয়ে অভাব হচ্ছে আজ সেই জিনিসটিরই। রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির নানা দিক দিয়ে নানা সংগঠনমূলক কাজের কেন্দ্র হবে সেই সার্বজনীন সংস্থাগুলি।

কতদিক দিয়ে যে এরূপ কত কাজের প্রয়োজন আছে, তা আগে জেনে নিতে হবে। কি উপায়ে এই প্রবর্তনা সুদূর গ্রামে অবধি সকলের মধ্যে আবার জাগানো যায়, তাও স্থির করা দরকার। এ না হলে স্বাধীনতার স্বাস্থ্য ফিরবে না। দেশকে স্বাভাবিক শক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে গণচেতনার উদ্বোধনে গণশিক্ষা ও সংগঠনের কাজে সকলকে গ্রামে-গ্রামে ব্রতী হতে হবে। বে-সরকারী এই কেন্দ্রগুলিকে সরকার নিশ্চয়ই যথোপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা দান করবেন। স্বাধীনতা প্রেরণার নাড়িপ্রবাহ হবে এই গ্রাম-কেন্দ্রগুলিই।

শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষারীতি

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকগণের ভূমিকাই হচ্ছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আগে এদেশে শিক্ষকদের বলা হত—গুরুমশাই। গৃহে সব রকমের শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন ও সুদক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী একত্র মেলা ভার। তাই আশ্রমে বা গুরুগৃহে ছাত্রেরা বাস করত। পিতার স্থানও তাই গ্রহণ করতে হত গুরুমশায়দেরই। তাঁরা চরিত্রে বিদ্যায় সবদিকেই আদর্শ হতেন। ছাত্রেরা তাঁদের শ্রদ্ধা করত। পাশ্চাত্যসমাজে গুরুর সম্বন্ধ একটু অন্য রকম করেও গড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে। কেবল ভক্তি নয়, গুরুকে অর্জন করতে হবে—ভালোবাসা, সতীর্থের বন্ধুত্বও। ছাত্রদের স্বভাবের দোষগুণ কোনো কিছুই লুকোনো থাকবে না তাঁর কাছে। বন্ধুকে যে-বিশ্বাসে হৃদয় খুলে সব বলে, ছাত্রদের সে বিশ্বাসই হবে শিক্ষকের শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠ ভিত্তি। শিক্ষকের হৃদয়ের সমবেদনা এবং শুভেচ্ছা ছাত্রের চরিত্রগঠনে সাহায্য করবে তেমনিভাবে, যেমন করে শিশিরের স্নিগ্ধ স্পর্শ সার্থক করে কুঁড়ির পুষ্পবিকাশ! পাশ্চাত্যের কোনো এক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এ বিষয়ে তাঁর নিজের স্কুলের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। দুষ্ট ছেলেদের নিয়ে তাঁকে থাকতে হত। তাদের নানান দোষ ছিল। চুরি করত, পকেট মারত। শিক্ষকটি একদিন খুব সংগোপনে তাদের দু'একজনকে বললেন, তিনিও যে ভিতরে-ভিতরে তাদেরি একজন। তাঁকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে তিনিও তাদের খুব সাহায্য করতে পারবেন। একদিন দু'দিন করে করে তিনি একটু বিশ্বাসভাজন হলেন। বললেন, যে যা রোজগার করবে সব জমা দিতে হবে একজায়গায়। কিছু ভাগ পাবে, সবটা নয়। আর স্থির হল, ছাত্রেরা যা জমা দেবে, শিক্ষককেও সে-পরিমাণে চুরি করে এনে জমা দেওয়া চাই। প্রথম দিনে একটি ছাত্র পকেট-কাটার রোজগার জমা দিল ৬ পেন্স; ভাগ নিল ৩ পেন্স। এবারে মাস্টারের পালা। কিছুতে আর সেদিক থেকে জমা পড়ে না। ছাত্রেরা অধীর হয়ে উঠল। অবশেষে একদিন মাষ্টার ৪ পেন্স জমা দিয়ে বললেন, এই তাঁর সাধ্যমতো উপার্জন। পকেট কেটে এর চেয়ে বেশি সুবিধে করা গেল না। তিনি ২ পেন্স ভাগ নিলেন। নূতন শেখা বিদ্যে। ছাত্রেরা সবাই প্রায় ব্যবস্থাটা মেনে নিল। কিন্তু শিক্ষকটি দু'দিন বাদে আড়াল থেকে শুনতে

পেলেন, তাঁর পূর্বেকার ৬ পেন্স জমা-দেওয়া ছাত্রটি তার আরেক সতীর্থকে বলছে, দেখেছিস, মাস্টারের কাণ্ডটা। সঙ্গী বলল, কেন, এর মধ্যে আবার কী কাণ্ড হল! উনি তো ওঁর পয়সা জমা দিয়েছেনই! ছাত্রটি বলল, তোরাও যেমন, ওতেই ভুলে গেলি! সতীর্থ বলল, কী বলছিস! তিনি যে আমাদের বন্ধু। কত ভালোবাসেন, আমাদের সঙ্গে কেমন মেশেন, আমাদের মতোই সব কাজ শিখে নিয়েছেন! এবার পূর্বোক্ত ছাত্রটি জোরের সঙ্গে বলে উঠল, কাজ শিখেছেন, না ছাই! ও পয়সা আমরা নেব না তো! তুই কি ভেবেছিস উনি পকেট কেটেছেন? আমি ঠিক জানি, উনি কখ্‌খনো ওসব কাজে যাবেন না। যেতে পারেন না। ওসব ওঁর নিজের পয়সা থেকে দিয়েছেন। আমাদের দলে ভিড়ে ওঁর এখন থেকে শুধু এমনি ক্ষতিই হবে। থাক্ বাপু, এ সবে আর কাজ নেই।—ছেলেরা সেই থেকে শোধরাতে লাগল। শিক্ষকের দরদ পরশমণির কাজ করল।

এখন, আগেকার দিনের গুরুমশাই আর এখনকার কালের এই দুষ্কর্মের বন্ধু, এ দুয়ের মধ্যে কোন্ ভূমিকা ভালো, সেটা ঠিক করে নেবেন শিক্ষকমহাশয়েরা নিজ নিজ পরিবেশ বুঝে এবং সে সঙ্গে নিজের প্রকৃতি অনুধাবন করে।

আজকাল রাষ্ট্রের হাতে সব কিছু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। রাষ্ট্রপতিরাই দেশের কর্ণধার। সমাজে তাঁদের সম্মানই আজ সকলের উপর। একদিন সমাজপতিরা এ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, অর্থ, সকল-কিছুকে একমাত্র শিক্ষাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। রাষ্ট্রের প্রধান শক্তি হচ্ছে সামরিক শক্তি; শিক্ষার শক্তি হচ্ছে জ্ঞান-শক্তি। শিক্ষার প্রাধান্যের দিনে যুদ্ধের তথা দৈহিক-ধ্বংসের সম্ভাবনা দূর হবে। এমন দিন আসা বিচিত্র নয়, যেদিন শিক্ষাব্রতীরাই নেবেন সংসারের শীর্ষস্থান। তাঁরা নিরাসক্ত এবং নিরভিমান হয়ে চালনা করবেন সমস্ত লোকসংস্থা।

আসক্তি এবং অভিমান লোককে স্বার্থপরায়ণ করে। ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধাই আজ সকলের কাম্য হয়েছে। শিক্ষকরাও এই স্বার্থপ্রবৃত্তির বশ না হয়ে পারছেন না। অর্থোপার্জনের প্রশস্ততর অন্য পথ যখন আর সামনে কিছু মিলছে না, তখন লোকে হাতের কাছে পেয়ে শিক্ষাকে জীবিকারূপে অবলম্বন করেছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

জীবিকার দায়ে পড়েই এঁরা শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছেন। দারোগা, দোকানদার, ডাক্তার বা কেরাণী – এর যে-কোনো একটা-কিছু এঁরা হতে পারতেন বা সুবিধে মতো বিনা দ্বিধায় যখন-তখনই তা হতেও পারবেন। শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত

থাকে যদি এমন সব লোক, তবে নিজেদের স্বভাববিরুদ্ধ শিক্ষার কাজে সে-সব লোকের মন বসবে কী করে? শিক্ষা বা শিক্ষকের মান তাদের দ্বারা বাড়বারই বা সম্ভাবনা কোথায়? নামেই তাঁরা শিক্ষক, অনধিকার প্রবেশ দ্বারা তাঁরা অনেকস্থলে প্রকৃত শিক্ষা ও শিক্ষকের পথ অবরোধ করে বসে আছেন। অনেক লোক আছেন অন্যক্ষেত্রে, যাঁরা এদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর শিক্ষক হতে পারতেন। কিন্তু সে-সব শিক্ষকের সন্ধান কে করে?—সম্মানই বা তাঁদের কে দেয়। সামান্য একটা নৌকার মাঝি, চাষী বা জোলার কাছ থেকেও হাতে কলমের যা শিক্ষা মেলে, অনেক পাশ-করা বিশেষজ্ঞদের পক্ষে তা দুর্লভ।

দারোগা, দোকানদার হতে গেলেও শিক্ষার দরকার হয়। কাজ করতে-করতেই সে-শিক্ষা মেলে। আলাদা করে শিক্ষার অবসর অনেকের ঘটেই না। প্রত্যেক কাজেরই ধারাবাহিক গতি ও কৌশল-পরম্পরা আছে। শৃঙ্খলাক্রমে আনাড়িদের সে-সব অভ্যস্ত করানোই শিক্ষকের কাজ। যে-কোনো সূত্রে যে-ক্ষেত্রেই যিনি যে কাজে নিযুক্ত থাকুন,—তার নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করবার কাজ যখনই তিনি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করছেন, তখনই তাঁকে শিক্ষকের পর্যায়ে ফেলা যায়। পথে-ঘাটে এরূপ অসংখ্য শিক্ষক আছেন এবং শিক্ষাস্থলও আছে অসংখ্য। স্কুলকলেজের বাঁধা শিক্ষা ছাড়াও চলতে ফিরতে হাজার উপলক্ষে হাজার রকম শিক্ষা সেখান থেকে অর্জন করা হচ্ছে। ছাপমারা শিক্ষায় যতখানি বিদ্যাবুদ্ধি আমাদের জুগিয়ে থাকে, খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, বাইরের এ সব বেসরকারী শিক্ষার ফলে আমরা তার চেয়েও বড়ো জিনিস অনেক সময় পেয়ে থাকি।

নানাদিক থেকে নানা বিষয়ে শিক্ষা নানা জনের কাছ থেকে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। তাই এতে-ও জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিণতির সাহায্য করে। স্কুল-কলেজের শিক্ষায় বিশেষ-বিশেষ দিক দিয়ে দক্ষতা জন্মে বটে, কিন্তু সর্বাঙ্গীন শিক্ষা তাকে বলা চলে না, এ কথা ঠিক। সুতরাং প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরেও আমাদের শিক্ষার পূর্ণতার জন্য অনেকখানি অপেক্ষা করতে হয়। এরূপ বেসরকারী শিক্ষা ও শিক্ষকের উদ্দেশ করা শক্ত; স্কুলকলেজের পরেই যে-কয়েক স্থলে এজন্য আমাদের একটু মনোযোগ দেওয়া চলে,– কিছুটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়, এমন সব ব্যক্তি ও বিষয় আশেপাশে যা আছে,—তাদের সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। শিক্ষার সে এক অভিনব প্রশস্ত রাজ্য। খুঁটিয়ে দেখতে গেলে, এ রাজ্যের বিষয়বস্তু অনেকই মিলবে। উদাহরণস্থলে

বলা যায়,—যেমন লাইব্রেরি, অন্তঃপুর, অভিভাবক ও জনসমাজের যোগ শিক্ষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়নি। এরা শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থান না পেয়ে খানিকটা দূরেই পড়ে আছে। অথচ এর প্রত্যেক দিক থেকে শিক্ষার প্রচুর সম্পদ আমরা পেয়ে থাকি, আরো কত না পেতে পারি। শিক্ষার আদানপ্রদান ক্ষেত্রকে আজ এদের মধ্যেও বিস্তারিত করে দেখতে হবে।

মানুষের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা এবং তার আশা-আকাঙ্ক্ষাপ্রবৃত্তির সুনিয়মিত পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও অভ্যাস আচরণের নির্দিষ্ট ধারার সঙ্গে ধারাবহির্ভূত রহস্যময় নানা সৃষ্টি অনাসৃষ্টির অনির্দিষ্ট প্রভাব প্রতিক্রিয়া,—সবই তার শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্গত। সভ্যতার প্রতিবেশী বর্বর এবং আদিম সমাজের কদর্য ইতিহাসও পরম যত্নে অনুশীলিতব্য বিজ্ঞানের কাছে সবই এখন বিচারের বিষয় হয়ে উঠছে। অতীতের অপরিচ্ছন্ন ক্লিন্ন আবরণ ভেদ করেই প্রগতির নূতন সূত্র আত্মপ্রকাশ করছে। এর মধ্যে দেখা যায় শিক্ষার বারোআনা অংশই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাস্তবের সুনির্দিষ্ট ফলাফলকে ভিত্তি করে; কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পের, সৃষ্টি, আলেখ্যগুলির মধ্যে রস ও রূপের রহস্যময় আকস্মিক আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। অলৌকিক ঘটনাও জগতে অনেকই ঘটে। সে কেবল আধ্যাত্মিক রাজ্যে নয়: প্রাকৃতিক জলবায়ু এবং মানুষের মনোবৃত্তির মধ্যেও অল্পবিস্তর রহস্যময় পরিবর্তন যে দিনে দিনে ঘটে চলেছে, তা খুবই বোঝা যায়। সুতরাং, শিক্ষকের পক্ষে কোন এক কালের বাধাধরা সূত্র প্রয়োগ দ্বারা সমস্ত কালের ঘটনা বা মানুষের রহস্যোদ্ধার করতে যাওয়া সবসময় সমীচীন হয় না। অনিশ্চিত অভূতপূর্ব বিষয়কে ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রহণ না করে,—পরীক্ষা দ্বারা তার যথার্থ তাৎপর্য আয়ত্ত করবার জন্য তাকে শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণাধীনরূপে পৃথক্ রাখা হয়। কারণ, যা জানা গেছে, যা আয়ত্তে এসেছে, তাই মানুষ মানুষকে শেখাতে পারে। এই নীতি দ্বারা শিক্ষা অধিকাংশ স্থলেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অপেক্ষা রাখে। বিষয় সম্বন্ধে যত পরিষ্কার ধারণা থাকবে, সে বিষয়ের শিক্ষাদানও তত সহজ হয়ে আসে। প্রতিষ্ঠিত সুনির্দিষ্ট মতের ও পদ্ধতির অভ্যাসকেই এজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অনিশ্চিতভাবের অলৌকিক বিষয়ের উপর সাধারণের শিক্ষার কাজ জোর পায় না। খেয়ালমতো অনিয়মিত চেষ্টা দ্বারাও ফল লাভ করা হয় কঠিন। পরিবেশের উপযোগী নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে নিয়মিত সাধনাই সিদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়ে থাকে।

পরিবেশের মধ্যে যে-সব বিষয়ের সমাবেশ স্বভাবত সংঘটিত হয়ে আছে

তারা সবই জীবনের অঙ্গ,—তাদের দায়িত্ব স্বীকার করে জীবনে সব রকমের সুস্থ রুচি ও শুভকর সর্ব বিষয়ের সংগতি দান করে চলার শিক্ষাকেই "সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা" বলা যায়। সকল কিছুকে জীবনের অঙ্গ করে দেখলে, কোনো কিছুর উপরেই বিরূপতা জাগে না। নিজের হাত-পা ও মাথার মতোই সকলের প্রতি যথাযোগ্য আদর, যত্ন প্রকাশ পায়। তার ফলে, কাউকে বঞ্চিত করে আত্মপূর্তি বা কোনো দিকে কারো কোনো অভাব-অভিযোগ অপূর্ণতা থাকতে দেওয়া—সবই স্বার্থ-হানিকর বলে গণ্য হবে। কারণ সকলেই স্বার্থের অঙ্গ হলে, বাদ দিয়ে নিজেকে মাত্র ভাবাই চলবে না। পারিপার্শ্বিক বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রদের সেই বৃহত্তর সংযোগ করানোই শিক্ষকের অন্যতম সাধনা হবে। কেবল উপদেশে নয়, বাস্তব নানা কাজের মধ্য দিয়েও তাদের অভিজ্ঞতাকে পুষ্ট করা চাই।

ইংরেজ আমলের আগে দেশীয় ধারায় সাধারণের শিক্ষা ছিল অনেকটা পারিপার্শ্বিক সমাজের দৈনন্দিন মেলামেশার অভিজ্ঞতা-আশ্রয়ী হয়ে। টোল, পাঠশালা, মক্তব, মাদ্রাসা অনেকই ছিল। কিন্তু, গ্রামে পাশ করা লোকের সংখ্যা ছিল নামমাত্রই। লিখতে পড়তে জানলেই হল। তারপরে সংসারের কাজের মধ্য দিয়ে যার-যার বৃত্তির ক্ষেত্রে সে বিশেষ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে সমাজে চলবার উপযুক্ত হত। ইংরেজি প্রথায় স্কুলকলেজের বিস্তারের কাল থেকে সমাজের সঙ্গে শিক্ষার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

সমাজের প্রাত্যহিক জীবন থেকে, আধুনিক এই স্কুলকলেজের পদ্ধতিতে শিক্ষাকে স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ঠাটে চালনা করবার ফলে লাভ বেশি হচ্ছে কি কম হচ্ছে, তা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠেছে।

সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা কাজের বুদ্ধি ও পরিশ্রম করার শক্তিটাকেই পাকা করে তুলত। সেসঙ্গে শিখত লোকের সঙ্গে ব্যবহার আর অভ্যস্ত হত সহজ রসবোধে। জ্ঞানধর্মের তথ্য যেটুকু জ্ঞাতব্য, সেও তাদের কাছে এসে পৌছত কথকতার কাহিনী ও কবিকীর্তনযাত্রা প্রভৃতির আনন্দস্রোতে মিশে। লিখতে পড়তে না জেনেও তারা এক-একজনে সংস্কৃতিবান হত। বিদ্যা সমাজের শ্রদ্ধা লাভ করত সঙ্গে চরিত্রের বীর্যবত্তা থাকলে। এ আদর্শ অবহেলা করবার নয় মোটেই। এখানকার শিক্ষায় বিদ্যাতে জাগায় অভিমান, বিদ্যাতে যে বিনয় দান করে—পৌরাণিক এ-কথা এখন জনশ্রুতির বিষয়। জাতির ঐতিহ্যিক বুনিয়াদের সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শগত এই দিককার সংগতি বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

এই জনসাধারণের কথা শিক্ষাজীবন থেকেই শিক্ষার্থীদের ভাবতে শেখাতে হবে; মাটির নিচের যে শিকড়গুলি পত্রপল্লবশোভিত শাখাসমূহকে ধারণ করে আছে, তাদের সূর্যকিরণ জোগাতে হবে নিজেদেরই-বাঁচবার-জন্য,—এই কাণ্ড-জ্ঞানটুকু না থাকলেই নয়। এর অভাবে যেমন বনস্পতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সমাজদেহেরও মৃত্যু ঘনায় উপরতলার লোকের এই জ্ঞানের অভাবেই।

শিক্ষা ব্যর্থ হবে যদি পারিপার্শ্বিক বিপুল জনসংঘের সাথে ছাত্রদের জীবনের যোগ না থাকে। সাধারণের শ্রমোৎপন্ন রসদে ও উপকরণে বসে বসে নিরুদ্বেগে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষাচর্চা চলছে, এ কথা যেন কোনক্রমেই কেউ ভুলে না যাই। কেমন করে এর প্রতিদানে শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে ব্যবসাবাণিজ্যে তাদের কাছে জীবনের সম্পদ এমনি করে আবার পৌঁছে দেওয়া যায়, সে-পথই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। নৈশ বিদ্যালয়ে এদের আক্ষরিক শিক্ষা ও প্রদর্শনী এবং বিনোদনের অনুষ্ঠান করে আনন্দ বিতরণের ভার অনেকটা নেওয়া চলে। এ সঙ্গে প্রধান আরেকটি কাজের কথা যেন ভুল না হয়: জন সেবার ক্ষেত্রে রোগিপরিচর্যা ও সংকটত্রাণের দিকটায় শিক্ষক ও ছাত্র-সম্প্রদায় মিলিতভাবে অগ্রসর হয়ে এতদিন সেবা ও সংগঠনের যে মহৎ ঐতিহ্য স্থাপন করেছেন, সেটিকে অব্যাহত রেখে চলবেন। আর্ত- ও আত্ম-রক্ষার জন্য রক্ষীবাহিনীর দায়িত্বও তাদের উপর নির্ভর করে। এ সব কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্র সমাজের চরিত্র গঠনে শিক্ষকগণ প্রভূত সুযোগ পাবেন। হাতের কাজ এবং খেলাধূলা ব্যায়াম প্রভৃতির দিকেও শিক্ষার্থীর উদ্যমকে সমভাবে সঞ্চালিত করা প্রয়োজন। বহু বিষয়ের চর্চা স্বভাবতই দেহ ও মনকে তৎপর করবে, কিন্তু মাঝে অবসরেরও ব্যবস্থা চাই। বিষয়বৈচিত্র্যের সঙ্গে অবসর যুক্ত থাকলে শ্রান্তি ও একঘেয়েমির ভাব দূর হয়ে যাবে।

পড়াশুনার বেলায় শিক্ষক শুধু শিক্ষা সংগ্রহের উপায়গুলি বাৎলে দেবেন। যে সময়ের মধ্যে যে-শিক্ষাটুকু অভ্যস্ত করাতে হবে, তার কার্যক্রম আগেই স্থির করে নেওয়া আবশ্যক। সে-কাজে কোনোরূপ অনির্দিষ্টতা রেখে চলা শুভকর নয়। উপায় ও সন্ধান জেনে নিয়ে, ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা কে কতটা পাঠ তৈরী করে আনে, তা দেখাই শিক্ষকের কাজ। জিজ্ঞাসাটা ছাত্র মহল থেকে যত জাগানো যায় ততই ভালো। শিক্ষকেরা ছাত্রদের স্রষ্টা, এটা যাতে ছাত্ররা না জানতে পায়, যাতে নিজেরাই তারা নিজেদের স্রষ্টা বলে জেনে শিক্ষকদের পরম সাহায্যকারী ও উপদেষ্টা সঙ্গী হিসাবে মনে করে এবং আত্মগঠনে উৎসাহ পায়,—সেভাবেই যত্ন ও সতর্কতার সহিত শিক্ষা দেওয়া উচিত। দায়িত্ব বোধ চাপানো হবে না, দায়িত্ব-

বোধ জাগানো হবে। প্রতিদিনের নির্দিষ্ট পাঠ অল্প হোক, ক্ষতি নেই; কিন্তু দিনের পাঠ দিনই ক্লাসে ছাত্রদের দিয়ে অভ্যাস করিয়ে নিতে হবে, যাতে বাড়িতে তাদের স্কুলের জন্য তৈরি হতে না হয়। বাড়িতে তারা সম্পূর্ণ হাল্কা মনে ফিরবে। তারা কেবল এইটুকু বোধ করবে যে, কিছু একটা নূতন কাজ নিয়ে দেখালে শিক্ষক পরদিন মনে-মনে খুশি হবেন।—কোন্ কোন্ বিষয়ে কী-কী নূতন সেই কাজ করে নিয়ে শিক্ষকের সেই খুশি আদায় করা যায়? বাড়ির কাজটুকু হবে তাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বাধীন মনের বিচিত্র সৃষ্টি।

পড়ার বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির উল্লেখ এস্থলে করা যায়। যে-কয় বিষয়ে যে-ক'খানা বই পড়তে হবে, তা গুছিয়ে নিয়ে বসা গেল। যতক্ষণ বসে পড়া চলবে, সে-সময়ের মধ্যে ক'পাতা করে এক এক বিষয়ে পড়া সম্ভব, তা স্থির করে নিতে হবে। পরে, নিদষ্ট অংশটুকু তিনবার করে পড়া দরকার। প্রথম বারে শুধু একবার এমনি পড়ে-যাওয়া। অজানা নূতন শব্দগুলি তখনই সঙ্গে সঙ্গে তালিকাবদ্ধ করে নিয়ে অভিধান যোগে অর্থ জেনে নেওয়া গেল। দ্বিতীয়বার প'ড়ে, সে অংশের, 'মোটকথা' বা সার সংক্ষেপটুকু খাতায় লিখতে হবে। তৃতীয়বার পড়ার সময়, নানা দিক থেকে সম্ভাবনাপূর্ণ নানা প্রশ্ন মনে মনে তৈরি করে, তার উত্তরগুলি পঠিত স্থল থেকে সংগ্রহ করে নেওয়া যদি যায় তবেই একরূপ পাঠ তৈরির কাজ শেষ হতে পারে। এক-এক করে অন্য বিষয়ের বইগুলিও অমনি করে পড়ে গেলেই হল। প্রত্যেকবারেই একটু জোরে পড়া চাই। শাস্ত্রেই বলে—"আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরিয়সী।" এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বর্ণিত তাঁর কৈশোরে বিলাত প্রবাসকালে লণ্ডন য়ুনিভর্সিটির ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাসের অধ্যাপক মর্লির অধ্যাপনা প্রণালী উল্লেখযোগ্য। তিনি কেবল আবৃত্তি করার দ্বারাই ছাত্রদের মনে অধ্যাপনীয় বিষয়ের সম্বন্ধে আবশ্যক জ্ঞান মুদ্রিত করে দিয়ে যেতেন; কচিৎ ব্যাখ্যা করার দরকার হত। লেখার কাজগুলি সম্বন্ধে ছাত্রদের অভ্যাস করাতে হবে এইটুকু যে, তারা যা লিখবে, তা সুন্দর, সুচিন্তিত ও সুস্পষ্ট-ভাবে সুবিন্যস্ত হবে। যেটুকুই লিখবে, তা লেখার পরেই নিজেরা একবার পড়ে দেখবে, শুদ্ধ হল কিনা। এমন কি, নিজেরা নিজেদের পরীক্ষক হয়ে মানসংখ্যাও লেখার গায়ে বসিয়ে নিতে পারে। শিক্ষকদের বিচারের সঙ্গে নিজেদের বিচার মেলাবার এই উপায়টি তাদের পক্ষে উৎসাহজনক হবে।

ছোটোদের দিনগুলি কিভাবে উদ্‌যাপিত হলে শিক্ষা ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে সার্থক হতে পারে, সে-বিষয়েও মোটামুটি একটা পরিকল্পনা দেওয়া গেল। গল্প

লেখা, গান শেখা, কবিতা-আবৃত্তি, চিত্র, সেলাই, বাগানের কাজ, ব্যায়াম, খেলা-ধুলা ইত্যাদি কাজগুলি প্রতিদিন নিয়মিত কতটা করে এগোচ্ছে, তার একটা হিসেব রাখা আবশ্যক। ছোটোরা নিজেরাই ডায়েরি রাখবে। তাতে টোকা থাকবে, · ক'পাতা বাইরের বই বা ক্লাসের বই পড়া হল, ক'টা নূতন শব্দ সংগৃহীত হল, অঙ্কই বা করা হল ক'টা, ধারাপাত, হাতের লেখা,—সব-কিছুই হিসাবে ধরা হবে। আশেপাশের নূতন খবর, নূতন জানা পরিচয়,—কিছুই বাদ যাবে না। কয়েকটি বিষয় আছে, যা লেখাপড়া বা অন্য কোনো কাজের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু সব চর্চাকে সার্থক করতে সে বিষয়গুলিরই প্রয়োজন হয় বেশি। এগুলি কাজের রীতির অন্তর্গত,—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত গুছিয়ে কাজ করা, কাজের মধ্যে যত্ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলা, চট্‌পট্‌ স্বভাবের করিৎকর্মা হওয়া, নিজে থেকে কর্তব্য সাধনে এগিয়ে যাওয়া, পারিপার্শ্বিক সকল কিছুর প্রতি প্রীতিবান হয়ে সমাদর প্রকাশ করা, সময়নিষ্ঠ ও বাক্‌প্রতিষ্ঠ হওয়া,—এ-সব দিকে ছাত্রছাত্রীদের অভ্যাস খুব দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। এগুলি চরিত্রের গঠনেও কাজ দেয়।

বুনিয়াদি শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার বেশি চাপ থাকে না। সেখানে শিক্ষকরাই মুখে মুখে তাদের সব-কিছু শিখিয়ে থাকেন। গুরুর সেখানে প্রকৃতই থাকে গুরু দায়িত্ব। কিন্তু বুনিয়াদিতেও উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে পড়াশুনা দরকার হয়। যে ক্ষেত্রেই হোক, যতক্ষণ পড়ার দরকার আছে, ততক্ষণ সে-পড়া যাতে কার্যকর হয়, সেজন্য গৃহে পাঠাভ্যাসের পক্ষে অবলম্বনীয় রীতির কথাই এখানে বলা হল। দৈনন্দিন কৃতব্যবহারের মধ্যে যে কাজগুলি একটু বিশেষত্বপূর্ণ, ডায়েরিতে তারও উল্লেখ শিক্ষাপ্রদ হবে। নিজেদের সংসারের প্রয়োজনে এবং অপরের প্রয়োজনে যা সম্পাদন করা যায়,—দু'রকমের কাজই উল্লেখযোগ্য। এ-সব বিবরণের সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও কর্মের স্বাভাবিক গতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাবেন। তাকে প্রয়োজন মতো সুপথে নিয়ন্ত্রণেরও এতে সুবিধে মিলবে। জানার ক্ষুধায় ছাত্রছাত্রীদের যেন পেয়ে বসে চিরজীবন।

অনুসন্ধিৎসা জ্ঞানের চাবিকাঠি। জ্ঞানের দ্বার যেখানে মুক্ত, সেখানে সকল দুয়ারই ক্রমে ক্রমে খুলে যায়। নানা সংস্কার জ্ঞানের মুখোষ প'রে লোকের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। সংস্কারমুক্ত জ্ঞানকে আদর্শ ক'রে শিক্ষার্থীর মনে অনুসন্ধিৎসা জাগানোই শিক্ষার বড়ো সার্থকতা। অনুসন্ধিৎসার বশে শিক্ষার্থী নিজের গরজে শিক্ষণীয় বিষয় অধিগত ক'রে নেবে,—বাইরের ও ভিতরের অনুকূল এই অবস্থা সৃষ্টি ক'রে তোলার মধ্যেই শিক্ষকের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায়।

অভিভাবক

বাড়িতে ছেলেমেয়ে আছে প্রায় সকলেরই। তাদের শিক্ষার দায়িত্ব অনুভব করি সকলেই। শিশুরা একটু চল্‌তে ফিরতে পারলেই দিই তাদের ইস্কুলে পাঠিয়ে, তারপরে নিশ্চিন্তি। যেটুকু চিন্তা থাকে, তা মাইনে আর বইপত্তর নিয়ে। ধরে নিই, কর্তব্য একরকম এইখানেই শেষ। সময় থাকে না আর উপায় সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল থাকিনে, যে, এরপরে ছেলেমেয়ের শিক্ষার তদারক করব। ছুটি-ছাটার দিনে যদিবা একটু দেখাশুনা করতে বসি, সে একেবারে ধুন্ধুমার বেধে যায়। ভয়ে ছাত্রের পলায়ন বা পতন, কাছা-কোঁচা সামলাতে-সামলাতে ক্রোধে আমাদেরো স্থান ত্যাগ—এই দাঁড়ায় পরিণতি। আপশোষের একশেষ হয় টাকাগুলো জলে গেল ব'লে। নিজে দেখতে-শুনতে না পারারই যে এই ফল,—এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না।

শিক্ষার এলাকা টেনে রাখি ইস্কুলের কম্পাউণ্ড পর্যন্ত। যতকিছু আলোচনা শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে। পুঁথিপত্র বা পদ্ধতি নিয়েও কথা হয়। তা'তে অভিভাবকদের বড়-একটা মাথাব্যথা নেই। কিন্তু শেষকালে যে অনুতাপ জাগে, সেটাতে ছাত্র ও শিক্ষকের চেয়ে ভোগায় বেশি তাদেরই। তখন হুঁশ হয়,—ছেলেটা নিজের এবং টাকাগুলোও বড় কষ্টের,—চলে যাচ্ছে অনর্থক সেটা নিজেরই ঘর থেকে। ক্ষতি বুঝবার বয়স ছেলেদের তখনো হয় না, দাগা লাগে অভিভাবকদেরই। এই যদি অবস্থা, তবে অভিভাবকদেরও যে শিক্ষার খবর রাখায় দরকার আছে, তা অস্বীকার করবে কে? কিন্তু যখন সেটা স্বীকার করতে হয়, তখন ছাত্রের হয়তো অভ্যেস বিগড়ে বসেছে, হাতছাড়া হয়ে গেছে তার সংশোধনের সুযোগ। তখন যাকেই যত দায়ী করি, নিজের ক্ষতির আর পূরণ হয় না। অভিভাবকদের শেখাবার নেই কেউ,—তাদের শিক্ষা নিতে হয় ঠেকে।

॥ ২ ॥

বেশির ভাগ সময় ছেলেমেয়েরা কাটায় বাড়িতে। তার মধ্যে বেশিক্ষণ থাকে তারা মায়ের গোচরে। খাওয়া-খাওয়া, সাজসজ্জা, মায়ের কাছেই মিলে। চোখের উপর মায়ের চরিত্রই তারা দেখতে থাকে। এ জন্য মায়ের অভ্যাস এবং মেজাজের

অনেকটা পেয়ে থাকে তারা আপনা থেকেই। পিতা থাকেন বাইরে-বাইরে কাজে ব্যস্ত। মাঝে-সাঝে খোঁজ নেন। পিতার কাছ থেকে যে-কথাগুলি মিলে, তাতে মিশে থাকে শাসনের স্বর, ছেলেমেয়েরা তা এড়িয়ে চলতে চায়। মা স্নেহের বশে স্বভাবতই যতটা ধৈর্যশীলা হন, পিতা ততটা হতে পারেন না। দায়িত্বের ভারে তাকে গম্ভীর ও বিব্রত থাকতে হয়; অস্থিরতা প্রকাশ হয়ে পড়ে একটু বেশি। শিক্ষার ব্যাপারে ধীরতা স্থিরতা রক্ষাই প্রয়োজন। গৃহই হচ্ছে শিশুদের পক্ষে বড় শিক্ষাস্থল। মায়েরা নিজেরা একটু শিক্ষিত থাকলে, আর, একটু ইচ্ছা করলেই, তাঁরা যে-শিক্ষা জোগাতে পারেন,—এমন আর কেউ পারে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মা ভগবতী দেবী লেখাপড়া তেমন-কিছু-একটা না জেনেও ছেলেকে গড়ে তুলেছিলেন।

॥ ৩ ॥

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য, সুরুচি ও আচার-ব্যবহার—এ সব দিকে দৃষ্টি দিতে হবে আগে। গল্পগুজব, খেলাধূলা, গানবাজনা, নৃত্য অভিনয় এবং ব্যায়াম ও বাগান করা—এইগুলি শিশুদের সহজে আকৃষ্ট করে থাকে। মাঝে-মাঝে পাড়াপড়শী জুটিয়ে বনভোজন, সাহিত্যসভা, নানা রকমের উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করা,—তাও খুব আনন্দদায়ক হয়। যদি একটু শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজে লাগানো যায়, তবে এইদলের দ্বারা পাড়া পরিষ্করণেরও কিছু-কিছু সাহায্য হতে পারে। এতে নাগরিক বা প্রতিবেশিক দায়িত্ববোধ জাগবে। লেখাপড়ার চেয়ে এ সব চর্চার গুরুত্ব কম নয়। বাড়ির লোকদের এর সুযোগ সৃষ্টি ক'রে দেওয়া চাই। শুধু নিজের ঘরটি নিয়ে সাবধান থাকলেই হয় না। প্রতিবেশী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ছেলেমেয়েরা মিশবেই; মিশতে দেওয়াটাই স্বাস্থ্যকর। কেবল দূর থেকে একটু নজর রাখা প্রয়োজন; শিশুরা অভিভাবকদের কাছ থেকে এ বিষয়ে সাহায্য পেলে তাদের অনুরক্ত থাকে; বন্ধুস্থানীয় বলে মনে করে। অপরপক্ষে আগে থেকে অন্যদের প্রভাব সংক্রামিত হয়ে গেলে সঙ্গদোষে এমন তারা বেঁকে বসে যে, অভিভাবকদের কথা আমলেই আনে না।

॥ ৪ ॥

শিশুদের প্রফুল্ল রাখতে হবে। এজন্য ঘরে পিতামাতার নিজেদের মধ্যে মেজাজ সংযম রক্ষা দরকার। কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট নয়। হাসিরগল্প করা, সন্ধ্যাবেলা একবার করে সকলে মিলে একত্রে বসা, গান, আবৃত্তি, নাচ, ভালো
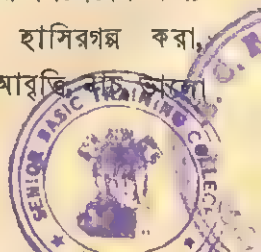
বই পড়া, ছবি দেখা, লোকের জীবনী, মহৎ ঘটনা এবং জানাশোনার মধ্যেকার ছোটোবড়ো সকলেরই চরিত্রের ভালো দিকটা আলোচনা করা—এ সব একান্তই দরকার। বড়োদের স্বভাব ও আচার ব্যবহারের ছাপ নিয়ে গড়ে ওঠে শিশুমন। তাদের সাক্ষাতে কুরুচিকর কুৎসিত বা বীভৎস কিছুর আলোচনা না তোলাই সমীচীন।

অনেকসময় শিক্ষার নানা পদ্ধতি আমাদের মনে আসে। যত ভালো পদ্ধতিরই প্রবর্তনা করা যাক না কেন, নিষ্ঠা (regularity) না থাকলে, কেবল নিত্যনূতন রীতির আমদানিতে শিশুমনে শৈথিল্য ও অবহেলার ভাবই সৃষ্টি করবে। রোজ তারা আশে-পাশে যা দেখে-শোনে, তাই নিয়ে তারা কিছু রচনা করবে, হোক সে গল্প, হোক সে ছবি, হোক না-হয় শিল্পদ্রব্য, আর-কিছু। তাদের ডায়েরি রাখার অভ্যেস করানো খুব ভালো। জীবনের আয়না সেটা। তার ছায়া দেখে নিজেরাই নিজেদের ঠিক করে তুলবে। মাঝে-মাঝে নিয়ম থেকে এক-একদিন তাদের ঢালা মুক্তি-ও দিতে হবে। সম্পূর্ণ খুশিমতো চলবার দিন সেটা। কার কোন্ দিকে ঝোঁক, কেবল সেটুকুই সেদিন দেখে যাওয়া।

ছেলেমেয়েদের ফরমাস ক'রে কাজ আদায় না ক'রে এমন ভাব তাদের ভিতর জাগানো চাই, যাতে তারা নিজেরাই এনে দেখাতে উৎসুক হয় কাজের বহর। তাদের মধ্যে হাতের কাজের প্রদর্শনী, হাতে লেখা পত্রিকা, খেলাধূলোর ক্লাব, লাইব্রেরি ইত্যাদির প্রবর্তন করা ভালো; এমন কি ছোটদের পুতুল-খেলাতেও ভোজ দেওয়া, ঐ রকম আরো সামাজিক ক্রিয়াকর্মগুলির সৌষ্ঠব বিধানে সাহায্য করা—এসবও অভিভাবকদের আগ্রহের বিষয় হওয়া উচিত। এ সবের মধ্য দিয়ে সহজেই শিশুদের সংগঠনের শক্তি আত্মপ্রকাশ খোঁজে। অভিভাবকেরা খুঁজবেন কী করে ছেলেমেয়েদের খুশি রাখব, ছেলেমেয়েরা চাইবে কী ক'রে তারা খুশী করবে বাড়ির লোকদের। পারস্পরিক প্রীতিবিধানের ঔৎসুক্যপূর্ণ এই আবহাওয়াই শিক্ষার পক্ষে আদর্শ। বাড়িতে বাইরের লোক এলে ছেলেপিলেরা আদর পেতে বেশ একটু উৎসুক হয়ে ওঠে। অনেকক্ষেত্রে আবার তারা এমন আড়ষ্ট হয়ে থাকে যে, ভদ্রতার অভাব সূচনা করে। যে-কোনো রকমের বাড়াবাড়িটাই খারাপ। তাদের স্বভাবিক সৌজন্যের মাত্রায় অভ্যস্ত রাখা দরকার।

॥ ৫ ॥

শিশুরা জীবন্ত ভগবান। তাদের লালন-পালন করার কাজটা হচ্ছে পূজা-আর্চার সামিল। এইটি মনে রেখে চললেই আবহাওয়া অনুকূল হয়ে উঠবে।

বকুনি বা মারধোরের ভাব শিথিল হয়ে যাবে। যতই রুদ্রমূর্তি ধরা যাক, শিশুরা বোঝে, কখন অভিভাবক কোন্ বিষয়ে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন, আর কখন তাদের এড়িয়ে-যাওয়া চলে না। অনেক সময় আমাদের গা-বাঁচানো স্বভাবের বশে, আমরা ওদের কর্তব্যবোধের উপর কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে খাটুনি এড়িয়ে থাকি; ওরা ফাঁকি দিলে বা অবহেলা করলে শাসন ক'রেই ওদের ত্রুটি শোধরাতে চাই। এ জিনিসটি নিতান্ত গর্হিত। মূলে কিন্তু সে-ত্রুটি আমাদেরই; আমাদের যা শোধরানো দরকার, তা ওদের উপর দিয়েই চলতে থাকে। ওরা ছোটো, আমরা বড়ো। দায়িত্বের ওরা কী জানে! দায়িত্ব আমাদেরই, যেহেতু আমরা তা অনুভব করি। শিশুদের দিয়েই অবশ্য সবকিছু করিয়ে নিতে হবে কিন্তু যেটা করাতে চাই, সেটা যাতে তারা নির্বিঘ্নে ক'রে উঠতে পারে, সেইটি আমাদেরই দেখতে হবে আগে থেকে। পদক্ষেপের পূর্বেই তার উপযোগী জমি তৈরি ক'রে রাখা চাই। কিভাবে, কখন্, কোন্ কথাটি বললে তাদের মনে ধরবে, কাজটি করতে গিয়ে কী-কী জিনিস দরকার হবে, কোন্ কাজের পক্ষে কতটা সামর্থ্য চাই, কার কতটা সে অনুপাতে সামর্থ্য আছে, কোন্‌দিক থেকে কী রকমের সব বাধা এলে তার প্রতিকারই বা কী—এত সব ভেবেচিন্তে নিয়ে শিশুদের হাতে কাজ দিতে হবে। কাজ আদায় করা আমাদের একটা সৃষ্টি, একটা স্বপ্ন; তার ফল উপভোগ করি আমরাও;—এ যেন বীজ পুঁতে গাছের ফল-খাওয়া। তার চেয়েও বেশি এর দায়িত্ব। জমি তৈরি করা, সার জোগানো, আগাছা নিড়ানো, বেড়া দেওয়া,—বাগানটাকে সব সময় চোখে-চোখে রাখা,—সবকিছু ঠিকমতো করা হলে তখন আশা করা চলে, ফল এবারে ভোগ করা যাবে। কিন্তু যদি মূলেই বীজ খারাপ হয়, তবে বাইরের হাজার যত্নেও কাজ দেবে না। সেক্ষেত্রে না-হয় বীজের দোষ দেওয়া চলে, কিন্তু শিশুদের বেলায় সেটি হবার জো নেই। কারণ, বীজ এখানে বাইরের নয়, নিজেদেরই ভিতরের জিনিস। আমাদের প্রাণশক্তি নিয়ে আমাদের গড়া সংসারের পরিবেশে শিশুরা এসে থাকে। আসে তারা আমাদের কত পরে;—তাদের কাছে আমরা সেটুকুই আশা করতে পারি, যেটুকু আমরা আগে থেকে তাদের ভিতরে-বাইরে জুগিয়ে থাকি।

॥ ৬ ॥

কাজের বুদ্ধি তো অনেকই মিলে, কাজ-করা নিয়েই বেধে যায় মুশকিল। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু—নিজেদের ভিতরকার পুষে-চলা এই ঢিলেমির

মতো অভিভাবকদের শত্রু আর নেই। আরামপ্রিয়তার সঙ্গে মিশে থাকে দায়িত্বহীনতা। তার থেকে টানা অবহেলা চলে। তাতেই সব চেষ্টার সমাধি হয়।

শিশুদের একটু-আধটু দেখাশোনা বা তাদের নিয়ে বসা, প্রতিদিনে অভ্যাস হওয়া চাই-ই। 'ছেলেমেয়েরা যখন দেখবে যে, তাদের দেখার কাজটা অভিভাবকদেরও পরম আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে, সেটা যেন তাদের লেখা-পড়ারই মতো গুরুতর, আবার চাকরি করে টাকা-আনার মতোই দরকারী কাজও বটে,—কিছুতে তার ত্রুটি নেই,—তখন শিশুরাও সব কাজে গুরুত্ব দিতে থাকবে। আলস্য, ঔদাস্য বা বিরূপতার সব বাধা ঘুচে যাবে।

বাড়িতে কুকুর বেড়াল, গাছপালা, পশু পাখি, চাকরবাকর যারাই থাকে, তাদের যত্নআত্তি করতে শেখানো দরকার। তাতে সুকুমারবৃত্তিগুলির বিকাশ হয়ে থাকে। তারা সহৃদয় হয়ে উঠতে পারে। শিশুরা যাদের ভালবাসে, তাদের প্রতি অভিভাবকদেরও আদর প্রকাশ পেতে দেখলে শিশুরা আনন্দিত হয়, তাদের চিত্তপ্রসারের সেও এক উপায়।

শিশুর স্বাস্থ্য চাই আগে। প্রতিমার কাঠামোটাই বাঁধা হয় আগে, পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে প্রধান আবশ্যক খাওয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা। যার যতটা সয়, সেটুকুই নিয়মিতরূপে দেওয়া চাই। বেসামাল-খাওয়া থেকে পাকস্থলী ছোটো বেলায় যা জখম হয়ে থাকে, তার জের চলে সারাজীবন। বেপরোয়া খাওয়ার অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেলে, পরে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন হয়। খাওয়ার অভাবে আমরা যত না মরি, বেঁচে থেকে পেটের পীড়ায় ভুগে মরি তার শতগুণ। কেবল দেহ নয়, মেজাজও যায় খারাপ হয়ে। ক্রমে স্বভাবকেও তা বিকৃত করে ফেলে। ভগ্নস্বাস্থ্যে রুগ্‌ণ মেজাজে কোনদিকেই শান্তি মিলে না। অনেক সময় ভালো খাদ্য না মেলায় যা-তা যেমন-তেমন ভাবে যখন-তখন পরিমাণ-ছাড়িয়ে খাওয়ার লিপ্সা জন্মে। একথাটাও নেহাৎ উড়িয়ে দেবার নয়।

এজন্য ছোটোথেকেই প্রতিদিন শিশুদের ঘুম, কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং স্নানাহারের নিয়মানুবর্তিতায় লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। সচরাচর ক্রিমিতে তাদের ভুগিয়ে থাকে ; ভোরে মুখ ধোওয়ার পরেই কিছু কিছু তিতো খাওয়ার অভ্যেস করানো ভালো। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের ছেলেদের লাইনে দাঁড় করিয়ে একসময় রোজ পঙ্‌তিক্ত খাওয়াতেন। একদিনও তা বাদ যাবার উপায় ছিল না।

খেলাধুলার আয়োজন রাখতে হয় প্রচুর। কারণ, শৈশবে খেলাটাই বড়ো

কাজ। প্রতিবেশের মধ্যে একটু দূরে নূতন-নূতন দিকে বেড়াতে নিয়ে গেলে বৈচিত্র্য ও স্ফূর্তির সঙ্গে দেহমনের যুগপৎ সুন্দর অনুশীলন হয়। সেই সময় পথে পথে, হাটবাজার লোকজন গাছপালা যা-কিছু চোখে পড়ে,—বিচিত্র সেই বস্তু-পরিচয়, সামাজিক রীতিনীতি এবং যানবাহন, পুলিশ, পোস্টাফিস, অফিস আদালত, ব্যাঙ্ক কারখানা, ইত্যাদি সংক্রান্ত পৌর নিয়ম-কানুনাদির আলোচনা স্বভাবতই কৌতূহলপ্রদ হবে।

॥ ৭ ॥

ছেলেমেয়েদের কাছে কর্তব্যের দোহাই তোলা নিরর্থক। দোষ নির্দেশের চেয়ে গল্পচ্ছলে সেই দোষের পাল্টা গুণের উদাহরণের কথা কিছু বললে তারা বরং তা কান পেতে শুনবে। অক্ষমতার দিকটা না-এর দিক। তাদের মধ্যে যেটুকু হাঁ-এর দিক মেলে তাই আলোচ্য। শাসনের চেয়ে তেমনি খাবার বা উপহার যোগানোটা অনেকসময় কাজের হয়। মায়েদের রান্নাঘর শিশুদের নিয়ন্ত্রণের একটা প্রধান কেন্দ্র। রকমারি খাবার দেওয়া এবং কোনোদিকে ছেলেদের অবাধ্যতা বা অবহেলা লক্ষ্য করলে একটু কৌশল ও দৃঢ়তার সঙ্গে পরিবেশনে তারতম্য করা, এমনকি, দু'একদিন দু'একটি খাদ্য বস্তু, বা, দু'একবেলা খাবার স্থগিত রাখাও যেতে পারে। কিন্তু তা স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত-জনক না হয়ে পড়ে। মাত্রা ছাড়া কিছু করা কোনো কালেই উচিত হবে না। কোন্ অবস্থায় তাদের মনের গতি কোন্ দিকে যাচ্ছে, খুব তীক্ষ্ণভাবে সেটা সঙ্গে সঙ্গেই পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

সকালে-বিকালে বাগানে লতা-পাতা, ফুল-ফল, তরিতরকারীর পরিচর্যা, সন্ধ্যাবেলায় আকাশের নক্ষত্র-পরিচয়, এবং রাত্রে ঘুমের আগে ঠাকুরমা-পিসিমাদের মুখের রূপকথা ও পৌরাণিক কাহিনীর রহস্যমধুর আলাপনের পরিবেশে শিশুরা দিনে দিনে নবজীবন পেয়ে বেড়ে উঠতে থাকবে।

একটা কিছু কৃতার্থতা কেউ দেখাতে পারুক না পারুক, তাদের জন্য অভিভাবকদের অন্তরের অমৃতক্ষরণ কখনই রুদ্ধ হবে না। সংশোধন চেষ্টার মধ্যে সেই অন্তরটি লেগে থাকলে, তবেই যদি তার মৌন আবেদন মুখ-ফেরানো শিশুর অন্তরে একদিন সাড়া তুলতে সমর্থ হয়। মনে হবে, সন্তান সম্বন্ধে এই স্নেহের কথাটা পিতামাতাকে বলাই বাহুল্য, ধৃষ্টতাও মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যর্থ-প্রচেষ্ট, বারংবার আশাহত অভিভাবকের রূঢ়তা প্রায়শই এমন প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, যার থেকে অনেকসময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা দেখা দিয়ে থাকে।

বয়সের চেয়ে শিশুদের বিদ্যের দৌড় বাড়িয়ে তোলার দুশ্চেষ্টায় আমরা সময় সময় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এটা মারাত্মক! বরঞ্চ বিদ্যের চেয়ে বয়সেই একটু এগোনো থাকলে সেটা বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতির পক্ষে সহায়ক হয়। পরিপুষ্ট দেহ ও মনের উর্বর পাত্রে জ্ঞানবুদ্ধির সহজ উন্মেষ ঘটে; অকালপক্কতা স্বাস্থ্যহানিকর। মনের উপর যদি চাপ পড়ে, শরীরের পুষ্টিও তাতে বাধা পায়। এজন্য সাধারণত আট বছর বয়স না হতে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো সংগত নয়। স্কুলে আসতে যেতে রোদে ঘুরে ঘুরে এমনিতেই তারা হয়রান হয়ে পড়ে, তার উপরে ক্লাসের টাস্ক্, শিক্ষকের কথা মনে করে রাখা,— এও কম ঝামেলা নয়। প্রথম-প্রথম স্কুলে যেতে তারা উৎসাহী হয়ে ওঠে, কিন্তু দুদিন বাদে যদি দেখা দেয় বিরাগের লক্ষণ, তবে আশঙ্কার কথা। সকলে মেধাবী না হতে পারে, কিন্তু পড়া-চালিয়ে যাবার মতো সাধারণ বুদ্ধি প্রায় সকলেরই থাকে। সেক্ষেত্রে শিশুদের বিমনা বা বিরক্ত হতে দেখলেই আগে খুঁজতে হবে কোনো বিষয়ে অতিরিক্ত রকমে খাটুনির চাপ পড়েছে কিনা। যে-পরিমাণ কাজ বা পড়াশুনো তারা স্ফূর্তির সঙ্গে অনায়াসে করে, বুঝতে হবে সেইটুকুই তাদের শিক্ষার স্বাভাবিক মান। সেটুকু অনুসরণ করে চললে তার ফলে শিক্ষায় তাদের কোনোদিনই উদ্যমের অভাব দেখা দেবে না, কারো পীড়াপীড়ির দরকার হবে না,—একবারে একটানাই তারা পার হয়ে যাবে শিক্ষার্থী-জীবনের বৈতরণী।

স্কুলে যা পড়ানো হয়, শিশুদের পক্ষে সাধারণত তাই যথেষ্ট। বাড়িতে পড়ার ভার না চাপিয়ে কেবল দেখে যেতে হবে স্কুলের কাজটুকু আপনা থেকে তারা সেরে নিচ্ছে কিনা। তাদের খুশিই তাদের আসল পরিচালক। সেই খুশিটুকু তাজা রাখাই বড়োদের প্রধান কৃতিত্ব। সেজন্য নিজেদের মেজাজের উপর দখল রেখে সুবিবেচনা এবং সমবেদনার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের হিত-চেষ্টায় চাই একান্ত মনোযোগ। কেবল মনে ভালোবাসা পোষণ করে চললেই ছেলেমেয়ে ভালো হবে না, ঐ সঙ্গে ভালো করবার জন্য বিধিমতো কাজ করা সমানই আবশ্যক। দোষগুণের অপেক্ষা না রেখে ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা অভিভাবকদের বড়ো ধর্ম; কিন্তু তাদের ভালোর পথে এগিয়ে দেওয়াটাই সেই ধর্মের দিক থেকে ন্যস্ত-করা প্রধান কর্ম।

॥ ৯ ॥

শিশুরা গরুড়ের ক্ষুধা নিয়ে জন্মায়। তাদের ক্ষণেক্ষণে খাবার স্পৃহা দেখে বাইরের ক্ষুধার বহর অনুমান করিতে পারি, কিন্তু তারা চোখে-মুখে যে সব-কিছু

গিলতে থাকে, হাত-পা নেড়ে, ছুটাছুটি করে যে সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে পৃথিবীটার স্বাদ নিতে উদ্দাম হয়ে ওয়ে ওঠে,—এ ক্ষুধার পরিমাণ করা কঠিন। সে চাঞ্চল্যে বাধা না দিয়ে, সেটাকে কেবল একটু সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করাই যা আবশ্যক। নানা অবস্থার মধ্যে পড়ে নানারূপ খেয়াল, বিচিত্র চরিত্র এবং নানা প্রবণতা নিয়ে তারা গড়ে ওঠে। বাঁধা কোনো-এক ছক সবক্ষেত্রে সকলের জন্য তাই প্রযোজ্য হতে পারে না। শিশুদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক'রে অবস্থানুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। এখানেই বাইরের চেয়ে বাড়ির শিক্ষা অধিকতর উপযোগী। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঘনিষ্ঠ এই পর্যবেক্ষণের সুযোগ অভিভাবকদেরই বেশি করে মেলে। ব্যবস্থাও করতে পারেন তাঁরাই। অন্য কারো অপেক্ষাতেই এ গুরুদায়িত্বের কাজ তাঁরা ফেলে রাখতে পারেন না।

॥ ১০ ॥

শিক্ষা নয়, সৃষ্টি ও সেবার মন নিয়ে অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধান করলে, নিতান্ত রুটিনের কাজ সরস হয়ে হৃদয়কে দু'দিন বাদে আনন্দিত করে তুলবে। সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির চেয়ে বড়ো সম্পদ ছেলেমেয়েরা। এদের নাশ হতে দিয়ে যারা বিষয়সম্পদের সেবা নিয়ে থাকে, অভিভাবক হিসাবে তারা অকৃতার্থ ও অশ্রদ্ধেয়। মানুষ হিসাবেও তারা দায়িত্বহীন, বিধর্মী। কারণ, মানুষের ধর্ম—আগে মানুষকে মানুষের মতো হতে শেখানো।—মানুষের অনুভূতি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেই অনুভূতির ধারা অনির্বাণ রেখে চলার কাজ যাদের উপর নির্ভর করেছে, তাদের উপেক্ষা করার অর্থ হচ্ছে সৃষ্টির বিকাশের পথকেই অবরুদ্ধ করা। আর, এদের উন্নত ক'রে তুললে হবে সৃষ্টির অর্থকেই আরো বাড়িয়ে দেওয়া। সব বিষয়ই তা থেকে সার্থকতা লাভ করবে।

আজকাল যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে স্কুলকলেজগুলি হচ্ছে ছেলে-মেয়েদেরই সাধের বিস্কুট-তৈরীর কারখানা বিশেষ। লেখাপড়ার ময়দা ঠেসে চুলা দিয়ে তারা এক ছাঁচে সবাই ঢালাই হয়ে বেরুচ্ছে। জীবিকা বা বড়ো জোর জানাটাই তার উদ্দেশ্য, জীবনটা গেছে দূরে প'ড়ে। সে জীবন-গড়ার ক্ষেত্র হচ্ছে বাড়ি। শিক্ষায় এখন বাড়ির গুরুত্ব গৌণ হয়ে পড়েছে। স্বভাব ও আচরণ দিয়ে জীবনের পরিচয়। বাড়িতে অভিভাবকগণও সেদিকটায় অন্ধ হয়ে আছেন। লেখাপড়াটা চোস্ত হলেই হল। কিন্তু জীবনযুদ্ধে আজ লেখাপড়া দিয়েই জেতা যাচ্ছে না, সে তো দেখাই যাচ্ছে। কোথায় সেই চরিত্র, কোথায় সেই সংযম,

কোথায় ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা বা অনুভূতির বিস্তার, যার জোরে সে মানুষের জগতে মানুষের যোগ্য স্থান করে নেবে। বিদ্যার সঙ্গে চরিত্রবলের মিশোল ঘটলে, সে হয় সোনায় সোহাগা। শিক্ষক এবং অভিভাবক দু'য়ের যোগে সে-সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব। টাকা ঢেলে কেবল শিক্ষকের উপর সমস্ত ভার ফেলে না দিয়ে, অভিভাবকদের দিক থেকে সমভাবেই নিজেদের দায়িত্বও বরণ ক'রে নিতে হবে। তবেই জীবনের দিকে ফাঁকি না পড়ে, সত্যিকার 'মানুষ' তৈরী হবে মানুষের হাতে,—যে-মানুষ আপন, এবং যারা আপনার মতো করেই বাঁচাবে মানুষকে আজকার অভ্যস্ত বিশ্বজোড়া নানাবিধ শঠতা ও বঞ্চনার মার থেকে। এই সমস্ত বিবেচনা করে কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদে নয়, সামাজিক দায়িত্বের দিক থেকেও অভিভাবকদের নিজেদের অংশের গুরুত্ব অনুভব করে দেখা উচিত। তাঁরা যে একদিক থেকে সামাজিক শিক্ষকের মর্যাদা অধিকার করে আছেন, সে বিষয়ে তাঁরা যত সচেতন হবেন, ততই সমাজের মঙ্গল।

কেবল স্কুলকলেজের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। অভিভাবকদের নিজেদের জীবনযাত্রাই তাদের সন্তানদের কাছে বড়ো শিক্ষাস্থল, এ কথা স্মরণ রাখা দরকার সকলের আগে। সেজন্য গুরু হয়েও অভিভাবকরা নিজেদের জানবেন সংসার বিদ্যালয়ের চির ছাত্র বলেই। তাহলে, সংযম ও নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞান ও কর্মের অনুশীলনে স্বভাবতই তাদের মধ্যে কিছু-না-কিছু অনুরক্তি ও অভ্যাস জন্মাবে। অভিভাবকদের আচরণ ও স্বভাব শিশুদের জীবনে অলক্ষিতে জাদুমন্ত্রের মতো শিক্ষাসঞ্চারের কাজ করবে, বাঁধাবাঁধির প্রয়োজন হবে না। শিক্ষার গুরুত্ব মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে চুম্বকের আকর্ষণে শিশুদের আদর্শপথে নিয়ন্ত্রিত করে ফিরবে। তার ফলে তখন-তখনই প্রত্যক্ষ না হোক, ভবিষ্যৎ জীবন নিশ্চই কিছু-না-কিছু কার্যকর হবে।

বস্তুতপক্ষে, শিশুদের শেখাবার আগে শিক্ষা দরকার শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিজেদের মধ্যে। সে শিক্ষা পুঁথিগত যতটা না হবে, ব্যবহারগত হবে তার চেয়ে বেশি। চাই ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং তার সঙ্গে অবশ্যই থাকবে প্রাণের ফল্গুপ্রবাহ! বড়োদের নিজেদের কাছে নিজেদের শিক্ষার পরীক্ষাস্থল হবে শিশুরা। তাদের সঙ্গে স্নেহ মাধুর্যের সম্পর্ক গভীরতর করে তাদের মধ্য থেকেই আগ্রহ বাড়িয়ে তুলে কে কতটা তাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্রে উন্নত করে সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিপটু করে তুলতে পারেন, সেইটেই হবে পরীক্ষার বিষয়।

শিশুসমাজ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বলে থাকেন, শিশুদের চঞ্চলতা তাদেয় অন্ত-

নিহিত আনকোরা সৃষ্টি আবেগেরই বিশৃঙ্খল প্রকাশমাত্র। একটু নজর রেখে সেটাকে শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রকাশের দিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই দুষ্টুমিটা কাজের জিনিস হয়। বড়দের কাজ হচ্ছে, বিষয় বুঝে, পরিবেশ রচনা করে যথাসময়ে সেই আবেগের মুখ যথাক্ষেত্রের দিকে একটু ঘুরিয়ে দেওয়া। সেদিক দিয়ে চেষ্টা না ক'রে অধিকাংশক্ষেত্রেই আমরা সাধারণত বকে বা মারধোর করে ছেলেদের দমাতে চাই। যারা মানব সমাজের ও সভ্যতার নবাঙ্কুর, কচি মুখের হাসি কথায় আনন্দের কী সমারোহ নিয়েই না তারা সংসার জুড়ে থাকে; তাদের দিনগুলি আমাদের বোঝবার ও ব্যবহারের ত্রুটিতে নিরানন্দময় হয়েই ঘরে ঘরে কাটতে লাগল। এর প্রতিক্রিয়া সমাজের ক্ষেত্রে ভয়ংকর। মারাত্মক হয়ে একদিন দেখা দেয় তা বিকৃত সব মনোবৃত্তির লীলায়। পরিবারের দৈনন্দিন পরিবেশ স্বর্গের স্থলে নরকের রূপ ধারণ করে, অথচ বুঝে চললে, এদের নিয়ে আমরা প্রতিদিনই আনন্দে ও উৎসাহে নূতন নূতন কাজের ও খেলার প্রবর্তনা দ্বারা জীবনকে পরম উপভোগ্য করতে পারি। ভাবী সমাজও নূতন প্রাণের দীপ্তিতে সমৃদ্ধিতে দিকে দিকে সমুজ্জ্বল হয়ে ভরে উঠতে পারে।

অন্তঃপুর-শিক্ষা

পাঠশালা স্কুলকলেজ,—এ সব হচ্ছে শিক্ষাবিস্তারের বাঁধা এলাকা। এর পরে আছে লাইব্রেরি, পাঠচক্র। আরো কত উপায়ে শিক্ষাকে সর্বত্রগামিনী করা যায়, তার বিষয়ে নানা জনের মধ্যে চিন্তার বিনিময় হওয়া দরকার।

স্কুলকলেজে ছোটোরা এবং কিশোরেরা শিখতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয় যুবকদের শিক্ষাস্থল, লাইব্রেরি ও পাঠচক্রাদিতে সাধারণ শ্রেণীর বড়দেরও কিছু শেখবার সুযোগ মিলে। নিম্ন শ্রেণীর জন্যও জনশিক্ষার ক্ষেত্র গড়ে উঠ্‌ছে। বস্তিতে-বস্তিতে নিরক্ষতা দূরীকরণের চেষ্টাও চলছে নৈশ বিদ্যালয়ে। এ সব সুলক্ষণ সত্ত্বেও বলতে হবে, শিক্ষার জন্য তেমন নাড়া পড়েনি এমন অবহেলিত ক্ষেত্র চোখের উপরে অনেকস্থলে আজো রয়েছে বিদ্যমান। সমাজের বৃহৎ একটা অংশই বাদ পড়ে যাচ্ছে শিক্ষাসত্রের প্রসাদ বিতরণের শুভমুহূর্তে। সে-অংশটি আবার যেমন-তেমন নয়, জাতির জন্মদায়িনী এবং জীবপালিনী পরম অংশ। আমরা অন্তঃপুরের মেয়েদের কথা বলছি। এর মধ্যে রয়েছেন আমাদের মা, বোন, মেয়ে এবং গৃহিণীরা। বাইরে বেরিয়ে শিক্ষা নেওয়া নানা কারণে তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে সময়ের অভাব, অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক রীতির বাধা, আর্থিক এবং বয়সের প্রশ্নও আছে। যাতায়াতের সুবিধা-অসুবিধার কথাও ভাবতে হয়। বাইরে মেলামেশার সাহস কিংবা পরিশ্রমের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল।

"না জাগিলে সব ভারত ললনা"-র পরেও উচ্চতর কণ্ঠে শোনা গেছে—"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী" ইত্যাদি। এত শীঘ্র তা ভোলবার নয়, কিন্তু কার্যত তা স্মরণে রাখবার পরিচয়ই বা তেমন সুলভ হল কই? কাদের হাতে যে জাতিকে মানুষ করবার ভার, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সন্দেহ রাখেন নি।

দৈহিক স্বাস্থ্য, মানসিক চর্চা অর্থাৎ লেখাপড়া এবং আত্মিক সম্বন্ধ,—যার প্রকাশ-স্থল চরিত্র—এ সবই আমাদের গড়ে ওঠে সর্বপ্রথমে ঘরে, মায়ের হাতেই। সে গড়নে অজ্ঞানতা, বা অবহেলা ঘটলে মনুষ্যত্বের ভিতই কাঁচা থেকে যায়। এ জন্য, মায়েদের যে দায়িত্ব কত, তাদের শিক্ষাটাও যে সে-পরিমাণে কত দরকারী, বলে তা শেষ করা যায় না। অথচ, দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা সেখানটাতেই উদাসীন।

সন্তান-গঠনের প্রয়োজন ছেড়েও এখনকার দিনে মেয়েদের শিক্ষার আরো এক

বড়ো কারণই দেখা দিয়েছে। এবং সেটা জরুরি। তার গুরুত্বের কাছে আজ সন্তানের প্রশ্নও বাতিল হয়ে যাচ্ছে। জীবিকা জিনিসটা এতই ভয়ংকর হয়ে দেখা দিয়েছে মেয়েদের মহলেও। ভবিষ্যতে কখন্ কী হয়, তাই ভেবে আপন পায়ে মেয়েদের দাঁড়াবার জন্য তৈরি করে দিতে মেয়েদের অভিভাবকেরাই ঝুঁকেছেন আগে আগে। কিন্তু সে তো বিয়ের আগেকার কথা। সিলেবাস্ এবং রুটিন-মাফিক বাঁধা শিক্ষায় ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ-এর দেউড়ি পার হয়ে যতই মেয়েরা বি-এ, এম-এ-র সার্টিফিকেট পান, তার পরে লেখাপড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবার বেশি অবকাশ পেয়েছেন, এমন পাত্রী বিরল। ছেলেরাই পড়াশুনার পাট তুলে রাখে, মেয়েদের পক্ষের চর্চা না রাখা তো আরো স্বাভাবিক। কিন্তু লেখাপড়ার কথা হচ্ছে না, বাড়ি বা স্কুল কলেজের লেখাপড়ার আবহাওয়ায় যে একটু-আধটু শিক্ষিত মন গড়ে উঠতে থাকে, উচ্চশিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা কারো পক্ষেই তাকে সুপরিণতি দেবার সুযোগ মেলে না অন্তঃপুরিকা হয়ে গেলে।

দুধের বাটি, জামা বা কাঁথা, রান্না, সেলাই আর বড়ো-জোর ব্রতপার্বণ কিংবা পার্টি-সিনেমা,—এই নিয়ে জীবনের চক্ররেখা কেবল অন্তহীন পুনরাবৃত্তিতে আবর্তিত হতে থাকে। সাহিত্য, ইতিহাস, পাটিগণিত, স্বাস্থ্যতত্ত্ব,—সবই কোন্‌কালে শোনা কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়ায়। এসরাজ-সেতার, নাচ-গান, চিত্র, তাঁত—ভারিক্কি গিন্নিদের সৌখীন জামাকাপড়ের মতন ও-সব কিছুকেই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে স্মৃতির ট্রাঙ্কে তুলে রাখতে হয় পরবর্তী ছেলেমেয়েদের আবির্ভাব অপেক্ষায়। যখনই বিদ্যাকে কাজে লাগাবার সময়, সংসারে প্রবেশের সেই মুহূর্ত থেকেই শিক্ষা অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। আর যারা গোড়া থেকেই শিক্ষাবিহীন, শিক্ষার অভাব বোধ তো তাদের মনে থাকবেই না। সুতরাং স্কুল-কলেজ-লাইব্রেরির ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষাকে সমাপ্ত রাখলে, আসল কাজের বেলায় যেখানে শিক্ষার একান্ত দরকার,—সেই অন্তঃপুরের বদ্ধ জীবনে চিরদিনই অন্ধকার রাজত্ব করবে, কোনোদিনই সে ক্ষতি পূরণ হবে না। এ ক্ষতি কেবল মেয়েদেরই ক্ষতি নয়, মেয়েদের হাতে-গড়া মেয়ে ও পুরুষ সকল মানুষেরই এই ক্ষতি, সুতরাং জাতির উন্নতি বিধানে ব্রতী জাতীয় রাষ্ট্রও অন্তঃপুর-শিক্ষার প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন না, তাকে এ বিষয়েও যথোচিত মনোযোগী হতে হবে। শুধু শহরে নয়, গ্রামে গ্রামে তার সাহায্যের হস্ত সম্প্রসারিত হওয়া চাই।

অন্তঃপুরের এই শিক্ষাটা বেসরকারী শিক্ষার অন্তর্গত। বেসরকারী মানে স্কুলকলেজের বাঁধাধরা পথের বাইরের শিক্ষা হবে এটি। রবীন্দ্রনাথ সমাজের

শিক্ষাবঞ্চিত সাধারণের মধ্যে সহজে শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্যে এই বেসরকারী পন্থা গ্রহণই সমীচীন মনে করেছিলেন। তারই অন্যতম রূপ আজ "বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ"। কেবল কবিতায় দোষারোপ করেই কবি তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি। তিনি এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে গেছেন—সকলের সঙ্গে, বিশেষ করে অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষিত করে তোলাই যার মহৎ দায়িত্ব। জননীদের মূঢ়ত্ব ঘুচে গিয়ে কোটি কোটি সন্তানেরে মানুষ করবার দুরূহ কর্তব্যভার এ শিক্ষার ফলে কথঞ্চিতও যদি সুসহ হয়—এই ছিল কবির কামনা।

অন্তঃপুরিকাদের পক্ষে জ্ঞানের সমানই চাই আনন্দ এবং ঘরোয়া অর্থসংস্থানের উপায়। এমন কি, জ্ঞানের চেয়ে বেশি দরকার শেষোক্ত দুটি জিনিসের। আনন্দের তো নিতান্তই অভাব এবং আর্থিক আয়ের পথ ততোধিক সংকীর্ণ। আর্থিক আয়ের দ্বারা খেয়ে দেয়ে স্বাস্থ্যের দিকটা ঝালিয়ে নিয়ে একটু যদি হাঁফ ছাড়বার মতো আনন্দের অবকাশ এরা পায়, তখনই মাত্র জ্ঞানের প্রসার এদের মধ্যে সহজ হতে পারে। এই কারণেই জ্ঞানকে আপাতত এদের পক্ষে একটু গৌণ করেই দেখা হচ্ছে। নারীশিক্ষার আরো অনেক প্রতিষ্ঠান দেশে সৃষ্টি হয়েছে, সরোজনলিনী নারীমঙ্গল-সমিতি, লেডি অবলা বসুর নারী প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। নানাদিক দিয়ে এদের সকলেরই সাহায্যে শিক্ষা অন্তঃপুরে গিয়ে পৌঁছচ্ছে, একথাও ঠিক। কিন্তু আরো ব্যাপক ও ঘরোয়া রকমের আয়োজন আবশ্যক। সে বিষয়ে দু' একটি পন্থার কথা আলোচনা করা যেতে পারে। খুব নূতন কিছু নয়, পুরোনো অভ্যস্ত জিনিসেরই হেরফের মাত্র।

আজকাল লেখায় মেয়ে-মজলিশের কথা পড়তে পাওয়া যায় পত্রিকাগুলির রবিবাসরীয় পাতায়, পাড়ায় পাড়ায় এই সহজ জিনিসটার দেখাও যে না মিলে এমন নয়,—এটাকেই একটু গড়ে পিটে নিলে কেমন হয়? ছুটির দিন রবিবার। সপ্তাহে এই একদিন দুপুরে বা বিকালে বা সন্ধ্যায় মজলিশ বসবে। সেখানে লাইব্রেরির বই দেওয়া নেওয়া, কাগজপড়া, আলাপ আলোচনা, কুটীর-শিল্প শিক্ষা, গান বাজনা, চিত্র এবং দেশবিদেশের হালচাল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার নানারকম ব্যবস্থাই থাকতে পারে। লেখা, বলা, গল্পগুজব, হাতের কাজ,—সবই চলবে। পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে যেটুকু জানবার জেনে নেবে, শিখে নেবে। এমন কি খেলাধুলা, জলসা অভিনয়ও বাদ যাবে না। বনভোজন-ও বিনোদনের তালিকাভুক্ত হবে।

যেখানে যেখানে সম্ভব, সেখানে সপ্তাহে শুধু একবার না বসে এ মজলিশ প্রতিদিনই সুবিধামতো একটি বিশেষ সময়ে বসতে পারে। এবং একটি

বাসায় না বসে পাড়ায় বাসায় বাসায় পালাক্রমে এর বৈঠক হলেই ভালো হয়। এক-এক বিষয়ের অনুশীলনের জন্য এক-একটি দিন নির্দিষ্ট করা থাকবে। শহর বা গ্রামের তিনচারটি কেন্দ্রের মাসিক বা দ্বৈমাসিক অধিবেশনগুলি একস্থানে যুক্তভাবে হলে, আরো বেশি সামাজিকতার প্রসার ঘটবে, সংগঠনশক্তি ও শৃঙ্খলাবোধও বাড়বে। ইতিমধ্যে কোন্ কেন্দ্রে কত কাজ হয়েছে, কোন্ বিষয়ে কে কে বেশি অগ্রসর হয়েছেন, সেই পরিচয় কেন্দ্রের প্রতিবেদন থেকে প্রচার লাভ করলে, শিক্ষার্থিনীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্যম আপনি সঞ্চারিত হবে। এই মজলিশের মধ্যেই "লোকশিক্ষাসংসদে"র পরীক্ষার কেন্দ্রের কাজ চালাতেও বাধা নেই। প্রতিদিনের অধিবেশনগুলির মধ্যে ক্লাসের ছাঁচে একটু-আধটু পড়ানো, ঘরে করবার কাজ দেওয়া ও বুঝে নেওয়া খুব কঠিন হবে না। উন্নতির ধাপগুলি তাতে সহজে সুস্পষ্ট হয়ে সকলের চোখে পড়বে। এ জিনিসটির বাড়াবাড়ি হবে না, কিন্তু যেটুকু চর্চা হবে নিয়মিত হওয়া চাই। মধ্যে মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে বাইরে বেড়াতে যাওয়া, বাইরের কোনো সংঘ বা বিশিষ্ট গুণী, জ্ঞানী, কর্মী ও সাধু ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে এনে তাঁর কাছ থেকে নানা বিষয়ে নানা আলোচনা শোনা ; উৎসব-অনুষ্ঠান করা, যথা আনন্দমেলা, বিজয়া-সম্মিলনী, দীপালী-উৎসব, বীরাষ্টমী, রাখিবন্ধন, প্রভৃতি এবং আরো নানা উপলক্ষ, যেমন জাতিধর্মনির্বিশেষে মহাপুরুষদের আবির্ভাব-তিরোভাব, পৌরাণিক ব্রতপার্বণ, পূর্ণিমা-সম্মিলনী,—নানা উপলক্ষেই এরকম সাড়া দেওয়া,—শিক্ষার মধ্যে এ সবই হচ্ছে আনন্দ সংযোগের উপায়। আমরা জানি ধর্মালোচনাসূত্রেও মেয়েরা নিজেদের মধ্যে প্রবীণা-আধুনিকায় নিয়মিতরূপে একত্রে মিলেছেন। তাঁরা পাড়াগাঁয়ের মধ্যে থেকেও দল বেঁধে কীর্তন, অহর্নিশিযাপন, রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ এবং সে সঙ্গে শিল্পচর্চাদিও করেছেন। বারব্রতরূপে বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীর পাঁচালি পাঠ, শনিবারে সুবচনির পূজো, ক্ষেত্রবিশেষে এগুলিও উপেক্ষণীয় নয় ; এমন কি, অনেক স্থলে দেখা যাবে, এমন সব ব্রতোপলক্ষ আছে, যখন গ্রমের মেয়েরা একস্থলে একত্র হয়ে সেদিন ব্রতোদ্‌যাপনান্তে পরস্পর মিলেমিশে ফলাহার করে থাকেন। ঔপন্যাসিক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ইচ্ছামতী" গ্রন্থে এর উল্লেখ মিলে। এগুলি পৌরাণিক প্রথা হলেও মেয়েদের সামাজিক জীবনে আনন্দ ও সংগঠনের এক-একটি সুন্দর উপলক্ষ, তাতে সন্দেহ নাই।

শহরে বা মফঃস্বলে যেখানে-যেখানে স্কুলকলেজ আছে, সেখানকার শিক্ষিকা বা ছাত্রীসম্প্রদায় এই পুর-শিক্ষা বিস্তারের কাজে অগ্রসর হলেই ভলো হয়। শনি

ও রবিবারের ছুটির দিনগুলিতে এ একরকম তাদেরও অবসর-বিনোদনের আধুনিক উপলক্ষ হয়ে উঠতে পারে। অথচ, এর থেকে কত বড় একটা অন্দোলন পরিচালিত হয়, তা বেশি বলার দরকার করে না। এই যোগাযোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারীতা স্থানীয় নারীসমাজ এবং সেই থেকে সর্বসাধারণের মধ্যেও স্বগোচর হয়ে উঠতে পারে। স্কুলকলেজের মেয়েরা যেমন পাড়ায় পাড়ায় যাবেন, মাঝে মাঝে তেমনি পাড়ায় কেন্দ্রগুলি থেকে মেয়েদের ডেকে এনে, তাদের দিয়ে স্কুলকলেজে উৎসব, সভাসমিতি বা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত করাবেন। পরিচয় বিনিময়ে তাহলে পরস্পরের কাজে উৎসাহ বাড়বে, শিক্ষারও আদান-প্রদান হবে, প্রীতি দৃঢ় হবে।

আর্থিক সৌকর্যের জন্য পাশাপাশি যে হাতের কাজের শিক্ষা দরকার, তার গুরুত্ব সকলেই বুঝেছেন এবং সেদিকে অনেকেরই চিন্তা ও চেষ্টা নিয়োজিত রয়েছে। মহিলাদের কথা মহিলারা যতটা অনুভব করে বলতে পারবেন, অন্যদের কাছে ততটা আশা করা যায় না। বহুপূর্ব থেকে আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র রাজধানী-কলকাতাতে অভিজাত মহিলারাও একদিন এ বিষয়ে কতটা যে উপলব্ধি করেছিলেন এবং কাজেও নেমেছিলেন—তার পরিচয় এ প্রসঙ্গে উৎসাহজনক ও নানাদিক দিয়ে সহায়ক হতে পারে। স্বদেশী আমলের প্রথম পর্বের কথা। রবীন্দ্রনাথের পরিবারের মেয়েরা অগ্রণী হয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন "মহিলা শিল্পসমিতি"। রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৬৮—১৯২৫) ছিলেন সে সমিতির সম্পাদিকা। স্বদেশী-আন্দোলনের সুবিখ্যাত নেত্রী সরলাদেবী চৌধুরাণীর ইনি অগ্রজা। সেদিন যে প্রস্তাবপত্র সাধারণের সমক্ষে তাঁরা সমিতির পক্ষ থেকে প্রচারিত করেছিলেন, তার মধ্যে মহিলাদের শিল্পশিক্ষার ঘরোয়া রূপটি সুন্দরভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল। আজকের দিনেও তাকে সামনে রেখে আমরা চিন্তা ও চেষ্টার পথে অনেক দূর এগোতে পারি। প্রস্তাবনাটি সেজন্য সকলের গোচরে আনা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত তৎকালীন "ভাণ্ডার" পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে তুলে এনে এখানে সেটি সংকলিত করে দেওয়া গেল। এর মধ্যে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও মহিলাদের অন্তঃপুরশিক্ষার এই উদ্যোগে উৎসাহ জুগিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন প্রত্যক্ষভাবে। আপন বাটিতে সমিতির স্থান করে দিয়েছেন। চরখার প্রচলন নিয়ে পরবর্তীকালে চরখা-প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তীব্র বিরোধিতা করলেও, তাঁর পূর্ব ইতিহাসের আশ্চর্য একটি নজির রয়েছে এই প্রস্তাবনাটির মধ্যে। সেখানে দেখা যায়,

রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীর বহু পূর্বে এই "মহিলা শিল্পসমিতি"র কার্যসূচীর অন্তর্গত চরখা প্রচলনে অন্যতম সহায়ক হয়ে বিরাজমান। এই সমিতি থেকে মহিলাদের কুটীরশিল্পরূপে আয়করীবৃত্তি হিসাবে চরখা নিয়মিত শেখানো হচ্ছে, এবং এ কাজটিতে বিশেষভাবেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এ সমিতির পৃষ্ঠপোষকরূপে চরখার উপযোগিতা তখন থেকেই বুঝে এসেছেন। কেবল চরখা কাটার সর্বজনীন বাধ্যবাধকতায় তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল, সেটি নীতির বিচারের কথা।

কিন্তু দৈনিক আধঘণ্টা চরখা-কাটবার সর্বজনীন আবশ্যকতা মহাত্মাজি যে-যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সে-যুক্তিরই প্রয়োগ দেখা যায় এই প্রস্তাবনাটিরও মধ্যেই। তফাৎ এইটুকু যে, চরখা না হয়ে সেটি অন্য যে-কোনো শিল্পচর্চাই হতে পারে। "শিল্পাঞ্জলি-প্রদানে"র প্রস্তাবের স্থলে "আধঘণ্টা বা ১৫ মিনিট কাল" সকলকে এইরূপ "সাধারণার্থ শিল্পকর্ম" করবার কথা বলা হয়েছে। সে কর্মের উপজাত আয় "কোনো দেশহিতকর কার্যে প্রদান" করা হবে। দেশের জন্য আধঘণ্টা সুতাকাটার মৌলিক নীতিটাও তবে এখন খুব একটা অভিনব কিছু আর মনে হবে না। কবি ও কর্মীর মধ্যে বাদপ্রতিবাদ চলবার কালে এ ইতিহাসটুকুতে পরস্পরের নজর পড়লে তিক্ততা হয়তো কম হত। এ ইতিহাস আজ কেবল আমাদেরই উপভোগ্য হল।

সে যা হোক, নিম্নোক্ত প্রস্তাবনাটি খুবই প্রণিধানযোগ্য; কারণ, শুধু শিল্পই নয়, সংগঠনের দিকটাও এর মধ্যে সুপরিস্ফুট। পুরোনো এই পরিকল্পনাটিকেই অন্তঃপুর শিক্ষার শিল্প-বিভাগের সংগঠনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করলে কাজের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয় কিনা সকলে ভেবে দেখবেন।

"ভাণ্ডার" চৈত্র ১৩১২—১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা

প্রস্তাব

শিল্পসমিতি বা মহিলা শিল্পসমিতি

এই সমিতির দুইটি উদ্দেশ্য—একটির পরিচয় নামেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ মহিলাদের মধ্যে শিল্পশিক্ষা প্রচলন। ২য়টি স্বদেশের প্রতি অনুরাগবর্দ্ধন।...

...আজকাল ডাক্তার, শিক্ষয়িত্রী ও ধাত্রীরূপে অনেক মেয়েরা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন সত্য, কিন্তু এইরূপে জীবিকার্জ্জন এই অন্তঃপুর প্রথাপ্রবল দেশের

সাধারণ মেয়েদের উপযোগী নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই উদ্দেশ্যে ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে "মহিলা-শিল্প-সমিতি" নামে আমরা একটি সাপ্তাহিক মহিলা-সম্মিলনীর অধিবেশন করি। তাহাতে আপাততঃ নিম্নলিখিত কয়প্রকার শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করা গিয়াছিল।

১। সূচীকার্য্য—বখেয়া প্রভৃতি সাদা সেলাই হইতে আরম্ভ করিয়া জরী, রেশম, পশম, সূতার সকল প্রকার কারুকার্য্য।

২। কাঁটারকার্য্য—নিটিং ক্রোসে টাটিং-লেস্ বোনা, গোটা বোনা, ফিতা বোনা ইত্যাদি।

৩। কলের কাজ—Sewing Machine, Knitting Machine, Embroidering Machine ইত্যাদি। ইহার সঙ্গে তাঁতের বন্দোবস্তও ছিল। কাপড়ের তাঁত মেয়েরা করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ, তবে আসামী তাঁত বা ভুটিয়া তাঁত (যাহাতে সতরঞ্চি হয়) করিতেও পারেন।

৪। হাতের কাজ—কাপড় ছাঁটা, পুঁথির কাগজ, কাপড়, মোম, মাটী, কাঠ, চামড়া প্রভৃতির জিনিস প্রস্তুত করণ।

৫। চিত্রবিদ্যা।

৬। সঙ্গীত, গান ও স্বরলিপি।

শিল্পসমিতির প্রথম অধিবেশনে মহিলাগণকে চরকা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। শিক্ষার্থিনীগণ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে এক বৎসরের মধ্যে যাহাতে অন্তঃত একখানি সাড়ির পরিমান সূতা কাটিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন।···

···মহিলাদের নিজের শিক্ষার জন্য কলিকাতার ৫।৬টি স্থানে কোন মহিলার বাটীতে কতকগুলি সাপ্তাহিক অধিবেশন হইবে। ইহার নাম অন্তঃপুর কলাভবন। কিন্তু এই কলাভবন সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে কেবলমাত্র শিল্পশিক্ষা ইহার উদ্দেশ্য নহে। এটি সমিতির অধিবেশন, যেমন সাহিত্য সমিতিতে প্রবন্ধ পাঠ সেই রূপ এখানে শিল্পচর্চ্চা থাকিবে। প্রবন্ধগুলি পড়িয়া যে আনন্দ লাভ হইত সমিতিতে পড়া শুনিলে তাহাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হয় সেইরূপ অনেক মহিলা যাঁহারা এখানে আসিবেন, গাড়ীভাড়া দিয়া আসা অপেক্ষা কেবল শিক্ষাই উদ্দেশ্য হইলে বাড়িতে শিক্ষা করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা হইলে মেশামেশির আনন্দে বঞ্চিত হইতেন। যেমন সঙ্গীত সমাজ কেবল মাত্র সঙ্গীত শিক্ষার স্থল নহে পুরুষদিগের একটি club তেমনি এই কলাভবনও মেয়েদের একটি মজলিস তাহার সঙ্গে শিল্পচর্চ্চা থাকিবে। এখন কেবলমাত্র ২৫নং ল্যান্সডাউন রোডে বৃহস্পতিবারে

এই অধিবেশন হয়। ক্রমে যাহাতে কলিকাতার প্রধান প্রধান পাড়ায় একটি সাপ্তাহিক অধিবেশন হয় তাহার বন্দোবস্ত করা হইবে। ইহার সুবিধা এই যে—মহিলারা ইচ্ছা করিলে একাধিক অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন। এই অধিবেশনে মহিলারা পরস্পরের নিকট শিল্পশিক্ষা করিবেন এবং আবশ্যক হইলে বিশেষত কাপড় ছাঁটা ও কল প্রভৃতির শিক্ষার জন্য বেতন দিয়া লোক নিযুক্ত করা হইবে।

অন্তঃপুরে গৃহে গৃহে এখন শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার যোড়াসাঁকোর বাটীতে এই নারীশিল্পশালা প্রতিষ্ঠা করিবার অনুমতি দিয়া আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। অন্তঃপুরের সকল মেয়েরা যে একত্র হইয়া কলাভবনে শিক্ষা আরম্ভ করিবেন তাহা আশা করা যায় না। তাঁহাদের আসিবার বাধা অনেক—সংসারের কাজ, ছেলেদের দেখা, গাড়ীর অসুবিধা ইত্যাদি। কিন্তু যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদের সাহায্যে অন্তঃপুরে এই শিক্ষা অনেকটা প্রচলন হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। দেখা যায় যে পাড়ার মধ্যে কোন শিল্পপারদর্শিনী থাকিলে প্রতিবেশিনীরা সকলে সাগ্রহে তাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়া থাকেন। আর নারীশিল্পশালার একটি প্রধান উদ্দেশ্য যে শিল্প-শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা। তাঁহারা পরে বাড়ী বাড়ী গিয়া শিল্প শিক্ষা দিবেন।

অন্তঃপুর কলাভবন ও নারীশিল্পশালা প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সমিতি হইতে আর একটি কার্য্য গ্রহণ করা হইয়াছে। সেটি মহিলাদের মধ্যে মাতৃব্রত প্রচলনের চেষ্টা। কেবল যে সমিতির মহিলাদের মধ্যে এই ব্রত পরিচালিত করা হইয়াছে তাহা নহে যাহাতে কলিকাতা ও মফঃস্বলের ঘরে ঘরে ইহা চলিত হয় তাহার চেষ্টা করা যাইতেছে। যেমন আমাদের পিতা, মাতা, ভাই, বোন, স্বামী, সন্তান সকলের প্রতি কিছু কর্ত্তব্য আছে, সেইরূপ জন্মভূমির প্রতিও আমাদের কিছু কর্ত্তব্য আছে, এই ভাব যাহাতে ভারতমহিলার মধ্যে বিস্তৃত হইয়া তাঁহাদের মাতৃপূজায় দেশের কার্য্যে রত করিতে পারে, এই ব্রত গ্রহণের তাহাই উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মধ্যে সভা বা বক্তৃতার চলন নাই, সেই জন্য সে উপায়ে কাজ করিতে চেষ্টা করিলে মেয়েদের মধ্যে তাহার তেমন ফল হয় না, কারণ এগুলি তাঁহাদের মনে তেমন বসে না। তাঁহাদের দ্বারা কাজ করাইতে হইলে যে কাজ তাঁরা সহজে করিতে পারেন আর যাহাতে তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হয় এমন উপায়ে করান আবশ্যক। নানারকম ব্রতগ্রহণ ও ব্রত পালনে বঙ্গরমণী চিরদিন অভ্যস্ত, এই মাতৃপূজাকেও যদি বঙ্গরমণী ব্রতরূপে গ্রহণ করেন তবে তাহাতে

বিশেষ অনুরাগবতী হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। ব্রতটির দুইটি অঙ্গ, একটি লক্ষ্মীর কৌটা স্থাপন আর একটি শিল্পাঞ্জলি প্রদান। একটি দেশের উদ্দেশ্যে দৈনিক মুষ্টি ভিক্ষা রাখা আর একটি কিছু কিছু সেলাই করা। দুইটি তাঁহাদের অভ্যস্ত কর্ম্ম ও আদরের জিনিস।...

...ব্রতধারিণী প্রতিদিন ভাঁড়ার দিবার সময় সেই পাত্রে একটি বা দুইটি পয়সা বা দু এক মুষ্টি চাল রাখিয়া দিবেন এবং এইরূপে সঞ্চিত দান ১লা বৈশাখ বা বিজয়াদশমীর দিন বা মাসে মাসে জননী জন্মভূমির পূজার জন্য দান করিবেন, আর প্রতি ব্রতধারিণীর আরও একটি মহিলাকে এই ব্রত ধারণ করাইতে হইবে।

রমণীগণ ঘরে ঘরে যদি এই "লক্ষ্মীর কৌটা" স্থাপন করেন, তবে দ্রৌপদীর হাঁড়ি যেমন কখনও শূন্য হইত না, একটি শাকান্ন হইতে সহস্র লোককে খাওয়াইতে পারিতেন, তেমনি আমাদের গৃহলক্ষ্মীর একমুঠা চাউলে দেশের ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিবে।

এই সঞ্চয় স্থানীয় শিল্পোন্নতির সাহায্যার্থে কিম্বা জাতীয় ভাণ্ডারে বা যে কোন দেশহিত-কর কার্য্যে দেওয়া যাইতে পারে। তবে রমণীর সাহায্যের উপর রমণীর দাবীই অধিক, সেইজন্য অধিকাংশ ব্রতধারিণী মহিলাশিল্পসমিতিতেই এই সঞ্চয় দান করিতে চাহিয়াছেন।

এই সঞ্চয় দ্বারা ভদ্র ঘরের অনাথা বিধবাগণ যাহাতে অন্তঃপুরে থাকিয়া শিল্পাদি কর্ম্ম শিক্ষা ও বিক্রয় দ্বারা সদুপায়ে অপনার জীবিকার্জ্জন ও ক্লেশ লাঘব করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা যাইবে। · একটি উপায় "লক্ষ্মীর কৌটা" ব্রত গ্রহণ করার কথা বলা হইল। এখন আর একটি উপায় বলিতেছি, এটির নাম শিল্পাঞ্জলি। যে ব্রতই গ্রহণ করিতে হইবে, যত্নের সঙ্গে পালন করিতে হইবে। ব্রতর অর্থই তাই।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকমাত্রেই অল্পবিস্তর শিল্পকার্য্য কিছু জানেন। অবসর সময়ের কিছু সময় যদি এই শিল্পকর্ম্মে ব্যয় করিয়া সেটি দেশের উদ্দেশ্যে দান করেন তবে আমাদের স্বদেশানুরাগ শিক্ষার অনেকটা সহায়তা করিবে। · প্রথমটির বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়টি এই প্রকার—যিনি যে শিল্পকর্ম্ম জানেন তাহা একটি আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন আধঘণ্টা বা ১৫ মিনিট কাল তাহা করিবেন। যখন তাহা শেষ হইবে তাহা বিক্রয় করিয়া বিক্রীত অর্থ হইতে আর একটি সেই প্রকার বা অন্যপ্রকার শিল্পকর্ম্মের উপযোগী ব্যয় রাখিয়া যে অর্থ বাকী থাকিবে তাহা কোন দেশহিতকর কার্য্যে প্রদান করিবেন। বরাবর এইরূপ চলিবে।

সমিতি হইতে যে মহিলাগণ শিল্পাঞ্জলি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সমিতি হইতে উপকরণ দেওয়া হইবে। এবং প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে লাভ হইবে তাহা নারীশিল্পশালার জন্য ব্যয়িত হইবে।....

এ বৎসর যাঁহারা শিল্পাঞ্জলি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সকলকেই নূতন উপকরণ দেওয়া হইয়াছে। আগামী বৎসর উহার সহিত এই কার্য্যটি যোগ হইবে। পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করিয়া তাহা কাটিয়া ও মেরামত করিয়া ব্যবহার যোগ্য কাপড় তৈয়ারি হইবে এবং তাহা দরিদ্রগণকে বিশেষতঃ বালকবালিকা-গণকে বিতরণ করা হইবে।...

আমাদের আর একটি অভাব হইয়াছে,—খেলনা। স্বদেশী ভাল খেলনা প্রায় লোপ পাইয়াছে। যাহাও পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ করা দুষ্কর। সমিতি হইতে কতকগুলি নূতন খেলনা প্রস্তুত করান ও বিভিন্ন স্থান হইতে খেলনা সংগ্রহের আয়োজন করা হইতেছে।

মহিলা সম্মিলন—শিল্পশিক্ষার নিমিত্ত মহিলাদের সাপ্তাহিক সম্মিলন হইবে। তদ্ভিন্ন সমিতির ত্রৈমাসিক অধিবেশনে কলিকাতার সমুদয় মহিলাকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। তাহাতে সঙ্গীত ও কবিতাবৃত্তি থাকিবে, শিল্পাঞ্জলির রচিত দ্রব্যগুলি এবং খেলনা বিক্রয়ার্থে থাকিবে। নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির নমুনা দেখান হইবে আর তাঁতিনী, ময়রাণী প্রভৃতিকে কাপড় ও খাবার আনিতে বলা হইবে।...

—শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

হিরণ্ময়ী দেবীর এই প্রস্তাবনাটিতে মেয়েদের আয়করী বৃত্তির কথা আলোচিত হয়ে থাকলেও শিক্ষা ও আনন্দের অন্যান্য উপলক্ষগুলিও তার অঙ্গীভূত হয়েছে, এটুকু সকলে লক্ষ্য করে থাকবেন। তার মানে, সব দিক দিয়েই শিক্ষা চাই। তার মধ্যে এ কথা যেন আবার আমরা বিশেষ ক'রে মনে রাখি যে, সন্তানই মায়েদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও শ্রেষ্ঠ পরিচয়। জাতিরও শ্রেষ্ঠ নির্ভর তার সন্তানই। দেশসেবকদের সাধারণ নামই দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—'সন্তান'। সন্তানপালনের শ্রেষ্ঠ দায়িত্বের মধ্যে মায়েরা সাধারণত শিশুদের খাওয়া আর পরা, এ দুটি বিষয়েই প্রায় সমস্ত যত্ন চেষ্টা নিবদ্ধ ক'রে রাখেন। তাদের মনের খোরাক ও চারিত্রগঠনে ততটা মনোযোগী হন না। এই দুটি ক্ষেত্রেই শিক্ষার প্রয়োজন হয় বেশি। সে-শিক্ষা তারা যদি নিজেরা না পান, সন্তানকে দেবেন কী ক'রে? কিন্তু এদিকে আবার দেখা যায়, সন্তানপালন এবং গৃহকর্ম সম্পাদনেই মায়েদের

শক্তি ও সময় সব টেনে নিচ্ছে। শিক্ষা অভ্যাসের জন্য আর কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না। ক্লান্ত দেহে মনে শিক্ষার উদ্যম স্বভাবতই হয় স্তিমিত। এ সমস্যার প্রতিকার আবশ্যক। প্রতিকারের অন্যতম উপায় হচ্ছে, কিছুটা লক্ষ্যের পরিবর্তন। সন্তানের পালনই শুধু নয়, তার সংগঠনও হওয়া চাই প্রধান কর্তব্যের অঙ্গ। সকলে এই কর্মকেই সামাজিক গুরুত্ব দান করলে, পার্টি, সিনেমা, প্রসাধন, এবং বিলাসসম্ভোগের আর পাঁচটা উপকরণ ও উপলক্ষের চাপ কমে আসবে। সন্তান গঠনের জন্য নিজেদের পক্ষে আবশ্যকীয় অভাব পূরণের শিক্ষাচর্চায় অনেকটা অবসর মিলবে, সন্দেহ নাই।

শুধু কেবল সন্তান সংগঠনও নয়; মেয়েদের নিজেদের জন্যও শিক্ষার দরকার আছে। অবকাশ, আনন্দ ও বিচিত্র অনুশীলনের অভাবে জীবনের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। মেয়েদের পরিপুষ্ট জীবন পরিবারের পরিপুষ্টির উৎস। সমাজের ও পরিবারের সমৃদ্ধির জন্য মেয়েদের এই অন্তঃপুরের শিক্ষা প্রসারের কাজে সমাজের নারী-পুরুষ সকলেরই অংশ গ্রহণ করা কর্তব্য।

দেশে জনশিক্ষার কথা আলোচিত হচ্ছে। আজকের দিনে জনশিক্ষা দরকার, কিন্তু সে শিক্ষার স্বরূপ কী, কী উপায়ে তার বিস্তৃতি ঘটবে, সেইটে চিন্তার বিষয়। দুরূহ বাধা পড়ে আছে সামনে, সমস্ত প্রণালীকে তাতে ব্যর্থ বা বিলম্বিত করে। ভদ্রাভদ্রের দুস্তর ভেদ, তাদের ভিতরকার উচ্চনীচের মনোবিকার হচ্ছে সেই মূলগত বাধা। এই জটিলতা দূর না হলে জমি তৈরি হবে না, মাটিতে বীজ ভালো ক'রে বসবে না, সুফল সুদূরপরাহত।

সমাজ শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, ছোটোয় বড়োয় দুই ভাগে বিভক্ত। শিক্ষা এ পর্যন্ত শিক্ষিতেরই জন্য বরাদ্দ হয়ে আসছিল, অবশেষে জনশিক্ষার দিকে শিক্ষিতদের দৃষ্টি পড়ল। ভালো কথা। কিন্তু এসময়েই ভেবে দেখা দরকার, সমাজের অবস্থাটা কী, এ-শিক্ষায় কাদের কতটা অংশ। কাদের কতটা প্রয়োজন, এবং শিক্ষা কিসের জন্য,—সেই বুঝেই দরকার মতো শিক্ষাপ্রচারের প্রণালীও পরিবর্তিত ক'রে নিতে হবে। আজকের আন্দোলনটা চলেছে একদিকে ঝুঁকে। আমরা কেবল দিতেই যাচ্ছি। উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, শিক্ষিতদের দিক থেকে অশিক্ষিত জনসাধারণের উপর শিক্ষাকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি না, তাও বিবেচ্য। অশিক্ষিতেরা আজ শিক্ষিত সমাজের কাছে মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও কি সম্পদ কিছু ছিল না? এখনো যা আছে, তারো কি সম্যক্ সন্ধান হয়েছে? মানুষের কোনো জিনিসই সহজে তুচ্ছ করবার নয়। কালের প্রয়োজনে, বা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির দরুণ অনেক জিনিস অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে। তবেই দেখা যাচ্ছে,—আজকের একপেশে কাজের ধারাটা যা চলছে তা নিখুঁত নয়, সে ধারা হওয়া দরকার দু'মুখো। তার এক মুখ থাকবে ওদের দিকে, সেদিকে আমরা ওদের দেব, অন্যমুখটা থাকবে আমাদের দিকে, সেদিকে ওদের কাছ থেকে নেবার থাকলে আমাদের নিতেও হবে।

আমরা ওদের দিতে পারি আক্ষরিক জ্ঞান। লেখাপড়াটা ওরা জানে না, জানে না অফিসের কায়দাকানুন, আধুনিক বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্র-শাসনতন্ত্র সম্বন্ধেও ওদের চেতনা কম। স্বাস্থ্য, বিশেষ ক'রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ওদের অজানা। আজকাল এ বিষয়গুলি জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অপরিহার্য, এবং এ সম্বন্ধে আমাদের

সাহায্যও ওদের পক্ষে কার্যকর,—এতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের সঙ্গ এবং শিক্ষা ওদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে সঙ্গে-সঙ্গে সে বিষয়েও আমাদের অবহিত থাকা দরকার।

চারদিক দিয়ে নিত্য-নূতন অভাবের তাড়না, জীবনে অসন্তোষ, জীবিকা নিয়ে প্রতিযোগিতা, বেমালুম বিশ্বাসঘাতকতা,—এ সবের হাত থেকে আমরা নিজেরাই ত্রাণের পথ পাচ্ছিনে, পথ অন্যকে দেখাব কী করে? তবু যদি দেখাবার কিছু থাকে, তাও খুঁজে দেখা দরকার।

শিক্ষিত সমাজের শিক্ষা বুদ্ধি-প্রধান। বুদ্ধির কাজ বিচার করা। প্রত্যেক জিনিসেরই নানাদিক দিয়ে বিচার করবার আছে, তাতে সমাধানে নিয়ে না যাক্, চিন্তা করবার পথ খুলে দেয়,—এইটুকুই যদি একটা সার্থকতা বলে ধরা যায়, তবেই এ শিক্ষার সংগতি মিলে। অবশ্য মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনায় তাই রয়েছে: "অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও!" মনের গ্রন্থি-মোচন,—এই তো শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। জটিলতার জালে ঘিরে আছে। যত অন্ধগহ্বরে গিয়ে পড়িনে কেন, সঙ্গে কেবল একটি দীপশিখা চাই—অন্তরের মধ্যে মননশীলতা, যুক্তিযুক্তভাবে ভাববার ক্ষমতা। যে-শিক্ষায় সেইটি ধরিয়ে দেয়, তাকেই চাই; সমস্যাকে বুঝতে পারলে সমাধানের জন্য চিন্তা নেই। জীবনে অশান্তির অন্ত নেই বটে, কিন্তু শান্তিও চলেছে হাত-ধরাধরি ক'রে,—দেখবার দৃষ্টি পেলে সে-কথা বুঝতে পারি। শিক্ষার এই লোভ উচ্চস্তরের জিনিস। সাধারণ শিক্ষায় এতটা তলিয়ে বোঝবার শক্তি মিলে না। সেই উচ্চস্তরের বিচারবুদ্ধি জন্মাবার মতো অবস্থায় সাধারণকে পৌঁছে দিতে পারা যাবে?—না, মাঝপথে নিয়ে বেঘোরে তাদের ছেড়ে দেব, এটাও ভাবা দরকার। অন্তত সেখানে পৌঁছবারই যদি উদ্দেশ্য থাকে তাও ভালো; তবে যাকে যেটুকু শিক্ষাই দেওয়া যাবে, সে-শিক্ষার ভিত্তিতে থাকবে বিচারবুদ্ধির সঙ্গে বিষয়বস্তুর সর্বাঙ্গীণ ভাবের ধারণা জন্মাবার চেষ্টা। এর থেকে জীবনে মানুষ বিচক্ষণ ও বেদনাশীল হয়ে উঠবে। আমাদের দিক থেকে সাধারণের কাছে এই প্রকৃতির শিক্ষাই আমরা নিয়ে যাব। আসলে 'আমাদের' আর 'ওদের' ব'লে শিক্ষায় কোনো ভেদের ছাপ দেওয়াটাই অস্বাস্থ্যকর। মানুষের সব শিক্ষাই যে সকলের পক্ষে শিক্ষণীয়, এ সম্বন্ধে ঢালা অধিকার দিয়ে রাখাই শ্রেয়। বিধাতার দেওয়া আলো বাতাসের মতো, বিদ্যাও সকলেরই সহজ সম্পদ। সকলের জন্যই এর যোগ্য পরিবেশ ও প্রস্তুতির ব্যবস্থা থাকা দরকার।

সমাজে সকলেই বাস করছি, কাউকে বাদ দিলে চলে না। কথাটা তুলছিলেন

রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছিলেন,—কতগুলি লোক কেবল কি পিলসুজ হয়েই থাকবে? গায়ে তেলগড়ানো ময়লা মেখেই তাদের দিন যাবে, আর, চিরদিন আলোর গৌরব নেব প্রদীপ সেজে শুধু আমরাই? কেবল কি খাওয়াপরার প্রয়োজনেই সে-লোকগুলির যোগ স্বীকার করব, জৈবধর্মের দিক ছাড়া মানব-ধর্মের কোনো বিশিষ্ট গুণের দিকে তাদের প্রকাশ কি কোথাও উজ্জ্বল হয়ে নেই? মানুষের মধ্যে তারা কি নিতান্তই জন্মত আমাদের সঙ্গে জাত-ছাড়া? তা নয়;—একটু মেজে নিলেই দেখা যাবে, যে-পিতলে প্রদীপ তৈরি, পিলসুজটাও সেই পিতলেরই গড়া। তাকে ক্লেদাক্ত রেখে প্রদীপটার চাকচিক্য যতই বাড়াব, ততই প্রদীপের সৌন্দর্য আরো হাস্যকর হয়ে উঠবে। আলোকের দূত শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর বা অশোক, আকবর, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, অরবিন্দ ইত্যাদি নরোত্তমদের নামের তালিকা নিয়ে যতই গৌরবের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করব, ততই তিমিরলোকবাসী তেত্রিশ কোটির শোচনীয় দশাটা রাহুর মতো হাঁ ক'রে সে-মাহাত্ম্য গিলতে ছুটবে পিছনে পিছনেই। আমাদের একদিকের মাহাত্ম্যই আমাদের অন্যদিকের ক্ষুদ্রত্বকে অতি বিসদৃশ ক'রে চোখে পড়িয়ে দিচ্ছে। এ-বৈসাদৃশ্য না ঘুচালে নয়। এ জন্যই দু'মহলে সুস্থ যোগাযোগ আবশ্যক। এক-পক্ষে উন্নাসিকতা ও অন্যপক্ষে হীনমন্যতা বজায় রেখে যোগাযোগ সুস্থ হবার নয়। দেওয়া-নেওয়ার কাজ চলা চাই। সে-কাজ কেবল বাইরের ব্যবসাগত স্থূল প্রয়োজনে ঘটলে হবে না, তা সংস্কৃতিগত হওয়া দরকার। সেখানেই শিক্ষার আদানপ্রদানের কথা এসে পড়ে। সকলের কাছ থেকেই সকলের মনের সম্পদও কিছু নেবার আছে; তার খোঁজ পেলেই শ্রদ্ধাপ্রীতির ধারা সহজভাবেই সকলের ভিতর খেলতে থাকবে। এখন তাই খুঁজতে হবে ওদের কাছ থেকে আমরা কুড়িয়ে নিতে পারি, শিক্ষার বিষয় এমন কী আছে, যা ছড়িয়ে আছে ওদের পর্ণকুটীরেও। ওদের কাছে সে ভাবেই আমরা যাব, যেভাবে যাই সাজি নিয়ে ফুলগাছের কাছে। গাছ জানে না, কী সম্পদ সে ঝরিয়ে দিচ্ছে ফুল-ফলের মধ্যে। তলার থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আমরা মালা গাঁথি, দেবতার ভোগ সজাই তা দিয়ে। ওদের দর-কারের চেয়েও যা ওদের বেশি, যা বিলিয়ে দিয়েই আনন্দ,—সেই উদ্বৃত্ত অংশই কেবল আমরা সংগ্রহ করতে পারি।

এমন জিনিস ওদের সহজ রসানুভূতি, তারপরে আছে শিল্প এবং ধর্মবোধ। লিখতে পড়তে জানে না ব'লেই হয়তো চিন্তার বিকার ওদের মধ্যে তত দেখা দেয়নি; রাগ-অনুরাগের গতি সোজাসুজি; সরল রকমের তীব্রতা আছে, বিচিত্র

বিলাস নেই। বিশ্বাসের সবলতা এখনো ওদের মধ্যেই সুলভ। ধর্মের দোহাই দিতে পারার মতো কোনো একটা দিকে নৈতিক নির্ভর ওদেরই এখনো বজায় আছে।

ওদের রসবোধ ও সাহিত্যশিল্পের পরিচয় এক-এক সময় যা মেলে সে বিস্ময়কর। তখন মনে হয়, আমরা ওদের শেখাব কী, ওদের মতো সহজ অধিকার পেতে আমাদের বহু ঘষামাজা, বহু জন্মের সুকৃতি আবশ্যক। ওদের সৃষ্টি লিখিত-অক্ষরে নেই, মানস সরোবরের কমলের মতো মনে-মনে তা ভেসে বেড়াচ্ছে। বেশির ভাগ রচনাই গান,—সুর ও ছন্দের শিল্পসাজ পরা। কবি, পাঁচালি, ছড়া, যাত্রা, কীর্তন, সারি, জারি—এ সব তো ওরাই এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু সে-সৃষ্টির মালায় নূতন সংযোজনা আর তেমন সম্ভব হচ্ছে না। বাউলের গানগুলি ইতিপূর্বেই সুধীজনদের হৃদয় আকর্ষণ করেছে। তার গভীরতা, মাধুর্য, এবং বাক্‌সংযম অতুলনীয়। মঙ্গল-গাঁথা ও প্রবচনগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করে তুলেছে।

সম বৃত্তির ক্ষেত্রে কারো মর্যাদা স্বীকার করাই হচ্ছে খাঁটি সহৃদয়তার পরিচয়। বিদ্যা বা চরিত্রের কোনোদিক নিয়ে সেভাবে ওদের মূল্য আমরা স্বীকার করি কি? সাহিত্যসংগীতাদি যেখানে সৃষ্টিধর্মী, সে-স্তরে এদের আগল দেওয়া দূরে থাক, এদের অধিকার-সম্ভাবনার কথা আমরা ভাবতে-ও পারিনে। অন্নবস্ত্র বিতরণ, অর্থোপার্জনের উপায় নির্ধারণ, গ্রামপরিষ্করণ ইত্যাদি স্থূলকাজে এদের ডাক পড়বে সহযোগিতার, কিন্তু যেখানে কোনো গুণের আসর, যেখানে সম্মানের গন্ধ রয়েছে, সেখানে আমরাই শুধু একচ্ছত্র অধিকারী,—এটা জানা কথা; সেখানে সমকক্ষ সঙ্গী হিসাবে ওদের ডাক পড়েনি, কখনো যে পড়বে, তারও কোনো আভাস সুগোচর নয়। ওদের ভাগ্যে যখন যেটুকু মেলে সেটা সম্মান, উপহার বা অর্ঘ্য নয়—বড় জোর বকশিস! তা দিয়ে ওদের কৃতার্থ করা হয় মাত্র। দয়াদাক্ষিণ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে একচুলও তা এগোবার নয়। অথচ ওদের সহজাত শিল্পীমন মাঝে মাঝে যা সৃষ্টি করে নিতান্ত তা ফেলবার হয় না; ওদের শক্তির সহজ সাবলীল গতিচ্ছন্দ বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্যতাও নিশ্চয়ই রাখে। লক্ষ্য করা গেছে গদ্য-রচনাও এদের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে এবং তা যে কিরূপ সরস, স্নিগ্ধ ও সুন্দর হয়ে ওঠে সামান্য একটু নমুনা দেওয়া যাচ্ছে। মাত্র দ্বিতীয়ভাগ পড়া ছিল পাঠ-শালায়। তারপরেই তাঁতবুনে, র‍্যাদা ঠেলে চলছে দিন। নাম—শ্রীতারাপদ হাজরা। বাস—ভুবনডাঙা। জাতে হাড়ি। নানাভাবে ছেলেটিকে খেটে খেতে

হয়। এরি মধ্যে শেখে সে রবীন্দ্রসংগীত, লেখে ডায়েরির মতো ক'রে যখন যা মনে আসে। তারই খাতার একখানি পাতায় লেখা রয়েছে একদিনের কিছু কথা। লিখছে :

" "সারদা-সাগরে"র পারে গাছ আছে, নানান রকমের ফুল ও ফলের। পাখীরা ফল খায়, গান গায়। চারি পাড়টা উঁচু। বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। পথিকেরা ঘাটের উপর বসলে গাছগুলো তাদের মাথায় ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। জলের ধারে-ধারে সবুজ রঙের দলগুলি হেলছে-দুলছে ঢেউয়ের তালে-তালে। রাশি-রাশি ঢেউ আসছে। ধারে লেগে টুক্‌রো-টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে কতকগুলি পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। ভ্রমর প্রজাপতির মেলা জমে উঠেছে। পাতার উপর জলের গুটিগুলি সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে মুক্তোর মতো। অনেকদিন আগেকার কথা, সারদা নামে কোনো এক ভদ্রমহিলা ছিলেন। তাঁরই স্মৃতি-কল্পে এই "সারদা-সাগর" হয়েছে।

সাধারণতঃ মানুষ যখন এ-পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় তখন তার নাম করবার কেউ থাকে না। তাই এই স্মৃতি-চিহ্নটি রেখে গেছেন, মানুষের মনে বার-বার তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য।

পথ-শ্রান্ত ক্লান্ত-পথিক যখন এই পথ দিয়ে যায়, "সারদা-সাগর" তাদের যেন ইঙ্গিত ক'রে ডেকে বলে, "ও পথিক এখানে একটু বিশ্রাম করে যাও।" পথিকেরা জল খায়, বিশ্রাম করে, তারপর যে যার জায়গায় চলে যায়।

"সারদা-সাগর" থেকে কিছুদূর গিয়েই একটা পুকুর আছে। সেই পুকুরের পারে একটা কালী-মন্দির আছে। সেইজন্য এই পুকুরটির নাম দেওয়া হয়েছে—"কালী সায়ের।" এই কালী-মন্দিরে প্রত্যেক মঙ্গল ও শনিবার পূজা হয়। আমি যখন 'কালী-সায়ের' পেরিয়েছি, কারখানার ঘণ্টা পড়ল—ঢং-ঢং-ঢং। অমনি কর্মীরা আসতে শুরু করে দিল। আমিও তাদের সঙ্গে কারখানায় চলে গেলাম।"

এ শুধু একজন নয়, এই শ্রেণীর কয়েকজনের কয়েকটি লেখাই এরূপ নজরে পড়েছে, তার মধ্যে আর একটি এই,—এ ছেলেটির নাম নিমাই দাস, জাতে বোষ্টম, এরও বাস ভুবনডাঙ্গা। সে লিখছে :

"এইভাবে কাটলো অনেক রাত। তারপর ঘুমিয়েছি কখন, কে জানে।

সকাল হ'ল। ঘুম ভেঙ্গে গেল ; পাখীর চেঁচামেচি চলছে। যেদিকে তাকাই শুনি, কিচির-মিচির,—কিচির-মিচির, ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্। হঠাৎ শিউরে উঠলাম।

তারি মাঝে ভেসে আসছে,—কান্নার শব্দ! উঠে পড়লাম এক লাফে। বাইরে দেখি,—বাবা দাঁড়িয়ে,—আর সেই লোকটি। দুপা জড়িয়ে ধরেছে, ক্ষমা চাচ্ছে, ভেউ-ভেউ ক'রে কাঁদছে।

তারপর বেরিয়ে পড়লাম, বন্ধুকে নিয়ে। গঙ্গার তট বেয়ে, সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে, চল্‌ছি চল্‌ছি। নদীর কিনার ঘেঁষে চল্‌ছি।

কত শত নৌকা। এক লাইনে থাকায় মনে হয়, কতকগুলি শিবির। তাঁবু টাঙ্গিয়ে আছে। অকাতরে ঘুমোচ্ছে মাঝিরা।

গঙ্গার পবিত্র হাওয়া; ফুরফুর ক'রে বইছে। ছোট ছোট ঢেউগুলি ভেসে যাচ্ছে। স্নিগ্ধ সুশান্ত গঙ্গা, সকালবেলা ঘুম-থেকে-ওঠা প্রশান্ত মূর্তি!

ওপারে, বহুদূরে, সারি সারি গাছ। বিরাট তাদের বংশ। বহু নীচে, গঙ্গা-বক্ষে, আর এক শ্রেণী। ঢেউগুলির সঙ্গে তারা দুল্‌ছে।

সূর্য উঠছে। প্রকাণ্ড দেহখানা। সমস্ত গায় সিঁদুর ঢালা। লাল টুকটুকে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তারি আভা। তাই লালেলাল যে দিকে তাকাই। বেলা যত বাড়ে ক্রমশঃ রং মিশে যায়। আমরা ফিরে এলাম।

এ-জায়গা ও-জায়গা ক'রে সব ঘুরলাম। কেবল মড়ার মাথা, হাড়গোড়; ছড়ানো, অগুন্তি।

কিছু দূরে, একটি ক্ষেত-বাড়ি। সবে লাঙ্গল দিচ্ছে। সেখানেও তাই। হাজারে হাজারে কঙ্কাল উঠছে লাঙ্গলের ফলায়। কে জানে, কত কালের সে সব। এক জায়গায়, ছোট্ট একটি মন্দির। শ্মশানের গা ঘেঁষেই। শ্মশানেশ্বরী সেখানে থাকেন। নিত্য সেবা হয়।

নানা জায়গা ঘুরে এবার ফিরছি। এসে দেখি, লোকে পরিপূর্ণ; একটু আগে সেখানে একটি প্রাণীও ছিল না। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে। আজকেই স্নানের দিন। হয়তো বা তাতেই এত ভিড়। মেয়েদের ভাগই বেশি, যাদের হৃদয় কোমল; অল্পতেই গলে যায়। স্নেহভরা বুক, যারা কিছু হারিয়েছে, আর পাবে না।—সারা জনমেও পাবে না,—তারাই এসেছে।"

উদ্ধৃত রচনাংশের সাহায্যে আজকালকার গ্রামের গল্পের ধারণা দেওয়া গেল; এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দু'তিন শ বছর আগেকার এরকম গ্রামাঞ্চলের লেখা গল্পের নমুনাও পাওয়া যাচ্ছে। তার রূপ আমাদের কল্পনার অতীত। রামমোহন রায়কে আমরা আধুনিক গল্পের আদি পুরুষ ব'লে জানি, কিন্তু তিনি তো ছিলেন

শহরে। গ্রামের সংস্কৃতি তাঁর মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেনি। তাঁর আবির্ভাবের বহু পূর্বেকার গ্রাম্য লেখকের লেখা চিঠি, দলিল, হাতচিঠা ইত্যাদি বহু কাগজপত্র মিলছে, ভাষা ও রচনার শৈলীতে যেগুলি বাংলা গদ্যের ইতিহাসকে সুপ্রাচীনতার উচ্চতর শিখরে নিয়ে পৌছাবে; এবং শুধু তাই নয়, দেশীয় জীর্ণ ঐতিহ্যের ধারাকেও সমৃদ্ধি দান করবে। বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথি বিভাগের অধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল ইতিপূর্বে রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল' এবং 'গোর্খবিজয়' গ্রন্থদ্বয় সম্পাদন ক'রে নিম্ন জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়কে উজ্জ্বল করে দেখিয়েছেন; সম্প্রতি তাঁরই নিকট থেকে গ্রাম্যলোকদের লেখা প্রাচীন চিঠিপত্রে সামাজিক চিত্রের টুকরা-টাকরা কিছু অংশ দেখা গেল। গবেষণা-গ্রন্থখানি আশা করা যায় শীঘ্রই প্রকাশিত হবে, তখন সকলে এই কথার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

লেখার কথা গেল। এ ছাড়াও, আলপনা, কাঁথা, পটচিত্র, পুঁথির পাটা, বেতের কাজ, কাঠের কাজ, সোনারুপো পেতল কাঁসা ইত্যাদি ধাতুর কাজ, শঙ্খ, শোলা, তাঁত ও মৃৎশিল্প,—সবই তো এখনো ওদের হাতেই। ঢাক-ঢোল সানাই মৃদঙ্গ—জীবনের ঘাটে-ঘাটে যা উৎসব জমিয়ে এসেছে, সেই পরিচিত বাজনা-বাদ্যির আমেজ বজায় রাখতে হলে এদের কাছেই যেতে হবে। দেশীয় কত খেলা, কত রূপকথা, কত ভাষা, ধর্ম, রীতিনীতিও সে সঙ্গে জড়িয়ে সভ্যতার কত ধারা-বিবর্তনের ঐতিহাসিক সূত্র রয়েছে এদের মধ্যেও নিহিত।

স্বদেশী আন্দোলন প্রথম যখন দেখা দেয়, তখন স্বদেশের সাহিত্য শিল্পাদির খোঁজখবর হতে থাকে। দেশের নেতৃবৃন্দ আদর এবং উৎসাহের সঙ্গে গ্রামীণ সভ্যতার প্রচলনে যত্নবান হন। কিন্তু এ সভ্যতার যারা বাহক সেই মানুষগুলিকে কোনো দিনই তেমন আমল দেওয়া হয়নি। শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে ওরা যদি সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের মর্যাদা পেত, তবে কেবল বকশিশ বা মজুরির পয়সা হাতে দিয়েই ওদের বিদেয় করা চলত না,—কাজ মিটে গেলেও শ্রদ্ধা ও আদরের টানে আনাগোনা চলত ওদের আঙিনায়, সুখ-দুঃখের খবরাখবর চলত আজীবন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বিজয়া সম্মিলনী"র ভাষণে সেদিন রাখালকেও আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের রচনাগুলি এ বিষয়ে স্মরণযোগ্য। ছাত্রদের তিনি এদের কাছে গিয়ে নানা তথ্য সংগ্রহের কথা তখন থেকেই বলে-ছিলেন। পরলোকগত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের অধ্যবসায় এ পথে অনেকটা কার্য-করী হয়েছে। "বাংলার পটুয়া" গ্রন্থ তাঁর এক মহৎ দান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পল্লীগাথা ও পালাগান সংগ্রহের দ্বারা আমাদের শিক্ষণীয় অনেক মূল্যবান উপকরণ সুরক্ষিত করেছেন। মুহম্মদ মনস্থরউদ্দীনের "হারামণি" নামক লোকসংগীত সংগ্রহ, ডাঃ সুশীলকুমার দে-র "বাংলা প্রবাদ"ও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচিত 'পল্লীচিত্র' 'পল্লীবৈচিত্র' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি শুধু তাঁর সাহিত্য-কীর্তির নিদর্শন নয়, সেগুলি শিক্ষিত ও সাধারণের জীবনযোগের সূত্রস্বরূপ। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রতকথা' এবং তারও পূর্বেকার স্বর্গত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত 'মেয়েলি ছড়া' গ্রন্থদ্বয় থেকেও আমাদের অনেক শেখবার আছে। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের 'বাংলার বাউল' লোক-সম্পদের খনি। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর উদ্যোগও এ বিষয়ে কম নয়। এরূপ কত জায়গায় কত জিনিস ছড়িয়ে আছে। এ সকল উপাদানের সমবায়ে আমরা ওদের পরিচয় লাভের যোগ্য একখানি ইতিহাস গড়ে তুলতে পারি। দূরে থেকে এ সব পড়ে আমাদের মধ্যে ওদের সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগতে পারে, কিন্তু সেটুকু যথেষ্ট নয়। আমাদের এবং ওদের মধ্যে যোগ চাই,—আরো জীবন্ত আরো ঘনিষ্ঠ রকমের।

সে-যোগ দু'রকমে হ'তে পারে, এক ওরা যদি আমাদের মধ্যে আসে, আর আমরা যদি ওদের মধ্যে যাই। আমাদের মধ্যে এসে সমান হয়ে আসন নিতে ওদের সংকোচে বাধবে, অথচ, দূরে-দূরে থেকে আমাদের জিনিস অক্ষমভাবে ওরা অনুকরণ করছে। আমাদের ঘৃণা ও বিরাগের উদ্রেক ছাড়া আর কিছু তাতে ফল হচ্ছে না। ওদের ছেলেছোকরাদের চালচলনে এই বিকৃতিটা বেশি করে ধরা পড়ে। আমাদের শিক্ষার ভালো দিকটা ওদের ভালো ক'রে ধরালেই এর অনেকটা প্রতিকার হতে পারে। আমরা কি ভাবতে পারি, অশিক্ষিত-পটুত্ব নিয়ে ওদের জিনিস যখন আমরা অমনি সাধারণের সমক্ষে উৎসাহের সঙ্গে পরি-বেশন করতে যাই, তখন আমাদের ধৃষ্টতায় ভিতরে-ভিতরে অপমানে ওদেরও গা জ্বলে; আর, বাইরে যেটা প্রকাশ পায় সেটা ক্ষীণ হাসির ছলে খুরধার ব্যঙ্গ। ওদের ভালোটা ভালো ক'রে শিখতে হবে আমাদেরও। তবেই ভালোবাসা জাগবে।

সহজ আদান প্রদান হত কথকতা ও কীর্তনাদির আসরে। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ব'সে নাম গান চলত। ছোট বড়োর প্রশ্ন উঠত না। সে যোগাযোগটা ঘটত আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে; সংসারের ব্যবহারিক সীমা পেরিয়ে। কিন্তু সেই ঔদার্য দিয়ে কি আমরা ব্যবহারিক জীবনকেও সুধাভিষিক্ত করতে পারিনে? মাথা

ও পা'কে একাঙ্গ ক'রে না দেখলে পায়ের ক্ষতে মাথার টনক নড়বে কিসে? আর পা-টা খসে গেলে, বা খোঁড়াতে থাকলে লোকে খোঁড়া বললে কি মাথাওয়ালারও সেটা ভালো লাগবে?

বাইরে ওরা যত দরিদ্র, মনের দিকে দারিদ্র্যে মোটেই তেমন নেই। বাইরেও দৈহিক শ্রম করবার অভ্যাস ও সহ্যশক্তি ওদের যত আছে, আমাদের সে-তুলনায় আছে অনেক কম। স্বল্প উপাদানে গুছিয়ে কাজ করবার শিক্ষাও ওদের কাছ থেকে আমরা নিতে পারি। পঞ্চায়েৎপ্রথা আজও ওদের সামাজিক শৃঙ্খলাকে চালিত করছে।

সামাজিক অনুশাসন বা সাহায্যের অপেক্ষা রাখা শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে থেকে এখন ক্রমে তো উঠেই যাচ্ছে। সমাজের ক্ষাত্রশক্তিরও অবশেষ ওদের মধ্যেই ভস্মাচ্ছাদিত হয়ে জ্বলছে। রায়বেঁশে, ঘোড়দৌড়, নৌকা বাইচ, ষাঁড়ের লড়াই, দলবদ্ধভাবে শিকার অভিযান,—এ সবের বিচিত্র ইতিহাস ও কৌশল আয়ত্ত করতে হলে এদের সাহায্য অপরিহার্য। এদের মধ্যে গিয়েই সে-সব শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ওদের এসব ছোটখাটো পুঁজিপাটা নেড়েচেড়েই কতজন পি. এইচ. ডি.—ডি. লিট্. হয়ে যাচ্ছেন, আর সেখানে ওরা চিরকালই রইল অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে। ওরা জানতেও পেল না, যে, ওদের জিনিসের মূল্যে, এবং ওদের সাহায্যেই এ যা-কিছু সম্ভব হচ্ছে। পয়সা নিয়ে ওরা হয়ে রইল মডেল, আমাদের মেলা জমল, ঘর ভরল ওদেরই দেহভঙ্গি, গানের সুর, শাড়ি, গয়না, পুঁথিপত্রের নানা নিদর্শন জমিয়ে। নিভৃতে ওরা আপন পরিচয় সংরক্ষণ করেছে, বাইরে এসে মাতামাতি করেনি,—এই কি ওদের বাতিল হবার কারণ? কালের সঙ্গে তাল না রাখতে পারাটা অপরাধ বই কি! সে-অপরাধে ওদের মান ঘুচল, প্রাণ নিয়েও টানাটানি। তাই হয়ে থাকে,—এ যে প্রাকৃতিক নীতি! শুক্তির বুকে ঢাকা থাকে মুক্তো, সাগরতলেই তা গড়িয়ে চলে। কিন্তু যেদিন ব্যবসায়ীর নজরে এল, সেদিন আর তার রক্ষে নেই। মুক্তা সেদিন সম্রাজ্ঞীর কণ্ঠে ওঠে বটে, শুক্তির কিন্তু আর চিহ্ন মেলে না। তবু এটা মানুষের নিজেদের সমাজের মধ্যে ব'লে আমরা আশা করতে পারি, মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেই মানুষ মানুষের গুণের প্রসারের ব্যবস্থা করবে। শুক্তির দল ঐ সাধারণ মানুষ। সচেতন হোক তারা তাদের মুক্তার মূল্য সম্বন্ধে। সে-চেতনা সঞ্চারের জন্যেই চাই শিক্ষা।

ওদের শিক্ষা যেখানে আমাদের সাহায্যসাপেক্ষ, সেখানে আমাদের শুধু শিক্ষা

বিলোতে গেলেই যে ওদের দিক থেকে শিক্ষা নেওয়ার পথ সহজে খুলে যাবে, এমন নয়। আমরা সে পথই খুলতে যাচ্ছি বটে, কিন্তু, সে-পথ খোলার জন্য চাই ওদের জিনিসের প্রতি আমাদের অনুরাগের প্রকাশ এবং চাই ওদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণের স্থায়ী প্রযত্ন। সে-প্রযত্ন অর্থে বা কীর্তিতে নিজেদের বড়ো হওয়ার জন্য নয়, বা অনুগ্রহ ক'রে ওদেরও বড় করবার জন্য নয়,—তা কারোই স্বার্থঘেঁষা হবে না। সর্বজনীন মানবপ্রীতি ও সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যেই সে-প্রযত্ন চলবে স্বাভাবিক টানে। সবটার পরিণতিতে চাই মানুষের অখণ্ড পরিচয়। এই শিক্ষা দ্বারা সে-পরিচয়ের প্রসার ঘটলেই তখন মানুষ সাধারণ এক-শ্রেণীভুক্ত হবে। 'জন' ব'লে তুচ্ছার্থক শ্রেণীভেদ জিনিসটার অস্তিত্ব থাকবে না, তেমনি, 'জনশিক্ষা' ব'লে আজকের মতো পৃথকভাবের বরাদ্দ-করা কোনো শিক্ষার উপযোগিতাও হবে নিরর্থক। সে-হিসাবে যে জিনিসটা চলছে, তা জনশিক্ষার পূর্ণ রূপ নয়, পূর্ণ প্রণালীও একে বলা যায় না। জনশিক্ষার নামে এখন শুধু সাধারণকে সাধারণ মাপের একটু বিশেষ বিষয়ের শিক্ষা পরিবেশনের কাজই চলছে। সাময়িক অবস্থাতে যা সম্ভব হল, তাই যে আদর্শ, এমন যেন আমরা মনে না করি। যথাক্রমে মান বাড়িয়ে বাড়িয়ে ওদের সকলকে উচ্চ বিদ্যা ও গুণ শিক্ষা দেওয়ার উৎসাহ, এবং ওদের কাছ থেকে ওদের বিষয়ের শিক্ষা আহরণের তাগিদ—এ দুটি জিনিস আমাদের মধ্যে এখনো তেমন সুপরিস্ফুট হল কই? জনশিক্ষা নামটার মধ্যে এমনিতেই যেন একপেশে অনুগ্রহ-বিরতণের ভাবটা উঁকি মারছে। অথচ, এর মধ্যে যখন শিক্ষিতেরও বেশ খানিকটা শিখবার দিক আছে এবং সে-শিক্ষা যখন জনজীবন ও জনসংস্কৃতির নিবিড় যোগসাপেক্ষ তখন একে জনসাপেক্ষ শিক্ষা ব'লেও জানতে হবে। শিক্ষা মাত্রই মানুষের শিক্ষা। সকলের মধ্যে পরস্পর দেবার ও নেবার ব্যবস্থা চলতে থাকলেই শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্র অনুকূল হয়ে ওঠে। আজ জনসাপেক্ষ শিক্ষার অবহেলিত দিকটায় শিক্ষাব্রতী সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। সকলে সমভাবে এদিকেও যত্নবান হলে জনশিক্ষার প্রচার এবং তার ফল সমাজের পক্ষে সহজেই শুভকর হয়ে দেখা দেবে।

জনের জন্য সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার অধিকার ও ব্যবস্থার কথা বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ উপলক্ষে তা স্মরণীয়।

সামাজিক অবস্থার তারতম্য সহসা ঘুচবার নয়। এই পার্থক্য তত ক্ষতিকর হয় না সেখানেই, যেখানে হৃদয়ের যোগ বর্তমান। পরস্পর পরস্পরের জন্য আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করলে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের মতো এক পরিবারে চাকরির

ভিন্ন অবস্থা সত্ত্বেও দিনাতিপাত সুসহ-ই হতে পারত। কিন্তু ব্যবহারের পার্থক্য ঘটায় ভিতরের সে-সৌহার্দ্য অনেকদিন দূর হয়ে গেছে। তা ফিরিয়ে আনবার প্রাথমিক প্রক্রিয়াই হচ্ছে পরস্পরের আদানপ্রদান।

আগে সামাজিক ভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ছিল কাছাকাছি এক শ্রেণী; আর শূদ্রকে আরেক শ্রেণীতে ধরা চলত। কিন্তু এখন আর্থিক ভাবে সে-শ্রেণীবিভাগ বদলে গেছে। শহর এবং গ্রাম,—এই দুই অঞ্চলে দেশ বিভক্ত। জীবিকার প্রয়োজনে বাসিন্দা হয়ে মানুষ, 'শহুরে' এবং 'পাড়াগেঁয়ে',—এই দুই জাতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শহুরে-দৃষ্টিতে গ্রামের ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি উচ্চশ্রেণীও সেই হিসাবে গড়পরতা এক অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এলাকার ইংরেজী নামকরণ হয়েছে—'রুরাল এরিয়া', আর শ্রেণীর নাম—'সিডিউল্ড্ কাস্ট্'। কথাটা বলাতে, অনেকের মনে লাগতে পারে, কিন্তু সরকারী ব্যবস্থার মধ্যেও নানা ভাবভঙ্গীতে এ সত্যটা মর্মে-মর্মে অনেকেই উপলব্ধি করবেন। শহরে দিনদিন আলো জ্বলছে; গ্রাম যেই তিমিরে সেই তিমিরে। এখন যে-শিক্ষা হচ্ছে, তাও তেমনি 'বাবুদের' হাত দিয়ে। 'বাবুত্ব' আর ঘুচল না। মাস্টার গ্রামবাসী হলেও তার আবাল্যের শিক্ষাপদ্ধতি তাকে 'বাবু' শ্রেণীতে উঠিয়েই বসিয়ে রাখল। তারা সাধারণের কাজ ক'রে যায় চাকরি করার মনোভাবে; সাধারণের সঙ্গে তেমন মিলতে পারে না। মুখে যতটা আদর্শের শেখাবুলি আওড়ায়, কাজে খাটাতে গিয়ে থৈ মিলে না। এই শ্রেণীর কর্মীদেরও দোষ দেওয়া চলে না, কারণ মূল থেকে যে সমাজ এবং যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে তারা গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে নিয়মের কথাই ছিল বেশি, প্রাণের যোগ ছিল অল্প। প্রাণের পরিবেশ তারা আজ হঠাৎ গড়বে কী করে! বাবুদের হাতে যারা শিক্ষা পাবে, তারা যে বাবু হতেই চাইবে,—তাতে আশ্চর্য কী।

বাবুদের দ্বারা বিতরিত শিক্ষা সাধারণ লোকে যে না নিচ্ছে বা না নেবে এমন নয়; বাবু হবার স্বার্থবোধই তাদের তা নেওয়াবে। সুতরাং শিক্ষার প্রচার চলতে থাকবে,—অনেকে ওরা শিক্ষিতও হয়ে উঠবে। কিন্তু এ-শিক্ষার ফলে এই নূতন শিক্ষিত-সাধারণেরও একটা শ্রেণী দাঁড়িয়ে যাবে। শ্রেণী-ভেদ আর ঘুচবে না। শ্রেণী-স্বার্থ সচেতন হয়ে এই নূতন শিক্ষিতেরাও সমাজে দলাদলিতেই কোমর বাঁধবে। মাতব্বরির ফিকিরে ফিরবে এরাও। বঞ্চনায়, বিদ্বেষে, সংঘর্ষে অশান্তি কেবলই ধূমায়িত হয়ে চলতে থাকবে। শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে যে হৃদ্যতায়, বর্তমান শিক্ষায় সেইটির অভাব আছে বিলক্ষণই; একথা স্মরণ

রেখে, হৃদ্যতা বৃদ্ধির উপযোগী যোগাযোগ স্থাপন করাই হবে জনশিক্ষার একটি অন্যতম প্রক্রিয়া।

শিক্ষাকে কেবল স্কুলের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। নানা উৎসব অনুষ্ঠানে ব্রতেপার্বণে সামাজিক ক্রিয়াকর্মেও পরস্পরে সমাদরের সঙ্গে পরস্পরকে গ্রহণ করা চাই। জলসা-প্রদর্শনী ইত্যাদি আধুনিক সামাজিকতার উপলক্ষ-গুলিতেও সকল শ্রেণীর লোকদেরই সক্রিয় অংশ দিয়ে এনে মেলাতে হবে। গান-বাজনা, বনভোজন ইত্যাদি বিশুদ্ধ আনন্দের সম্মিলনীও ভদ্রাভদ্র সকল পাড়াতেই পর্যায়ক্রমে সকলের সহযোগে চলতে থাকবে। তাতে ওদের আত্মমর্যাদা-বোধই যে জাগবে তা নয়, ওরা উদ্বুদ্ধ হবে নূতন আশায়; অগ্রসর হবে নূতন উৎসাহে, নূতন শিক্ষায়।

শিক্ষা যেমন চলছে, সহযোগও চলছে আজ তেমনি। কিন্তু কোথায় এসে তা ঠেকেছে তার নমুনা দেখতে হলে খুটিয়ে ব্যাপারগুলি লক্ষ্য করা চাই। ভোজের কথাটাই ধরা যাক্। সামাজিকতা প্রসারের এ একটা প্রশস্ত ক্ষেত্র। লোকে বলে, যারা খেয়ে গিয়ে মুখ না মুছতেই নিন্দে শুরু করবে, আসরে তাদেরই আহ্বান হয় সসম্মানে। আর যারা খেতে পায় না, অথচ খেটে দেয়, তাদের ডাকাডাকি তো এখন উঠেই গেছে। হাঁক মেরে তাড়ানোটাই হয়ে উঠেছে অভ্যাস। আদাড়ে-পাদাড়ে ব'সে তারা উচ্ছিষ্ট খাবে, আর কাঙালীবিদায়ের মহৎ ব্যাপারের বেলা পারলৌকিক পুণ্য এবং ইহলৌকিক নাম কেনা হবে যাদের উপর দিয়ে, তাদেরই কপালে দেগে দেওয়া হবে "তেলের ছাপ", যাতে লুকিয়ে-চুরিয়ে তারা দু'বার দান না আত্মসাৎ করে। এ হেন মনোবৃত্তি ও আচরণের উপরে যে যোগাযোগটা ঘটছে, তা কিরূপ সুস্থ, স্বাভাবিক, প্রিয় বা কল্যাণকর হতে পারে সহজেই অনুমেয়।

সন্দেহে সন্দেহ ডেকে আনে। আমাদের মধ্যে সন্দেহ জাগতে দেখলে, আমাদের হিতৈষী ভাবতে পারাটা ওদের পক্ষেও কঠিন হবে। যত নোংরামি আর ঘৃণা-অবহেলার মধ্যে ওদের রাখা যাবে, সমাজে ততই আরো মায়াদয়াহীন কঠোরচিত্ত কুপ্রবৃত্তির মানুষ সৃষ্টি হবার সাহায্য করা হবে মাত্র। ভিতরে বাইরে নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই এদেরকে নির্মল পরিবেশে রাখা ও নিজেদের মতো ক'রেই দেখা আবশ্যক। ওদের মধ্যে ভালো কিছু আছে এবং তা সকলেরই আদরণীয়, শিক্ষণীয়—এতটাই যদি ওরা দেখতে পায়, দু'পক্ষই তাহলে মানুষের সমাজকে বড় করে দেখবার দৃষ্টি লাভ করবে; দাতা-গ্রহীতার সম্বন্ধ পারস্পরিক

হলে কে কাকে ছোটো, কেই বা কাকে বড় ভাববে! ঘৃণা ও সংকোচ দূর হবে। মুমূর্ষু দেহে প্রাণের প্রবাহ বইতে থাকবে। সমাজে সাম্যের এক নূতন পরিবেশ গড়ে উঠবে।

এ সব ব্যবস্থা যতটা বেসরকারীভাবে হয়, ততই ভালো। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকেও শিক্ষার মৌলিক নীতি স্থির করবার সময় ভদ্রাভদ্রে যোগাযোগের এই প্রস্তাবটি বিশেষ ক'রেই ভাবতে হবে এবং এ যোগাযোগের সহায়কল্পে যাবতীয় আয়োজন ও অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করাও হবে অবশ্য কর্তব্য। সেটা সরকারের পক্ষে জনমত আকর্ষণেই কার্যকর হবে। আমরা গ্রাম্য জনতাকে আমল না দিলেও, তাদের যতটা অচেতন অকেজো ভাবি তারা মোটেই ততটা অকেজো নয়। তাদের মধ্যে দুদিনবাদে একথা ভাবা আশ্চর্য নয় যে, সরকার তাদের প্রতি অবিচারশীল, কেননা, এখনই আনাচেকানাচে এমনও শুনা যায়, শ্রেণীভেদ জিইয়ে রাখাই সরকারী নীতি। রাজনৈতিক এ-সন্দেহের অবকাশ উন্মূলিত ক'রে গণসমর্থনবৃদ্ধির পক্ষেও প্রস্তাবিত দু'মুখো জনশিক্ষার ব্যবস্থাটাই আশা করি বেশি নির্ভরযোগ্য ও বাস্তবে ফলপ্রদ হবে।

সহজ সামাজিকতা

সাধারণ শ্রেণীর লোককে আপন করতে খুব বেশি কিছু করবার দরকার হয় না। সুখ-দুঃখে আপদ-বিপদে বড় একটা সাহায্য না হলেও চলে। কেবল চাই একটু সততা, আন্তরিকতা ও দরদ। পরের কাছে নিজের সম্বন্ধে একজন বিশেষ মানুষ বলে নিজেকে অনুভব করতে ও সহৃদয় ব্যবহার পেতে চায় প্রত্যেক সাধারণ মানুষের ভিতরের মন। লোকে ব্যক্তিগত কথাটি বলতে পেলে বা মন দিয়ে কেউ সে কথাটি তার শুনছে দেখলেই সে আত্মতৃপ্তি লাভ করে; এমনি ভাবেই মানুষ মানুষের কাছে আসে। মানুষেরই গড়া এক যুগের পাপপুণ্য এবং আরেক যুগের অর্থ ও গুণের আড়ালে, মানুষের সহজ স্বীকৃতিটি মানুষ আজ হারিয়ে বসেছে —এই তার দারুণ দুর্ভাগ্য। এই স্বীকৃতিটিই চাই আগে, তার সঙ্গে চাই একের দারিদ্রবিষয়ে অন্য সকলের সহৃদয় বিবেচনা। কেজো সাহায্য পরের কথা। এখনই একবারে লোকের কাছে বেশি কর্তব্য দাবি করা সমীচীন হবে না; ঘাঁটালে লোক বিরক্ত হবে। বিষয়বস্তু এবং কাজ-কারবারের যোগ তো বিষয় থেকে বিষয় নিজেই ঘটাচ্ছে। মনোগত প্রীতির যোগটারই যা অভাব, সেইটুকুই এখন আনতে পারলে হয়।

সাধারণ মানুষের মনকে অমূল্য ব'লে জেনে মানুষে-মানুষে মিলনের পথ থেকে অর্থের বৈষম্যবাধাকে দূর করতে বদ্ধ-পরিকর আজকের পৃথিবীতে সোভিয়েট রুশিয়া। এই রুশদের সাহিত্যে একটি গল্পে আছে, এক কোচম্যানের কাহিনী। আগের দিন রাত্রে তার একমাত্র সন্তান মারা গেছে। সারাদিনে কাউকে সে-কথা বলতে না পেয়ে গভীর রাতের নিস্তব্ধতিতে গাড়ির ঘোড়াটাকেই শেষটা শোনাচ্ছে সে বসে সেই মনের একান্ত কথাটি। এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির মধ্যে লেখক দেখিয়েছেন মানুষের নির্বান্ধবতার বেদনা কত সাংঘাতিক, কত গভীর, কত করুণ।

ধনী, পণ্ডিত বা অভিজাত-যারা, যতই তাদের সভাসমিতি থাকুক, মন খুলে মেলবার ঠাঁই আছে তাদের অল্পই। সাধারণতঃ তারা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। ড্রয়িংরুমের দু'চার দশটা বাজে গল্পে বাইরে বাইরে দিন চালিয়ে দিয়ে মনের দুয়ারকে তাদের অর্গলবদ্ধ করেই রাখতে হয়। ছোটোদের কাছে তো তারা ঘেঁষবেই না। তাদের সঙ্গে মেলবার পথটাই অবশ্য তাদের অভিজ্ঞতার

বাইরে প'ড়ে দুরধিগম্য। আদব-কায়দা আর বাহ্যিক ভড়ংএর মেকি আড়ম্বরে ঠাসা তাদের পারিপার্শ্বিক। তার থেকে ছিট্‌কে-পড়া, সে যেন তাদের পক্ষে কই-মাছের ডাঙ্গা-প্রাপ্তিরই সামিল। এদিকে ছোটোরা বড়োদের ভয় করে, বিশ্বাস করে না, ভালোবাসা তো দূরের কথা। অবশ্য এর জন্যে বড়োদের স্বার্থবুদ্ধি এবং নির্বিকার ঔদাসীন্যই দায়ী। অথচ ছেলেপিলে ঘরসংসার নিয়ে একটা ক্ষেত্রে ছোটোবড়ো সকলেই সমান সুখ-দুঃখের মানুষ। আজকাল অর্থ এবং গুণ নিয়ে যে পরিমাণে লোক বড়ো হয়, সেই পরিমাণেই সে নিজের কাছ থেকেও নিজের মনকে নেয় সরিয়ে, বাইরের ব্যবহারিক সহজ যোগে সে তো কৃত্রিম স্বভাবের বাধাতে এমনিতেই হয় বঞ্চিত, এ দুর্ভাগ্য গ্রাস করেছে প্রায় বড়ো শ্রেণীর সকলকেই।

বড়োদের নিজেদের গড়া তথাকথিত আভিজাত্যের গণ্ডী বা বৈষয়িক বড়োত্বই তাদের অভিশাপ। তাই নিয়ে মূলে তারা কৃপারই পাত্র। কিন্তু এ সত্য কি ছোটোরা বুঝবে, না, বিশ্বাস করবে যে, এই অভিশাপ থেকেই শুষ্কতার পীড়ন ভোগ ক'রে চলেছে বড়োরা মর্মে মর্মে ব্যক্তিগত গহন-গভীর অনুভূতিতে, অবশ্য যদি কারো সেই অনুভব শক্তি শেষ পর্যন্ত লেশমাত্র টিকে থাকে। বাইরে থেকে লোকের কিছু বোঝবার উপায় না রাখলেও সতর্ক চেষ্টা পেরিয়ে প্রকাশ পেয়ে যায় তার একটা লক্ষণ। মনের স্বাভাবিক ধর্মকে চেপে রাখার দুঃসহ বেদনাই রূপ নেয় শেষে হিংসা-বিদ্বেষ-ঘৃণা অহংকার মিশ্রিত উন্নাসিক আভিজাত্যের বিকৃত মনোবৃত্তিতে।

ছোটোরা বড়োদের দোষী করে তাদের অমিত ভোগবিলাস, পরস্বাপহরণ-প্রবৃত্তি, প্রভুত্ব ও স্বেচ্ছাচারের দায়ে। চোখ বাঁকানোতে কিন্তু ছোটোরা নিজেরাও কম যায় না আজ বড়োদের থেকে। বড়োদের কটাক্ষ ঘৃণার; ছোটোদের কটাক্ষ ক্রোধের। যেন মূলেই বড়োরা মানুষের জাত-ছাড়া এক আলাদা জীব। অবস্থাচক্রে যে মানুষকে অনেকখানি নীচ করে তোলে,—ছোটোবড়ো কেউ কারো সম্বন্ধে সে কথা ভাবতে চাইবে না। আধুনিক এসব আত্মকেন্দ্রিক আত্মহন্তারক ভস্মাসুর ভস্মলোচনের দৃষ্টি তো বিষয় বা অবস্থার দিকে পড়বে না, যার যত মার তা গুণকে বা ঐ অবস্থাকে মারতে গিয়ে পড়ছে এসে ব্যক্তির মানব-সত্তারই উপরে। 'পাপকে ঘৃণা করো—পাপীকে নয়', যিশুর এই নীতি কথার উল্টা আচরণেই বাড়ছে মানুষের মানুষ-মারা ঝোঁক এবং সর্বত্রই তা আদর্শের নামে। এক মানুষ সকলেই,—এ কথাটাই মানুষের সব চেয়ে বড়ো প্রতিবাদের বিষয় হয়ে উঠল সব কোণ থেকে। যেমন মানুষের জাত ভাগ করা পুরাণো দল, তেমনি

এক মানুষের জাত-করা আধুনিক দল—দুয়ের মধ্যেই মানুষ মারতে কম যাচ্ছে না কেউ। পুরানো দল এতদিন ছোটোদের ধ'রে মেরেছে, আধুনিক দলের মার এসে পড়ছে বড়োদের উপরে।

আদর্শের কথায় সাধু সকলেই সমান। আবার আচরণেও পাপী সেই রকমই। যে ছোটো বড়োকে গাল পাড়ছে, তলে তলে তারও যে নজর নেই ঐ তথাকথিত বড়ো হবার দিকেই—এ কথা বুক ঠুকে বলবার সাহস আছে ক'জনের? চেষ্টায় কুলোচ্ছে না, নইলে একবার গদি জুটলে অনেক নিঃস্ব-প্রেমিক নেতাও যে উল্টা তার দেউড়ি থেকে তখন ভিখিরী তাড়াবে না, এ কথা বলা শক্ত, যেহেতু সেটারও দৃষ্টান্ত কম নেই। আজকের চোরাবাজার আলাদিনের পিদিম হয়ে রাতারাতি কত না পথভিখিরীকে রাজতুল্য সমৃদ্ধি ও গৌরবের তক্তে বসিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তারা কি আজ তাদের দু'দিন আগের জাতভাইকে চেনে?

ছোটোবড়ো কোনোটাই পৃথিবীতে আকাশ থেকে পড়েনি বা মাটি ফুঁড়ে ওঠেনি। একটি জিনিস—মানুষই রয়েছে দুই অবস্থার ক্ষেত্রে ধরবার ছোঁবার সাধারণ উপলক্ষ। সহজাত বুদ্ধি, কর্ম, শিক্ষা এবং সুযোগে একজন উঠে যায় বড় ধাপে, আবার সেই মানুষের জাতের একজন নেমে যায় সময়ে ছোটো ধাপে। আজ ধাপটার সঙ্গে মানুষটাকে কায়েমি স্বত্বে মিলিয়ে বেঁধে রাখা হচ্ছে বা বাইরে থেকে তাকে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে এক ক'রে। তাই ছোটোয় বড়োয় ঘৃণা-বিদ্বেষের অন্ত মিলছে না। এ দ্বন্দ্বের সমাধানও নেই প্রচলিত দৃষ্টিতে।

বিষয়গত ছোটোবড়োর বৈষম্য ঘোচাবার চেষ্টা রয়েছে নানা রাষ্ট্রিক আন্দোলনে,—পাশাপাশি একই কালে তার সঙ্গে অন্য ক্ষেত্র গ'ড়ে নিয়ে ভিতরের দিক থেকে মনোগত সাম্যবৃদ্ধির জন্যও আন্দোলন আবশ্যক। ফল্গুধারার মতো সর্বজাতের মানুষের মধ্যে প্রীতির প্রবাহ সঞ্চারিত ক'রে চলবে সেই আন্দোলন। চলবে তা অন্য সব আন্দোলন-নিরপেক্ষ হয়ে।

আপাততঃ এ আন্দোলনে বড়োছোটো লোপের প্রশ্ন আসে না। সমাজে যে যেখানে যেমন আছে, তার বৈধ অবৈধতার উপর হস্তক্ষেপ না ক'রে ডাক দিতে হবে মানুষকে একটা জায়গায়, মাত্র জন্মগত এক পরিচয়ে—মানুষের একজন ব'লেই। এ আন্দোলনে মুখ্য হচ্ছে মানুষ, অবস্থা নয়, গুণ নয়, অন্য আর কিছুই নয়; সে মানুষ উচ্চনীচ সব দিককার, সব দলের, সব মতের এবং সব মেজাজের। মুখ্যতঃ সাধারণ রকমের শৃঙ্খলা ও শালীনতা নিয়ে হবে এই সামাজিক নিয়ম-নিগড়-নিরপেক্ষ সামাজিকতা। এর জন্য কোনো বাঁধাবাঁধি থাকবে না।

বামপন্থীরা দোষেন দক্ষিণ-পন্থীদের, আবার দক্ষিণ-পন্থীরা দোষারোপ করেন বামপন্থীদের। এই নিয়েই লেগে আছে দেশের বারোয়ানা উদ্যম। কিন্তু সেই উৎসাহের তোড়ে ভুলে যাচ্ছেন সকলেই যে, মূলে মানুষের সকলের দশাই রুশীয় গল্পে বর্ণিত ঐ নিঃসঙ্গ রুশীয় কোচম্যানের মতো। যত মতবাদ, যত আন্দোলন, গোলা-বারুদ, পুঁথিপত্র, দলাদলি, পাল্লাপাল্লি, যত দৌড়-ঝাঁপই চলুক,—এদিকে মানুষটা তার মনের কথা নিয়ে খুঁজে পাচ্ছে না লাখ মানুষের মেলেও তার মনের মানুষটিকে। নিজের কাছেই কি ধরা দিচ্ছে তার নিজের মন? তার বিজ্ঞতা, তার শৌর্যবীর্য উদ্যমের সামনে মুখ লুকিয়ে ফিরছে তার মনের সুকুমার বেদনা। মানুষের কাছে আজ মত-পথের তত্ত্বেভরা মানুষের পৃথিবী মানুষশূন্য।

মানুষ কাজে-কারবারে মিলছে বটে দেনা-পাওনায়, তাতে মানের দেখা মিলছে চোখ ধাঁধানো. কিন্তু মনের দেখা নেই। এই মিলন তাই ভেতরের রস হারিয়ে দিনে দিনে রুক্ষ মনের সংঘর্ষটাকেই আজ ঘনিয়ে আনছে। যেটুকু দান ধ্যান, বস্তি-সংস্কার, পাঠশালা, ধর্মগোলা স্থাপন. বোনাস বিতরণ,—বড়োদের দিক থেকে এ সবই যেন ফেঁদে রাখা হচ্ছে ব্যক্তিগত বড় স্বার্থ-সংরক্ষণের খণ্ডিত দৃষ্টিতে, অন্য পক্ষে ছোটোদের যেটুকু বাধ্যবাধকতা বা আনুগত্য, সে অনেকখানিই নিরুপায়তায় ঠেকে মাত্র। শ্রম ও অর্থের লেনদেনের পেছনে যা আছে, সে সামাজিকতা নয়, ধর্মঘট বা ব্যাটনের বিভীষিকা।

নূতন সামাজিকতা গড়ে উঠবে তথাকথিত বনেদী সামাজিকতার ফলাও ঠাঁট ছেড়ে। ঠাঁট যেখানে থাকবার সেখানে থাকবে. সে হ'ল নিত্যকার ব্যাপার। কিন্তু বিধিনিষেধের শৃঙ্খলে অষ্টপ্রহর মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে চালানোও কোনো কাজের কথা নয়। সেজন্যই স্কুল-কলেজ অফিস-আদালতে যেমন ছুটির দিন, তেমনি সমাজে রয়েছে পর্বের ব্যবস্থা।

এ যুগের হিন্দুদের সর্বজনীন দুর্গোৎসব যেমন, তেমনি চৈতন্যদেবের ছিল মহোৎসব. নগরকীর্তন, মুসলমানদের ঈদের নমাজ,—এগুলিতে ছোটো-বড়োর ভেদ নেই—মিলে চলছে সকলেই। পয়সা দিয়ে সিট রিজার্ভ করা নেই, চোরা-বাজার নেই, আশেপাশে চেয়ে ভাবনা নিয়ে বসতে হয় না উঠে যাবার। উনিশ-বিশে অসামাজিক অপবাদ লাভেরও নেই ভয়। তবে কিনা, এগুলি আবার সাম্প্রদায়িক ব্যাপার, সম্প্রদায়ের সকলকে মেলায়, পৃথিবীর সকল মানুষকে নয়। কিন্তু আজ এ সব ব্যাপারেও সম্প্রদায় থেকে সাদর আহ্বান জানিয়ে সহযোগের পথ খুলে দিতে হবে সকলের জন্য; সম্প্রদায়-নির্বিশেষে অন্য সকলেরও কর্তব্য

হবে ঐ উপলক্ষগুলি ধ'রে নিজেরাও উৎসব করা, আহ্বান পেলে অন্যদের উৎসবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মানুষের প্রতি প্রীতি জ্ঞাপন করা। সামাজিক অধিকার ভেদ বা বিভিন্ন বিষয়কর্মের স্তরভেদ নিয়ে মানুষ অন্য সময় অন্যক্ষেত্রে যে যেখানে থাকুক যে যার মত, পথ যত কিছু আন্দোলন নিয়েই ব্যস্ত থাকুক, স্বার্থশূন্য এই সর্বজনীন মিলন উপলক্ষগুলিকে সব সময় সব রকম অবস্থার মধ্যেই অপরিহার্যরূপে চালু রাখতে হবে, বরং বাড়িয়ে নিতে হবে এরই অনুকূল পর্বগুলি—সেবায়, বনভোজনে, নৃত্যগীত যাত্রা কবি অভিনয় কথকতা ও ক্রীড়াকৌতুকে। নিত্যনিয়ত পোস্টাফিসে, বাজারে, রেলস্টিমারে, স্কুলকলেজে, অফিস-আদালতে, ব্যাঙ্কে, সিনেমায় যেমন এক রকমের যোগটাকে সকলে মেনেই নিয়েছে অনিবার্য স্বাভাবিক ও দলাদলি-নিরপেক্ষ ব'লে,—তেমনি নিত-নৈমিত্তিক এইসব সামাজিক আনন্দের বিচিত্র উপলক্ষগুলিকেও নিতে হবে ব্যক্তি-জীবনের আবশ্যিক অঙ্গ করে।

আগের কালে তীর্থ ও মেলা ছিল সামাজিকতার ভারহীন সামাজিক মিলনের এইরূপ হালকা উপলক্ষ। সব চেয়ে আদর্শ হয়ে এ বিষয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরীর শ্রীক্ষেত্র তীর্থ। পথ-চলতি গালগল্পে জমে যেত ঘনিষ্ঠতা—দেশ, জাত ও বৈষয়িক অবস্থার হাজার বাধা পেরিয়ে। ভাব-ভাষা, বেশ-ভূষা, চাল্-চলতির মধ্য দিয়ে সামাজিক কত চিন্তা ও রীতিনীতির কতই না নীরব আদানপ্রদান ঘটে গেছে একদিন ঐ পথে-পথেই। এইগুলি ছিল প্রকারান্তরে জনশিক্ষারই উপায়, কিন্তু গুরুগিরি বাদ দিয়ে। পাণ্ডা, জমিদার মাঝে এসে প'ড়ে শিক্ষার সে-সহজ পথগুলি নষ্ট করেছে, আজ তেমনি নষ্ট করেছে মেকি নেতারা। গেঁয়ো কংগ্রেস চেষ্টা ক'রেও সাধারণের হ'তে পারল না,—তীর্থ মেলার কাজের স্থান পূরণ তো দূরের কথা। রাষ্ট্রবুদ্ধি যদিও মানুষের এই সহজ মিলন ভাবটির বিশেষ অনুকূল নয়, তবু মূলে যেখানে রাষ্ট্র মানুষের মিলন-আদর্শ-অনুসারী, সেখানে তার নেপথ্য হস্তক্ষেপে অনেক উপায়ই বেরতে পারে যা সাধারণের বুভুক্ষিত গহন মনের সহজ-বেদনা-প্রবাহ সর্বশ্রেণীর ভিতর দিয়ে বহমান রেখে মানুষের মিলনের আন্দোলনকে পুষ্ট ক'রবে।

এতদিন যা চলেছে সে মিলন অনেকটা পুঁথিগত মিলন; যতটা তত্ত্বের মিলন, ততটা সত্যের নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপথে দেশে অধীত বিদ্যার মধ্যেই বিশ্ব এসে যাচ্ছে হাতের মুঠোয়। পুঁথিপত্রে পৃথিবীর হালচাল যতটা জানা আছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তার কিছুই নয়। জানাটা হয়ে পড়েছে বেশি

কাল্পনিক, বাস্তব দিকে থেকে যাচ্ছে তা অপেক্ষাকৃত অপরিপুষ্ট; অভিজ্ঞতা পাকছে না, মিলন তাই সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য রেখে সুপরিণত হ'তে পারছে না। প্লীহা রোগীর সারা শরীর শুকিয়ে মাত্র পেটটাই ফুলে হয় ঢোল। বেতো রোগীর যেমন হাত-পা, তেমনি এই বিস্তার মিলন বাড়িয়ে চলেছে বুদ্ধিরই দৌড় বেশি। সেটা সামাজিক অস্বাস্থ্যেরই এক রকম প্রকাশ।

বড়ো-কিছু নিয়ে কারবার করবার যা সনাতন নিয়ম সে অনুযায়ী বিশ্ব-জানা মানুষ নিজেকে এবং সকলকে এবং সবকিছু ভাব-বস্তু-ক্রিয়াকে দেখতে অভ্যস্ত হচ্ছে একটা সাধারণ তত্ত্বের বা ফরমূলার অন্তর্গত ক'রে ক'রে। এর থেকে যে পরিমাণে জীবনে জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে, রসের দিক সেই পরিমাণেই যাচ্ছে শুকিয়ে। ইঞ্জিনের টানে চাকা ঘোরার বিধি চলছে দস্তুরমতোই, কিন্তু অভাব পড়ছে একটু তেলের মাত্র। তাইতে চাকায় চাকায় কঁ্যাচ-কোঁচ থেকে অকস্মাৎ এক এক সময়ে এক-একটা গাড়িতে যাচ্ছে আগুন লেগে। বোঝা যাচ্ছে জ্ঞানের বড় শক্তিটাও যেমন দরকার তার সঙ্গে, সামান্য জিনিস হ'লেও, প্রীতিজাতীয় তেলেরও তেমনি একটু দরকার আছে।

এই তেলটিই হচ্ছে ব্যক্তিপ্রাণের সহজ উচ্ছলিত বেদনার রস। মধ্যে মধ্যে সাময়িক উৎসবের সার্বজনীন মণ্ডলীর মধ্যে সমগ্রলোকের মিলন-আবহাওয়াতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই যদি লোকে মনের মতো লোক জুটিয়ে নিয়ে এদিক সেদিক গালগল্পে গান-বাজনা খেলাধূলা ক'রে বা দেখে ছুটির দিনটা-সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাটে বেপরোয়াভাবে কাটিয়ে দিতে পারে, ভরিয়ে নিতে পারে প্রাণের পাত্র, মতের নয় মানের নয় শিক্ষার নয় বিষয়-ভাবনার নয়, শুধু মানুষের বিচিত্র বেদনার সঞ্চয়ে, তবে বিষয় বা মতসর্বস্ব হয়ে মানুষমারা নির্মমতায় মানুষের ডুববার ভয়টা থাকে কম।

জীবনের খোপেখোপে মত ও বিষয়ের ঠাসাঠাসি থেকে মানুষ আজ একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চায়। ভিতর টিপলেই দেখা যায়, ফাঁকা জায়গা একটু সকলেরই প্রাণের চাহিদা। এমনকি লাট-বেলাটের বেলায়ও দেখা যাচ্ছে আজ অবসর ক'রে নিয়ে তারা গানের আসরে এসে সরাসরি বসে পড়ছেন দশেরই একজন হয়ে। রাজনীতি অর্থনীতির পাশেপাশে আজ সহজ সামাজিকতার এই রূপটি যে আত্মপ্রকাশ করছে, এটি শুভ লক্ষণ। সমাজে এই ভারহীন সামাজিকতারই আজ যথাযোগ্য প্রবর্তনা দরকার। আগেও অবশ্য এদেশে এ ধারাটি ছিল, মাঝখানে বিজাতীয় অফিস-আদালতী-হাওয়া এসে সে ধারাকে

শুকিয়ে মেরেছিল, এখনও তাকে মারছে মতবাদ আন্দোলন এবং অর্থ ও গুণের আভিজাত্যে। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা গেল প্রথমবারকার প'নরই আগষ্টের স্বাধীনতা সূচনা দিবসে। একটুখানি মুক্তির আভাস পেয়েই মানুষ পথে-ঘাটে বেরিয়ে পড়েছিল ছোটোয় বড়োয় পাশাপাশি হ'য়ে। দেশবাসীর মুক্ত মনের সহজ প্রবণতা সেদিন বাঁক নিয়েছিল বক্তৃতায় নয়, গ্রামে শহরে সর্বত্র অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রা, জলসা, খাওয়াদাওয়া, কুচকাওয়াজ, খেলাধূলা, কাঙ্গালী বিদায়, আলোকসজ্জা ইত্যাদি যত সব অফিসী ঠাট-সরানো হাল্‌কা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই! লক্ষ্যটা ছিল সকলের মন খুলে একটু মিলতে পারায়। স্বাধীনতার দিনটা সেদিন যেটুকুই জমুক, জমেছিল এই সর্বজননী সামাজিকতারই সংমিশ্রণে; এ ব্যাপারও হয়তো লোকের অলক্ষিত থাকেনি। এই উৎসব, মেলা ইত্যাদি লোক-সম্মিলন থেকে সমস্যার প্রত্যক্ষ-সমাধান হবে না, যা হবে পরোক্ষে। এর কার্যকারিতা তলিয়ে বুঝবার মন চাই আজ নানা আন্দোলন-ব্যস্ত সমাজের সর্বশ্রেণীতেই।

লাইব্রেরিয়ান্

মানুষ কথা বলছে। যাঁরা বেঁচে আছে, যারা মরে গেছে সবাই বলছে। কত ইতিহাস, কত অভিজ্ঞতা, কত আশা, কত স্বপ্ন, কত জয়-পরাজয়, হর্ষ-বিষাদের কথা। কাল বাঁধা পড়েছে কথার জালে। সৃষ্টির লোক জড়ো হয়েছে,—কিন্তু অনাসৃষ্টি ঘটেনি। যার কথা শুনতে চাই, তার কাছেই যাওয়া চলে; মেলা মিলে আছে, কিন্তু লোক মিলায়নি, চেহারায় চিনতে না পারি, ঠিকানা না পাই,—বেনামীতে কথার দেখা মিলে অনেকেরই। সে কথা প্রিয় হোক, অপ্রিয় হোক, শুনতে চাইলে শুনে যেতে পারব একজায়গায় বসে,—দুনিয়ার মধ্যে এমন আসর হচ্ছে লাইব্রেরি।

পড়ুয়া অপড়ুয়া সকলেরই এটি প্রিয়স্থল। স্কুলকলেজের বাঁধাবাঁধি নেই, ক্লাশ নেই, পরীক্ষা নেই, পাশ-ফেলের প্রশ্ন ওঠে না। সকলের চেয়ে বাঁচোয়া—আদেশ নেই, উপদেশের সুরও এখানে নীরব। আছে অফুরন্ত স্বাধীনতা, পছন্দ-সই বইটি টেনে নিয়ে অবাধে মন-দেওয়া।

আর-সব পড়ার বেলায় মনে হয় অবকাশটুকু মাটি হ'ল—লাইব্রেরির বইটি পড়ার বেলায় মনে হয়, পড়াটাকে মাটি করল অবকাশের স্বল্পতায়! আরেকটু যদি সময় পাওয়া যেত! বাইরের কোনো বাধ্যতা থাকেনা ব'লেই ভিতরের ক্ষুধা অবাধ্য হয়ে ওঠে। নিতান্ত পর হয়ে যায় আপন, যত থাকে দূরের তত হয় ঘরোয়া।

এমন আনন্দের জায়গা,—তার উপর শিক্ষার সুযোগ। জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করবার বিপুল বিচিত্র সঞ্চয়। দিকে দিকে পড়ে আছে মনকে মেলে দেবার অপরিসীম বিস্তার। শিক্ষাকে বিস্বাদ করে না, গরজের রস মিশিয়ে তাকে স্বাদু ক'রে তোলে, লাইব্রেরির পরিবেশই এইরূপ। পড়তে পড়তে যখন দেখা যায়, বইখানি আরো দু'দশজনে পড়েছে, তখন সকলেই তারা বন্ধু হয়ে পড়েন। বাইরে পরিচয় নাই বা থাক্,—মনে মনে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ বেদনা অনুভব করতে পারা যায়, তাদের চিন্তা-প্রণালী অগোচর থাকে না। তর্কাতর্কি নেই, দলাদলি নেই,—সকলেই অপেক্ষা ক'রে আছে সকলের জন্য। অধিকার শুধু স্বীকার ক'রে রাখা নয়,—অধিকার সাজিয়ে ধরে রাখা হয়েছে আদরের সঙ্গে;

এমন কি, ভিতরে প্রবেশের অধিকার না থাকলেও, নাড়াচাড়া ক'রে দেখবার অধিকারে কেউ বাধা দেবার নেই,—ছুঁলে কারো জাত যায় না। বইগুলি হাত বাড়িয়ে আছে,—হাতে প'ড়েই খুশি। মানুষের হাতের ময়লা যে যত মাখতে পায়, সেই তত ধন্য, কালো হয়েই তার মুখ আলো হয়ে ওঠে,—এমনি কৃতার্থ দেখায় তারা গায়ে-গায়ে পেনসিলের দাগে কণ্টকিত হয়ে। নিন্দা প্রশংসায় তারা সমান নির্বিকার। তাদের ডালি নিলেই হয়, তারা আর কিছু চায় না।

একাধারে শিক্ষা ও আনন্দের এমন সমাবেশ রয়েছে যেখানে,—ম'রেও মানুষ বেঁচে রয়েছে পৃথিবীরই যে অমরাবতীতে, সেখানেও লোকে বঞ্চিত হয়, এমন সুযোগ হাতে পেয়েও হারায়, ক্ষতির দিকের সেই অন্ধকার গহ্বরটাও দেখা দরকার।

যেখানে বহুবিচিত্রের মেলা, সেখানে সর্বাগ্রে চাই শৃঙ্খলা। লাইব্রেরিতে এলোপাথাড়ি বই জমতে থাকলে, তা কোনো কাজে আসবে না। কোন্ বিষয়ের বই, শ্রেণী নির্ধারণ ক'রে যথাস্থানে তার স্থাপনা চাই। যত নিখুঁত ভাবে সুনির্দিষ্ট হবে এই বর্গীকরণ, তত সহজে তা নিয়ে কাজ করা চলবে। পুস্তক-সংখ্যার বিরাটত্ব যে লাইব্রেরিগুলির আদর্শ, তারা লোকের তাক লাগাতে পারে, লোকের মন বসাবার জাদু সৃষ্টি করতে পারে না। শিক্ষিতা সুগৃহিণী অনেক মধ্যবিত্ত সংসারে সামান্য আয়ে সংকীর্ণ কুঠরিতে কেবল গিন্নিপনার শৃঙ্খলা গুণে স্বল্প কয়েকটি দ্রব্য নিয়ে এমনভাবে সংসার সাজিয়ে বসেন, যা সাতমহলার মহারাণীরও ঈর্ষার বিষয় হতে পারে। লাইব্রেরির শৃঙ্খলা সম্পর্কে আমেরিকার জন ডিয়ুই সাহেব 'দশমিক বর্গীকরণ প্রণালী' আবিষ্কার করেছেন। তাই এখন সারা পৃথিবীতে অনুসৃত হতে চলেছে। বাংলাভাষায় দশমিক বর্গীকরণ পুস্তক প্রথম সংকলিত ক'রে প্রকাশ করেন বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

লাইব্রেরিটা স্কুলকলেজ না হলেও, স্কুলকলেজের যোগ্য অনেক কাজ লাইব্রেরি থেকে সম্পন্ন হয়ে থাকে। আর, এই নূতন রকম স্কুলকলেজের মাস্টার প্রফেসর যাই বলা যাক সেই লোকটি হচ্ছেন লাইব্রেরিয়ান স্বয়ং। তাঁর সাহায্য পেলে অনেক বিপদ এড়ানো যায়। কিন্তু ক'জন এমন লাইব্রেরিয়ান মিলে, যাঁরা পাঠকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন? বুদ্ধিদোষে পাঠকরাও তাঁকে অনেক সময় এড়িয়ে যান। কিংবা দু'একবার তাঁর সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হলে ওপথ আর মাড়ান না। কেবল রুটিন, টেক্স্ট-বুক, সিলেবাস, নোট, টাস্ক ও এগ্‌জামিনের বাঁধা পথ

দিয়ে পাইকিরি হারে চ'লে-চ'লে যেমন শিক্ষার সবটা শেষ হয় না, শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের ব্যক্তিগত মেলামেশার খুচরো ব্যবস্থাটাও দরকার, তেমনি লাইব্রেরির ক্যাটলগ্ বা কার্ড-ইনডেক্স্ দেখিয়ে দিয়েই লাইব্রেরিয়ানের কাজ মিটবার নয়, পাঠকের রুচি গড়তে পারেন তিনি, তার বাজে পরিশ্রমের বোঝা বাঁচিয়ে সহজ পথে অনেক দুরূহ সাধনায় উতরে দিতে পারে তাঁরই সামান্য একটু গল্পগুজবের বিচক্ষণ ইঙ্গিত। সেই তো তাঁর সৃষ্টি, সেই তো তাঁর সার্থকতা। গুরুর গুরুত্ব বন্ধুর বন্ধুত্ব আত্মীয়ের হিতৈষণা, সব মিলে রয়েছে লাইব্রেরিয়ানের অমায়িক একটু হাসি এবং স্নিগ্ধমধুর সঙ্গের মধ্যে। এই মহান সম্পদ থেকে পাঠকদের বঞ্চিত করলে লাইব্রেরির পরিবেশটিকেই তিনি মেরে ফেলবেন, ইঁটকাঠের খট্‌খটে খাঁচা থেকে খস্‌খসে পাতার ঝট্‌পট্‌ই শুধু কানে আসবে, কবরখানায় বসে খাবার খাওয়া হবে, ঘরে ব'সে মানুষের সঙ্গে কথা বলা ও কাজ করার তাজা আমেজটি আর পাওয়া যাবে না। অথচ, সাধারণকে পাঠের অভ্যেস ধরাবার পক্ষে লাইব্রেরির শুষ্ক নীরব দুর্গমতার মধ্যে সে-আমেজটিই নির্ঝরী স্বরের প্রধান আকর্ষণ।

লেখার মধ্যে যাঁরা কথা বলছেন, যে দেশের কথা তাতে রয়েছে, যে লোকজন, ঘটনা, বিষয়বস্তুর কথা বলা হচ্ছে, সে সকলের কিছুই সামনে উপস্থিত নেই, সবই আমাদের কাছে নিখোঁজ হয়ে রয়েছে, এ সমস্তেরই প্রতিনিধি হয়ে যিনি আমাদের সামনে অবস্থান করেন, তিনি লাইব্রেরিয়ান। তিনি হদিশ দিলে, প্রাথমিক পরিচয়ের সুরটিতেই উৎসুক করে তুললে, তবে হৃদয় খুলে যায়। পাঠকের মন এবং বিশ্বমনের দু'মহলেরই চাবিকাঠি লাইব্রেরিয়ানের হাতে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিয়ানের গুরুত্ব কতখানি।

নিজেদের উদাসীনতার ফলে, লাইব্রেরিয়ানরা সমাজে যথার্থ সম্মানের আসনটি থেকে দূরে সরে আছেন। শিক্ষকদের যে সম্মান, সে-সম্মান এখনো তাঁরা লাভ করতে পারেননি। তার চেয়ে বেশি কিছু পাওয়া দূরের কথা। অনেকস্থলে তাঁরা কেবল টিকেট-চেকার, দপ্তরী ও দারোয়ানের কাজ করেই খালাস। আর-কিছু ভাববার বা করবার মতো কল্পনা বা উদ্যম তাদের মধ্যে স্ফূর্তি পায় না। কিন্তু ইচ্ছা করলে তাঁরা যা করতে পারেন, সমাজসেবী কারো চেয়ে সে কাজের মূল্য কম নয়।

এমনিতেই দেখা যায়, প্রায় লাইব্রেরির আশেপাশেই সংশ্লিষ্ট হয়ে গ'ড়ে উঠেছে কত ক্লাব। ব্যায়াম, খেলাধূলা, দুর্গতসেবা, সাহিত্য সমিতি, তর্কসভা, নাট্যসংঘ,

শিল্পপ্রদর্শনী—এ সবের মধ্যে কোনো-না-কোনো একটির দেখা মিলবেই। শুধু মনের চর্চা হয়নি, মানুষগুলিও কখন্ মিলে গেছে পরস্পরের দেখাশুনা থেকে।

সামাজিক জীবনের কেন্দ্র হয়েছে একালে লাইব্রেরিগুলি। কিন্তু তবু তেমন সামাজিক মর্যাদা কেন এরা অধিকার করতে পাচ্ছে না এটা ভাববার বিষয়। তার কারণ, এগুলি সুপরিচালিত নয়। এরা নৈতিক মান গড়ে তুলতে পারেনি। বই চুরি যেত না, বই হারানো, ছিঁড়ে ফেলা, নোংরা করা—এসব অযত্নের লক্ষণ দেখা দিতেই পারত না—পড়ার মূল্য সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট সচেতনতা থাকলে। একমাত্র ভালো বই পড়িয়েই সে চেতনা জাগানো যায়। বই পড়া এবং ভালো ক'রে বই সাজিয়ে রাখা সংস্কৃতির একটা অঙ্গ। প্রচার ও প্রদর্শনীযোগে সাধারণের গোচরে আনা চাই ভালো বইর তাজা খবরগুলি। শেলফে বই সাজানোর চেয়ে বেশি দরকারী বাইরে বইর-সম্বন্ধে নিয়মিত এই প্রচারের কাজটা। পোকায় কাটার চেয়ে বেশি মারাত্মক পাঠকের নির্লিপ্ত থাকাটা। বইয়ের পথ প্রশস্ত করে দেবার জন্য, ভ্রাম্যমান লাইব্রেরির প্রচলন করা যেতে পারে। এলাকার বাইরে যারা প'ড়ে আছে,—সেই চাষীমজুরের সাধারণশ্রেণী আর অন্তঃপুরের গৃহকার্য-ব্যাপৃতা মেয়েরাও তাতে-ঘরে বসেই হাতে পাবেন বাছাবাছা বই। তারি সঙ্গে তাদের মনের ঔৎকর্ষ বৃদ্ধির আরো চেষ্টা করা চলে। পাড়ায় পাড়ায় আলোচনা-সভা বা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষ বক্তাদ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা দরকার। নিরক্ষরতা ঘুচাবার আন্দোলন লাইব্রেরিরই আনুষঙ্গিক কাজ হওয়া উচিত—লাইব্রেরির প্রসার তাতে বেড়ে যাবার কথা। পড়তে না জানলে পাঠক বাড়বে কোথা থেকে ?

লাইব্রেরিতে যে-সব বই আমদানি হচ্ছে, তার যেমন রেকর্ড থাকে তেমনি সে-সব বইর পঠন এবং পাঠকদের মধ্যে কোন্ বিষয়ে কার কতদূর জ্ঞান সঞ্চয় ও সরবরাহের অধিকার বৃদ্ধি হল,—সেই ক্রমোন্নতিরও একটা হিসেবনিকেশ রাখলে তা ফলদায়ক হয়। এক-একটা বিশেষ বিষয় ধ'রে গবেষণার কাজে এগোনো যায়; পাঠকদের কাছ থেকে সংগৃহীত নানা তথ্য তার সাহায্যে আসবে। যার যে বিষয়ে অনুরাগ, তাকে দিয়ে সেই বিষয়ের দরকারী বইগুলি ক্রমান্বয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। তার লেখার অভ্যাস থাকলে তাকে দিয়েই গবেষণার ফল লেখানো চলে। না হয়, লেখায় অভ্যস্ত অন্যদের হাতে সে কাজ দিলে সমবায়পদ্ধতিতে এক একটা সুন্দর সৃষ্টি গ'ড়ে ওঠে। এই সহযোগ এবং সৃষ্টির কাজগুলি সম্ভব হতে পারে লাইব্রেরিয়ানের সূত্রে। যোগাযোগটা সকলের সঙ্গে সবদিক দিয়ে তিনিই

ঘটাতে পারেন সকলের মধ্যস্থ থেকে; আবহাওয়া জীবন্ত হয়ে ওঠে তাঁরি প্রেরণায় ও নিয়ন্ত্রণ কৌশলে। কোন্ পাঠক কোন্ বিষয়ে কত বই পড়েছেন, তিনি তার থেকে কী কী নূতন তথ্য জানতে পারলেন, কী কী নূতন লেখা কবে তৈরি হল,—এ সবই মাসে মাসে বছরে বছরে নিয়মিতভাবে প্রদর্শনী, সভাসমিতি, পত্রিকা, বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি সাহায্যে সাধারণের গোচরীভূত করা ভালো; এতে পাঠকদের উৎসাহ যেমন বাড়ে,—কাজের একটা ধরাছোঁয়া রূপ দেখতে পেয়ে আর্থিক ও নৈতিক পৃষ্ঠপোষকদের সংখ্যাও তেমনি বৃদ্ধি পায়।

পাঠক এবং লাইব্রেরিয়ানের পরেই, লাইব্রেরির যোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে পুস্তক-প্রকাশকদের সঙ্গে। প্রকাশকগণ লাইব্রেরিতে ক্যাটালগ্ পাঠিয়েই ক্ষান্ত হন, লাইব্রেরিয়ানও বইর অর্ডার পাঠানোই মনে করেন একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু পাঠকদের নিয়েই দু'দলের আসল দরকার। আজকাল বরং প্রকাশকদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। নানা উপায়ে তাঁরা দূরে থেকেও চেষ্টা করছেন পাঠকদের কাছে পৌছতে। ব্যবসায়ের তাগিদ ছাড়িয়েও বন্ধু এবং শিক্ষকের যোগ্য প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ গড়ে তুলছেন তাঁরা সহৃদয়তা ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন দেখিয়ে। তাতেই ব্যবসার প্রসারও সহজ হচ্ছে। কত পত্র ও পত্রিকা তাঁরা পাঠিয়ে থাকেন পাঠক খুঁজে-খুঁজে বিনামূল্যেই। অযাচিত খবরের হরির লুঠ ছড়িয়ে যান। লাইব্রেরিগুলি সে-পরিমাণে পিছিয়ে রয়েছে। বই সরবরাহ করা ছাড়া তাদের আর কাজ নেই। কোথায় এ কাজটাই ছিল প্রকাশকদের, এখন লাইব্রেরিয়ানরা হয়েছেন কার্যত প্রকাশকদের এজেন্ট। প্রকাশক ও লাইব্রেরিয়ানরা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ-রক্ষা ক'রে পাঠকদের পড়ার রেকর্ডগুলির নানারূপ অনুশীলন দ্বারা পড়ার বিষয়, প্রণালী এবং আগ্রহ আরো বাড়িয়ে তুলতে পারেন; নানা ধরণের নূতন নূতন বই তাঁরা লেখাতে পারেন গ্রন্থকারদের দিয়ে। লোক-শিক্ষাই শুধু নয়, উচ্চ শিক্ষার অনেক কাজ হতে পারে ঘরে ঘরে। প্রকাশনা দস্তুরমতো এখন এ দেশেও একটা বিজ্ঞানে পরিণত হতে চলেছে। লাইব্রেরিয়ান-শিপ শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে কলকাতা, বেনারস, দিল্লি, মাদ্রাজ ও অন্ধ্রের ওয়ালটেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আরো উন্নততর ব্যবস্থা রয়েছে। এদেশ থেকে মাঝে মাঝে আজকাল ছাত্রছাত্রীরা যাচ্ছেন তা শিখতে। এটা আনন্দের বিষয়। কিন্তু তাঁরা দেশে ফিরে কাজ পাবেন এমন কর্মক্ষেত্র কোথায়! তারা নিজেদের কৌশলে ও কৃতিত্বে কর্মক্ষেত্র তৈরি করে নেবেন,—এই মাত্র আশা করা যেতে পারে। সে তো সময় সাপেক্ষ।

ইতিমধ্যে তাঁদের কাজ সহজ করার জন্য আমাদেরও জমি তৈরির চেষ্টা করা উচিত।

বইয়ের পরিচয় আজকাল প্রকাশকরাই মলাটের বিজ্ঞাপনে অনেকটা দিয়ে রাখেন; লাইব্রেরিয়ানরা সেইটিকে নোটিশ-বোর্ডে সেঁটে দিয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন মাত্র। কিন্তু তার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা সমীচীন নয়। ব্যবসার খাতিরে তার মধ্যে বাড়িয়ে বলা থাকে, নিজেরা দেখেশুনে মতামত গড়া ভালো। তারপরে পাত্র বুঝে বই-পত্র হাতে দেবার ব্যবস্থা হলে পাঠকদের সময় অযথা নষ্ট হবে না, রুচিরও বিকার ঘটবার অবকাশ কম থাকবে। লাইব্রেরির কাজে লোক উপকৃত বোধ করবে। এই ক'রেই লাইব্রেরির জনপ্রিয়তা বাড়বে। কিন্তু এর বদলে, লাইব্রেরিতে ঢুকে প্রায়ক্ষেত্রেই বাঁশবনে ডোম কানা হ'নে যেতে হয়। একটা খারাপ বই পড়ে নিরাশ ও পরিশ্রান্ত পাঠক মনে মনে লাইব্রেরির প্রতি যে-পরিমাণে অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে, তার তীব্রতা আঁচ করতে পারলে লাইব্রেরিয়ান হয়তো এতটা উদাসীন হতে পারতেন না। আবার, ভালো বই প'ড়ে আনন্দে যখন পাঠক আত্মহারা হয়, তখনো সে লাইব্রেরির দানকে ভুলে থাকতে পারে না। কৃতজ্ঞায় সে আরো বেশি আকৃষ্ট হয়, আর, তার মধ্যে যদি লাইব্রেরিয়ানের সাহায্যের সক্রিয় আগ্রহ কিছুটাও সে অনুভব করতে পারে, তবে তাঁর উদ্দেশেও সে যে শ্রদ্ধাপ্রীতি পোষণ করে, তার পরিমাণ সামান্য নয়। সে জিনিস লাইব্রেরিয়ান অনুভব করলে তিনিও জানতেন তাঁর আসল মূল্য কোথায়।

ক্রমে অনবধানে লাইব্রেরিগুলি বইর গুদামে পরিণত হয়ে থাকে। তাদের প্রাণবন্ত শক্তিসঞ্চারক কেন্দ্রে পরিণত করবার জন্য পাঠকদের কাছ থেকে নূতন বইর নাম সংগ্রহ, পঠিত পুরাণো বইর সম্বন্ধে মতামত আলোচনা তো দরকারই, এসব ছাড়াও নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ বাঞ্ছনীয়। তাতে পাঠকদের আহৃত তথ্যই নানা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাজাতে হবে। মাঝে মাঝে প্রবন্ধ, তথ্যসরবরাহ ও সম্পাদনা কাজে প্রতিযোগিতাও আহ্বান করা যেতে পারে। সাময়িক পত্রিকা-গুলিতে যে সব ভালো লেখা থাকে, তার তালিকা এবং সারসংক্ষেপও সে-বুলেটিনে সংকলিত করা চলে। মাসে মাসে নানা উৎসব-অনুষ্ঠান লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠেয়। জ্ঞানী, কর্মী, ভক্তসাধকদের জীবনী আলোচনা, তত্ত্বব্যাখ্যা, গানবাজনার ও জলসার উপলক্ষে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারেরও কিছু সরস আয়োজন রাখা চাই। ম্যাজিক-ল্যান্টার্ন-লেকচারও খুব কাজ দিয়ে থাকে। পাড়ায় পাড়ায় সাপ্তাহিক কথকতা বা গল্পসভার অধিবেশন বড়োছোটো সব মহলেই পরম

আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠবে। সমাজের শ্রদ্ধাভাজন কৃতিপুরুষদের সংবর্ধনা, মহৎ কীর্তি ও ঘটনার আলোচনা—এগুলিও লাইব্রেরির বহির্মুখী কাজের অঙ্গীভূত হতে পারে। এর দ্বারা সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের চিন্তাভাবনা ও চলাচলের মধ্যে লাইব্রেরিকে সজীব প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়।

আজকাল খবরের কাগজগুলিতেও চিন্তার খোরাক জোগাবার মতো তথ্যবহুল রচনা প্রচুর প্রকাশিত হচ্ছে। সেগুলি সুখপাঠ্যও হয়ে থাকে। বোঝা যায়, সাধারণের মধ্যে মনস্বীতার প্রসার হচ্ছে, যেমন-তেমন ক'রে জিনিস পরিবেশন করাও আর চলে না। শ্রী-সৌন্দর্যে তা সমৃদ্ধ হওয়া চাই। এর থেকে ভরসা করা যায়, লাইব্রেরিগুলিতে বাজে গল্প-উপন্যাস ও সস্তা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের রাজত্বের সীমা সংকীর্ণ হয়ে আসছে। ভালো জিনিস ভালো ক'রে চোখের উপর ধ'রে দিলে পাঠকরা নিতান্ত তা হতশ্রদ্ধা ক'রে ফেলে দেবেন না, একটু মাথা খাটিয়ে তার মর্মগ্রহণে প্রয়াসী হবেন। স্থানীয় সামাজিক সংস্কৃতির মানও এজন্য উন্নত করা প্রয়োজন। সে কাজ হ'তে পারে বাইরের শ্রেষ্ঠ গুণী জ্ঞানীদের বা প্রতিষ্ঠানকে নানা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটিয়ে। তাঁরা যে দু'চার কথা ব'লে যাবেন, তার প্রভাব কাজ করবে লোকের মনে মনে। স্থানীয় স্কুল-কলেজ, সংঘ-সমিতি, বারলাইব্রেরি সকলের সংযোগই লাইব্রেরিতে কেন্দ্রীভূত করা চাই।

শিশুদের বইগুলি নির্বাচন বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ছোটো ব'লে কোনোক্রমেই তাদের দায়িত্ব ছোটো হবার নয়। তারাই তো জমিয়ে রাখে লাইব্রেরির বহিরঙ্গণ। তাদের বসবার কক্ষ ছবিতে ম্যাপে সুন্দর ক'রে সাজানো থাকবে। পঠিত ভালো বইর সংখ্যা-অনুসারে পাঠকদের সম্বর্ধনা বা তাদের মধ্যে পুরস্কারদানের ব্যবস্থা করলে সকলের মধ্যে পাঠের উৎসাহ বাড়তে পারে। এক-একদিন তারা বৈঠকে ব'সে যার যার ভালো লাগা বইর বিষয়ে প্রত্যেকেই কিছু কিছু আলাপ-আলোচনা করবে,—এ ব্যবস্থায় বিচিত্র বিষয়ে পাঠের অনুরাগ পরস্পরের মধ্যে তারাই নিজেরা জাগিয়ে তুলবে। একে অন্যের কাছ থেকে ভালো বইর সন্ধান পেয়েও উপকৃত হবে।

লাইব্রেরি দেবমন্দিরের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং মনোভাবের অমলতা সেখানেও সমানই দরকার। দৈনিক ভোগারতির প্রকরণ ও সময়-নিষ্ঠা মন্দিরে যেমন সুরক্ষিত থাকে, - এখানেও তেমনি সময়মতো লাইব্রেরি খোলা ও বন্ধ করা এবং বই ঝাড়াপোঁছা, সাজিয়ে রাখা, বইর আদান-

প্রদান—এসব নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গেই সম্পন্ন হওয়া চাই। তাতে পাঠকদের মধ্যেও পঠনে নিষ্ঠা সঞ্চারিত হয়। পোকামাকড় বাসা না বাঁধে, সারা গৃহে এজন্য নিত্য ধূপের ধোঁয়া বুলানো ভালো। মাঝে মাঝে বইপত্র ঝেড়েঝুড়ে পাতার ভাঁজে-ভাঁজে নিমপাতা ভরে রাখলে পোকার উপদ্রব কমতে পারে।

বই নিয়েই লাইব্রেরী। চাঁদা, এককালীন দান, সরকারী বৃত্তি—এসব আর্থিক আয়ের উপায়গুলি ছাড়াও সভ্যদের জন্য এই বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকা চাই যে, তারা প্রত্যেকেই কিছু কিছু ক'রে পুঁথিপত্র সংগ্রহের ভার নেবেন। এ সমস্ত সংগ্রহের বিষয় লাইব্রেরির বুলেটিনে রীতিমতো প্রকাশিত হবে। সে সঙ্গে স্থানীয় পুরাতাত্ত্বিক উপাদানগুলিও সংগ্রহের কাজ করা হবে লাইব্রেরি থেকেই। এই ক'রে লাইব্রেরির সংলগ্ন একটি মিউজিয়াম গ'ড়ে তুলতে পারলে ভালো হয়। গবেষণা-বিভাগও একটি যা থাকবে, সেটি হবে পরম সম্পদ। তার মানের উপরেই লাইব্রেরির আভিজাত্য গড়ে উঠবে। লাইব্রেরি এমন অঞ্চলে স্থাপিত হওয়া চাই,—যেখানে হট্টগোল নেই,—কিন্তু সকলেরই যাতায়াতের সুবিধা আছে। অতি আভিজাত্যের ভাব আবার সাধারণের সঞ্চরণে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়—সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। একটি সহজ শুচিতা সমাদরের আহ্বান ছড়িয়ে থাকবে তার আশেপাশে এইমাত্র।

আমাদের দেশেও লাইব্রেরির আন্দোলন দেখা দিয়েছে। এটি সুখের বিষয়। বরোদা রাজ্য এ বিষয়ে পুরোধা। সাহিত্য ও শিল্প-বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারটি ভারতে অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহের কাজেও এ প্রতিষ্ঠান অগ্রণী হয়ে উঠেছে। কিন্তু বেশি ক'রে এখন সাধারণের মধ্যেও লাইব্রেরির প্রসার প্রয়োজন,—কারণ লাইব্রেরি জনশিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

আধি হচ্ছে মনের রোগ। ব্যাধি হচ্ছে দেহের। দু'দিকে নিরাপত্তা রক্ষিত হ'লে স্বাস্থ্যবান জাতি তবে কিছু করতে পারবে। ভিতরে বাইরে সর্বপ্রকার অধীনতা থেকে সাধারণকে মুক্ত করতে হ'লে সংসারে দুটি জিনিস সকলেরই জন্য চাই। প্রাথমিক প্রয়োজনের সে দুটি জিনিস হচ্ছে—শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। দেহে এবং মনে যেমন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, এ দুটি বিষয়েও সম্বন্ধ সেইরূপ। প্রধানতঃ এ দুটিকে ভিত্তি ক'রেই জাতীয় সত্তার বিকাশ ঘটে। সুতরাং মনের দিকে শিক্ষার মতো দেহের দিকে স্বাস্থ্যকেও মজবুত রাখার বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আমাদের অপরিহার্য আদি কর্তব্য।

এদিকেও অর্থ এবং রাষ্ট্রের প্রশ্নটার গুরুত্ব আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার একান্ত অসদ্ভাব হ'লে, এমন নয় যে, সব-কিছু ঠেকে থাকবে। লোকেরা নিজ নিজ এলাকায় নিজেরাও কোমর বেঁধে অনেক কিছু করে নিতে পারে। এজন্য বেশি কিছু অন্যকে বলবার নেই, শুধু চাই সংঘবদ্ধতা ও উদ্যম। রাজসরকারের দিকে তাকিয়ে থাকার তিক্ত অভিজ্ঞতা সকল কালেই প্রায় একরূপ। বিদেশী শাসনের দিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ" রচনায় লিখেছেন: "মনে করে দেখো না—এ দেশে বহু রোগজর্জর জনসাধারণের আরোগ্যবিধানের জন্যে রিক্ত রাজকোষের দোহাই দিয়ে ব্যয়সংকোচ করতে হয়, দেশজোড়া অতি বিরাট মূর্খতার কালিমা যথোচিত পরিমার্জন করতে অর্থে কুলোয় না; অর্থাৎ যে সব অভাবে দেশ অন্তরে বাহিরে মৃত্যুর তলায় তলাচ্ছে তার প্রতিকারের অতি ক্ষীণ উপায় দেউলে দেশের মতোই; অথচ এ দেশে শাসনব্যবস্থায় ব্যয়ের অজস্র প্রাচুর্য একেবারেই দরিদ্র দেশের মতো নয়। তার ব্যয়ের পরিমাণ স্বয়ং পাশ্চাত্য ধনী দেশকেও অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। এমন কি, বিদ্যাবিভাগের সমস্ত বাহ্য ঠাট বজায় রাখবার ব্যয় বিদ্যা পরিবেষণের চেয়ে বেশী।"

মহাজনরা ব'লে গেছেন, খালি পেটে অর্থাৎ না খেয়ে ধর্ম হয় না। শরীরটাকে তাজা রাখলে তবে মনেরও তেজ বাড়বে। নানা কুসংস্কার আমাদের ভর করেছে, সে অনেকটা সম্ভব হয়েছে শরীর আমাদের পোড়ো বাড়ি ব'লে। খেতে পয়সা লাগে। আমাদের পয়সা নেই, সেকথা সত্য। উপবাস আর

অনাহারের দেশে যেটুকু আমাদের খাওয়া মেলে তাও এমন নোংরা পরিবেশে, এমন অনিয়মে অসংযতভাবে আমরা খেয়ে থাকি যে, ধর্ম এদিকে পা বাড়িয়েও 'পরিত্রাহি' ডাকে দূরে পালায়। এটা স্বাস্থ্যে অজ্ঞতার নিদর্শন। অস্বাস্থ্যের মতো অশিক্ষায় আমাদের ঘিরে আছে। তাই সবদিকে আমরা এমন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে চলি।

যেখানে আয় অল্প, সেখানেই হিসেব ক'রে খরচের কথা আসে। কিন্তু আমাদের হয়েছে উল্টো, হাতে পেলেই আমরা বেপরোয়া হয়ে উঠি। হাতে না থাকলে ধার ক'রেও অনেক সময় খরচ করতে পেছ-পা হইনে। এজন্য মধ্যবিত্তের মাথা ধারে একরকম বিকিয়েই আছে। এদিকে কিন্তু স্বাধীনতার আসর জাঁকায় তারাই। আসলে তারা জানে না, তাদের স্বাধীনতার দেবী-প্রতিমা এখনো সাত হাত পাঁকের তলায়। তারা শুধু এবাড়ি-ওবাড়ি স্বাধীনতার ভাড়াটে বাজন্দার। সে যা হোক্, এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, সর্বহারাদের পক্ষে স্বাধীনতার জন্য বড়-বড় হাঁকডাকের যতই প্রয়োজন থাক্, তাদের নজর দেওয়া দরকার নিজেদের বাস্তব দিকেও।

আয় বুঝে তারই মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে আগে থেকে বাজেট ক'রে : দেখতে হবে, অল্প যেটুকু যখন জোটে, তারই থেকে সঞ্চয়ও কিছু যাতে থাকে সামান্যের অপচয় মাত্র যাতে না ঘটে। তবেই তারা পরের দেনা থেকে যতটুকু হোক্ বাঁচবে ; পরের উপর নির্ভর যত কমবে, অধীনে রাখবার সুযোগ, ভাঙিয়ে খাবার উপলক্ষ অন্যে ততই কম পাবে এবং সে পরিমাণেই তাদের পক্ষে নিজেদের স্বাধীনতার পথ আসবে সুগম হ'য়ে। তাহলেই দেখা যাবে, জীবনযাত্রার মান কিছুটা স্বাভাবিক প্রয়োজনমতো খাটো করাও হয়তো অনিবার্য।

এখন, এই যে সাবধান হয়ে হিসেব ক'রে চলা, সে কেবল টাকাপয়সাতেই নয়, যেখানেই যে মাথা গুঁজে আছি, সেই মহলার ঘরবাড়িতে যখন যার যেটুকু খাওয়া-পরা জোটে, সেই অন্নবস্ত্রে এবং রোগভোগের বেলা যে চিকিৎসাটুকু মেলে,—এইসবের বেলাতেই হিসেব চাই, দেখে চলা চাই, যেন কোনোদিক দিয়েই কোথাও কেউ আমাদের উপর দিয়ে ফাঁকি না চালায়, আমরাও যেন নিজেরা অবহেলায় উচ্ছৃঙ্খলায় কোনো জিনিসের সদ্ব্যবহারে নিজেদের ফাঁকি না দিই। যেন না ভুলি এ কথাও মিথ্যে নয়, প্রতিকার যত সুলভ হচ্ছে, আমাদের দায়িত্ব-হীনতাও বেড়ে যাচ্ছে ততই। হজমিগুলি আছে জেনেই বেপরোয়া ভোজ খেয়ে থাকি ; রোজগারের পথ খোলা পেয়েই কাঁচা পয়সা উড়িয়ে চলি। তাহলেও

প্রতিকার জেনে রাখা ও পালন করার শিক্ষাই আমাদের বড়ো শিক্ষা, সেইটেই জানতে হবে প্রধান কর্তব্য।

এই কর্তব্যে অজ্ঞ বা শিথিল-প্রযত্ন থেকে রোগ বাধাই প্রথমে আমরাই। দেহে না বাঁচলে বা রোগে পঙ্গু হয়ে থাকলে অর্থোপার্জন বা জীবনের যা-কিছু সাধনা ও উপভোগ, সকল সম্ভাবনাই মূলে হয় ব্যর্থ। এই বিশেষ দিকের শিক্ষাটুকুর অভাবে বয়স্ক হয়েও আমরা অসহায়ভাবে চিকিৎসকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি; রোগের সময় সাধারণ লক্ষণগুলি ধ'রতে পারিনে। সেই অবকাশেই রোগ চরমে এগোয়। মরি বেশি এই ক'রে আনাড়ি আমরাই। এর প্রতিকারের উপায়, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিদ্যায় প্রাথমিক শিক্ষা দেশময় আবশ্যিক করা।

সামান্য একটা ঘটনাই ধরা যাক্। সুস্থ সবল শিশু, দেখতে দেখতে একটু জ্বর হ'তেই অমনি প্রতিকারের বাইরে গিয়ে প্রাণ হারালো। কেউ বললো ম্যানিঞ্জাইটিস্, কেউ বললো জ্বরবিকার, বাড়ির ধারণা বাতাস লাগা, বাড়ির ঝি বোধ হয় ভাবছে পেঁচোয় পেয়েছিল। শেষে ডাক্তার বললেন, ভগবানের হাত, ভাগ্যের লেখা।

কিন্তু এই ব'লেই কি ছেড়ে দেব? ভেবে দেখা যাক্, এ দুর্ঘটার মূলে আর কী-কী কারণ সম্ভব হতে পারে। আর কিছু নয়, এর থেকে এটুকু মাত্র দেখবার আছে যে, যা ঘটে গেছে, সে তো গেছেই,—ভবিষ্যতে অন্য আরো অনেকের ক্ষেত্রে এরূপ কিছু ঘটবার আগে যদি সাবধান হওয়া চলে।

এমনও হতে পারে, শিশুটি দীর্ঘকাল ধরেই স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করেছে অজ্ঞতাবশত অথবা অগোচরে। তারপরে আনুষঙ্গিক কত কী ঘটতে পারে!

হয়তো কোনো উৎসব বা মেলার আনন্দে ঘোরাঘুরি, অনিদ্রা, কখনো আবার যেখান-সেখান হতে কেনা-খাবার খাওয়া ইত্যাদি শিশুদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। হঠাৎ এর থেকে কোনো-এক মুহূর্তে সকল কারণ একত্রে মিলে প্রতিক্রিয়া ঘটেছে বেসামাল রকমের। অভিভাবকদের অসতর্কতা রয়েছে এর মূলে। এ ছাড়াও বাইরের কারণ থাকাও বিচিত্র নয়। সেটা থাকার কথা স্যানিটেশনের দিক থেকে। স্বাস্থ্যনীতি-সংরক্ষণ রীতিমতো চললে, রোগ বা রোগের জন্য চিকিৎসা, কোনোটারই তেমন দরকার হয় না। রোগের সমস্যা গোড়া থেকেই স্বাস্থ্যবিধি-প্রচারে অর্থাৎ শিক্ষায় মেটে চার আনা, স্যানিটেশনে আট আনা, আর বাকি চার আনা যেটুকু থাকে সে টুকুর জন্যই চাই চিকিৎসা। চিকিৎসার কথা পরে, স্যানিটেশনের কথাটা আগে আলোচ্য। এই দিককার অব্যবস্থার

দরুণ কত লোকের জীবনে যে দুর্দৈব কায়েমীভাবে রাজ্য বিস্তার ক'রে আছে ইয়ত্তা নেই। শুনেছি নবাবী আমলে দেশে ছিল জ্যান্ত কবর,—তবু তা মাটিতে পুঁতেই দিত, ডালকুত্তা লেলিয়ে দিয়ে খাওয়ালেও ছিল সেটা একদিনের কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। হালের ব্যারাকগুলি দেখতে আশ্রয়, কিন্তু তার মধ্যে পুরে দিয়ে মানুষ মানুষকে তিলে-তিলে বদ্ধ সিন্ধুকে হাঁপিয়ে মরতে দেখ্‌ছে। এটা সম্ভব হয়েছে শুধু মনের অসাড়তার দোষে। নির্বাচনী সফরে বেরিয়ে জহরলাল উত্তরপ্রদেশের কানপুর শহরে ব্যারাক্ পোড়াতে বলেছিলেন। আশা করি তা এ স্থলে সকলেরই মনে পড়বে।

ব্যারাকের কর্তারা বহুদিন ধ'রে নানা উপায়ে মানুষকে সপরিবারে শোষণ ক'রে আপন-আপন সিন্ধুক ভর্তি করে আনছেন। অনেকদিন থেকেই চলেছে আর্তের দুঃখ-নিবেদন, কিন্তু দেখে আসুন যে-কোনো শহরের মিল-অঞ্চলগুলি; বুঝবেন নরকের আরম্ভ কোথায়, ঐ বস্তি ব্যারাকগুলিতে। আর তারই কিছু-কিছু নমুনা আমাদের আশেপাশেও দেখা যাবে, আমাদেরই কাউকে-কাউকে এরিমধ্যে নিপীড়িত ক'রে তা বর্তমান আছে। একদিকে অজস্র অপব্যয়, শৌখীনতার অন্ত নেই, অথচ একটু খোঁজ নিলেই জানা যাবে,—কাছেই আছে নরককুণ্ড, 'ড্রেন' তার নাম,—খোলা পড়ে আছে। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে অনেক উপদেশ মিলবে। ঐ নরককুণ্ডে মৃত্যুবীজ জন্মাচ্ছে, কবে কাকে ধরে কে জানে! সুযোগ আছে, সুবিধা আছে, বিদ্যাও দেখ্‌ছি আছে—কেবল তৈরি হয়নি প্রয়োগপটু মন।

বলি একটা ঘটনা—রান্নাঘরে এক ব্যক্তি খেতে বসেছিল। পনের কুড়িদিন বাদে সেদিনই এল মেথর। পচা জল ও ময়লার রাশি মেথরটি গর্ত থেকে তুলে পাশেই সব ফেলতে লাগল। ড্রেন থেকে লোকটি খেতে বসেছিল মাত্র দু'তিন হাত দূরে। কারণ, বাসার দক্ষিণদিকে রান্নাঘর, এবং এইরূপই সেখানে ড্রেন-ব্যবস্থা অর্থাৎ বেশিদূর ড্রেন কাটা নেই—প্রায় চারিদিকেই উঁচু জমি। দুর্গন্ধে খেতে-বসা লোকটির বমির উদ্রেক হয়। কখন্ কোন্ কুক্ষণে যে মারাত্মক রোগ-বীজাণু তার দেহে ঢুকল, কে বলবে! দু'দিন বাদে দেখা গেল, তার মৃত্যু ঘটেছে। ডাক্তার বললেন—বেসিলাই ডিসেন্ট্রি। একটি প্রাণী যে এরূপে মারা পড়ল, কারও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বলেছিলাম, মন তৈরি না হলে কিছুই হয় না। উদাহরণের শেষ নেই। যার দৃষ্টি আছে পথে-ঘাটে সেই তা দেখতে পারে।

নিরাশ্রয়া রমণী,—রোগাক্রান্ত হয়ে পথেই প'ড়ে ছিল। দয়াপরবশ হয়ে একব্যক্তি তাকে তুলে নিয়ে গেল হাসপাতালে। কোথাও মেলে না আশ্রয়। পুলিশের হেফাজতেও তাকে গছানো গেল না। তারা বললে, যে মহল্লার রোগী, এসব দায়িত্ব সেখানকারই। অবশেষে যেখান থেকে তাকে উঠিয়ে নেওয়া সেখানেই রাখা হল তার দেহ। মৃত্যুর পরে ডোম এসে সাফ করে গেল জায়গাটা। গত ৬ই জুন (১৯৫২) তারিখের "যুগান্তরে" প্রকাশিত শিয়ালদহ প্লাটফর্মে যক্ষ্মাক্রান্ত উদ্বাস্তু নারীর ঘটনাটি এস্থলে স্মরণীয়। কোনো হাসপাতালেই এসব রোগীর আশ্রয় মেলে না। ওরা প্লাটফর্মে অমনি প'ড়ে থাকে। কত, তার কি হিসাব আছে?

প্রকাশ পাবে, অনেক মহল্লার হাসপাতাল সর্বক্ষণ খোলা রাখা ও পালাক্রমে একজন ক'রে ডাক্তারের সর্বক্ষণ সেখানে উপস্থিতির ব্যবস্থা দরকার। ঢিলেমি চলছে সেখানেও।

একস্থলে, বিশেষ এক শিক্ষিত অঞ্চলেই,—হাসপাতাল নিয়মিত সময়ে খোলা হয়নি। ততক্ষণই ছিল বন্ধ। মুমূর্ষুকে ওষুধ এনে খাওয়াতে হয়েছে অসময়ে, রোগের আক্রমণের পাঁচ ছ' ঘণ্টা পরে। রোগের প্রকারভেদে এই ফাঁকে প্রাণ-নাশ ঘটা অসম্ভব নয়। সুবৃহৎ জনবস্তির ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা যে কত বিপজ্জনক, সে হুঁসটুকুও নেই কারো।

আবার কোনোস্থলে হয়তো দেখা যাবে, চিকিৎসা সুরু থেকেই চলেছে ভুল পথে। ফোঁড়াফুঁড়ির ত্রুটি নেই, ওষুধও চলছে হরদমই, এমনকি, যেখানে পিপাসায় রোগী আছাড়ি পিছাড়ি করেছে, জল দিলে যেখানে জ্বালার একটু উপশম হত, সেখানে সাবধান করা হয়েছে নির্জলা রাখবার দিকে। ফল যা হবার তাই হল। প্রাণের মূলোচ্ছেদ ঘটল সেই চিকিৎসাতেই কিনা, কে বলবে।

ঠিক এরকমই একটি ঘটনা ঘটেছিল এক ভদ্রলোকের গৃহে। কাজ করতেন ব্যাঙ্কে। রোগের তিনি কী জানবেন! তার পিতৃদেবের হল অসুখ। আনালেন বিলেত-ফেরৎ এম-ডি-কে। রোগী তাঁর হাতে দিয়ে ভদ্রলোক আছেন নিশ্চিন্ত। কয়েক দিনই কেটে গেল। ডাক্তারটি নিজে রোগের গতি রুখ্‌তে পারছেন না। তবু পরামর্শে ডাকছেন না আর-কাউকে। রোগীর যখন অন্তিমকাল, কাতর পুত্রের স্থৈর্য ভাঙল। গাড়ি নিয়ে ছুটে গেলেন শহরের শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের কাছে। চৌষট্টি টাকার ভিজিট। তাই জুগিয়েই তিনি তাকে আনলেন। নিদানকালে ডাক্তারবাবু বললেন, মৃত্যু আসন্ন। গঙ্গাযাত্রার আয়োজন দেখুন। সম্পূর্ণ ভুল

রোগ-নির্ণয়ে, বিপরীত চিকিৎসায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে, এখন আর কিছু করার নেই। যাকে বাংলার ধন্বন্তরী বলা চলে তিনিই দিলেন এই রায়। বয়সেও তিনি বড়ো ছিলেন। উপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে দু' ডাক্তারই যখন নেমে আসছেন—শোনা গেল পূর্বের ডাক্তারটিকে তিনি বলছেন,—"এ লাইনে এলে কেন? লেখাপড়া শিখেছ, ভদ্রলোকের ছেলে। জীবিকার কি এতই অভাব যে, মানুষ মেরেই খেতে হবে! ডিগ্রিটা তোমার কেড়ে নেওয়া উচিত।"

বেচারা পুত্র! ব্যাপারটা না জেনে ভদ্রলোক ছিলেন ভালো। সবই ধরাবাঁধা নিয়তি ব'লে চুকে যাচ্ছিল। কিন্তু, সেক্ষেত্রে সারাজীবন জ্বলতে থাকলেন তিনি এই অনুতাপে,—বাবা তো গেলেনই, তাঁর মৃত্যু কিনলাম কিনা পয়সা খরচ ক'রে! শ্রাদ্ধশান্তিতে যেটুকু শান্তি হত, তাও হারাতে হল—মৃত্যুর কারণ জেনে। বুঝলেন তিনি—কতখানি সত্য সেই যে ইংরেজি প্রবাদে বলে: Ignorance is a bliss.

বাঁচন-মরণ সীমানার সমস্যা হচ্ছে চিকিৎসা। এ অত্যন্ত জরুরি। তাই এ প্রসঙ্গে আরো দু' একটি কথা বলি। এক্ষেত্রে চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে। রোগীর সঙ্কট অবস্থাতে ডাক্তারবাবুরা নিজেরা যখন তেমন কিছু একটা স্থির ক'রে উঠতে পারছেন না, সে সময়ও তাঁদের প্রতি একান্ত নির্ভরপরায়ণদের ক্ষেত্রে তাঁরা যেন দয়া ক'রে অন্য ডাক্তারের সাহায্য নেবারও একটু পরামর্শ দেন। এতে ব্যবসায়ের দিক থেকে কেউ যদি কিছু আশঙ্কা করেন, আমাদের বিশ্বাসে তা অমূলক। বরং তাঁরা যে সত্যিকার দায়িত্বশীল ও কল্যাণকামী, এই বিশ্বাসই দৃঢ় হবে রোগীর বাড়িতে বাড়িতে। আর কেউ যদি হাত পাকাতে বা যশ লাভার্থে চেষ্টা-করে-দেখার সুযোগ নিতে চান, তবে বলতে হয় প্রাণ নিয়ে চেষ্টা মারাত্মক হলেও সে অধিকার তাঁদের কিছু না আছে নয়, কিন্তু তার সীমারেখাটুকু যেন ভুল না হয়, এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। অন্য ডাক্তার ডেকে মৃত্যু ঠেকানো না যাক অন্তত আত্মীয়স্বজন আনাড়িদের মনে একটা দুঃখ থাকবে না—এইটুকু করা চলবে। আর, কেউ যদি রোগীর দায়িত্বে পূর্বে থেকে ব্রতী থাকেন, তবে তার সংকটাবস্থায় খুব অসম্ভব না হলেও না-ডাকতে নিজেরা গিয়েও যেন দু'একবার রোগীর অবস্থা দেখে আসেন। টাকার চেয়ে আরোগ্য বড়ো। সেই আরোগ্য ঘটুক না ঘটুক,—অক্ষত থাকবে সুনাম। সুনামই আনবে তাঁদের টাকার সুযোগ। কিন্তু সে কথা সকলে কি মনে রাখবেন? এসব চিকিৎসাবিভ্রাটে যখন এরূপ মৃত্যু ঘটে, সাধারণ লোকের পক্ষে এই রকমই তার কারণ

বুঝবারও উপায় থাকে না। এগুলিকে তারা মেনে নেয় দৈবের বিধান ব'লেই।

শুধু চিকিৎসা নয়, যে-কোনো দিকে ত্রুটি থাকতে দেওয়া মানেই এরূপ দৈব-বিধানের সম্ভবনা জিইয়ে রাখা। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, মূলে আমাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক ত্রুটি থাকে যথেষ্ট। সেদিকে নিশ্চয়ই আগে আমরা সতর্ক হব। কিন্তু সে সঙ্গে পৌর-প্রতিষ্ঠানগত কর্তব্যও যে না থাকে এমন নয়। বরং অনেককিছুই তাদের করার থাকে যা আবার অন্য কারো দ্বারা সম্পাদিত হওয়ারই নয়।

এই জন্যেই স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বিস্তার সঙ্গে আরো একটি আছে অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়—সেটি পৌরবিজ্ঞান। তার মধ্যে আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধে পরস্পরের নাগরিক দায়িত্ববোধ এবং ক্রমবর্ধমান সংঘ জীবনের শৃঙ্খলা যেমন শেখবার আছে, তেমনি গভর্ণমেণ্টের কাছে আমাদের দাবি ও অধিকারের সীমাও জানবার বিষয়। কোন্ কোন্ স্থলে কী রকম পৌরব্যবস্থা কতটা সম্ভব তা জানা দরকার। তা জানলে আমরা যেমন তার পরিপূর্ণ সদ্‌ব্যবহারে সচেষ্ট হতে পারি, তেমনি কর্তৃপক্ষের কাছে অসম্ভব সব দাবি দেওয়া আমাদের বন্ধ হ'তে পারে, কারণ, তার অযৌক্তিকতা বুঝতে পেরে নিষ্ফল আন্দোলন করা থেকে আমরা নিজেরাই তখন নিবৃত্ত থাকব। নিয়তি মানা ও না-মানার প্রশ্নও তার দ্বারাই অনেকখানি যায় মীমাংসিত হয়ে। কারণ, চেষ্টা বা সাধ্যের সীমা তার থেকেই দেখা দেয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলে-মিশে থাকবার রীতি-নীতি জানাই যথেষ্ট নয়,—তার সঙ্গে সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যসংগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বোধও আমাদের কিছুটা অর্জন করা উচিত।

খাওয়া-পরার প্রশ্নটাকে এড়ানো যায় না। এ সকলেরই পিছনে আছে সাধারণ সেই বড়ো সমস্যা,—জীবিকা বা আয়বৃদ্ধির প্রশ্নটি। খেতেপরতে ও ভালভাবে থাকতে-চলতে হলে আয় দরকার। খেতে-পরতে পেলে দেহে জীবনীশক্তির যে স্বাভাবিক জোগান অব্যাহত থাকে, তার থেকে সহসা কোনো অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া আদৌ ঘাঁটি দখলের সুযোগ পায় না। কিন্তু এ সব তো দূরের কথা। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবার মতো। অত কে দেখবে। সুতরাং যেটুকু এখনই না করলে নয়, করাও সম্ভব, মাত্র সেই ক'টি দিক নিয়েই কিছু বলা যাক্।

রুজি-রোজগারের ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর রাষ্ট্র-আন্দোলন যতদিন সফল না হয়, ততদিনও তো আমাদের বাঁচতে হবে। সুতরাং ততদিন যার যেটুকু সম্বল

থাকে, ওরি মধ্যেই হিসেব ক'রে চলতে হবে। ঠাসাঠাসি ক'রে থাকতে হবে বহুদিন, কিন্তু তবু ওরি মধ্যে গুছিয়ে থাকা চাই।

এ কথা বলাই বাহুল্য, মহল্লাগুলির ভিতরে বাড়িঘরের সংস্থান-ব্যবস্থা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আরো বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুগঠিত ও সুপরিচালিত না হলে নয়। রাষ্ট্রের দ্বারা যতটুকু হবার হবে, বাঁচতে হলে সে সাহায্যেই একান্ত নির্ভর না ক'রে সংগঠন চাই মহল্লাবাসীদের নিজেদের মধ্যে। বাঁচতে হবে নিজেদেরই। মাত্র দোষারোপ সার করলেই তো আর বাঁচা যাবে না। তবে আবার এও দেখা চাই, যেখানে দোষ দেখানোই দরকার, সেখানে যেন ভয়ে বা শৈথিল্যে বোবা হয়ে না থাকি।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চিকিৎসা, এ দুটি বিষয়েই সর্বজনীন ব্যাপক শিক্ষার দরকার আগে। গ্রামের বস্তি ভেঙে গেছে। শহরগুলো প্রায়ই পুরোনো। শহরে-শহরে লোকের ভিড়। নূতন বসতি বাড়ছে, লোকের স্থানসংকুলান হচ্ছে না। বস্তিবাসীদের এক তো বাস্তুহারার দশা, তারপরে জীবিকার ধান্দাতেই তারা ব্যস্ত। নোংরামি তাদের চারদিকে। শেয়ালে টেনে নিয়ে যায় শিশুদের,—ব্যারামে তো টানবেই। সমাজে ডাক্তারদের কাজ ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে। সতর্কতা চাই,—বেশী চাহিদায় ভেজাল না বাড়ে।

দারিদ্র্য এবং অশিক্ষার দরুণ অনেকে ভাগ্যকেই নির্ভর করে, ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাটাকে এখনো এড়িয়ে থাকে। টুন্‌কোটান্‌কো ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি নিয়েই তাদের চলতে হয়। স্বাস্থ্যের এ-একটি বিশেষ সমস্যা। ঘরে-ঘরে এখনো দেখা যাবে জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার দেহে তাগাতাবিজের বোঝা। জলপড়া, ব্রত মানৎ-এর আর কামাই নেই। যদি দেবতা ফিরে চায়। ফলে মৃত্যুর হার অব্যাহত।

চিকিৎসাক্ষেত্রে সব মৃত্যুকে বিজ্ঞান ঠেকাতে পারেনি। কিন্তু তার প্রদর্শিত পদ্ধতির চেষ্টাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। অন্তত শিক্ষিত-সমাজের এই রীতি। এ জন্যই হাতুড়ের হাত থেকে আমরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে চিকিৎসার জন্য নির্ভর করি। ডাক্তার দেখিয়ে মারা গেলেও অনুতাপ করিনে। ডাক্তার দেখানোর মধ্যে আমরা মানুষের স্বাধীন বুদ্ধি ও চেষ্টাকেই শ্রদ্ধাসহকারে মেনে নিয়ে থাকি, দৈবকে নয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বাণী মনে পড়ে—

"প্রবলশক্তি মাত্রকেই অনিবার্য দৈবশক্তি জ্ঞান করিয়া বিনা বিরোধে তাহার পদতলে আত্মসমর্পণ করি। য়ুরোপে গুটিপোকার মড়ক হইলে, দ্রাক্ষা কীটগ্রস্ত

হইলে তাহারও প্রতিবিধানের চেষ্টা হয়, আমাদের দেশে ওলাউঠা এবং বসন্তকে আমরা পূজা করিয়া মরি। স্বাধীন বুদ্ধির চোখ বাঁধিয়া, তুলা দিয়া তাহার নাসাকর্ণ রোধ করিয়া আমরাও সম্প্রতি এইরূপ পরম আধ্যাত্মিক অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। অন্তরে যখন এইরূপ পরিপূর্ণ অধীনতা বাহিরে তখন স্বাধীনতা কিছুতেই তিষ্টিতে পারে না।"

এসবেরই পরিত্রাণ আছে এক শিক্ষায়। শিক্ষাপ্রচারই আসল প্রতিকার,—রবীন্দ্রনাথের বাণীর মধ্যে মেলে এই নির্দেশ। কিন্তু এই সকল ভালোরই বিকৃতির দিকও একটা আছে। শিক্ষা ভালো। কিন্তু শিক্ষা আয়ত্ত ক'রেই আবার একদল লোক সাধারণের অহিত ক'রে ফিরছে। এর প্রতিকারও রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন,—কয়েকজনকে শুধু নয়, সর্বসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা চাই। সকলে মোটামুটি সব জানলে কে কাকে ভাঁওতা দেবে? অন্তত তাহলে ভাঁওতাটা এত বেপরোয়াভাবে চলবে না।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন কিছুকাল আগে 'দেশ' (১৬ কার্তিক ১৩৫৮) পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'শিক্ষা সমস্যা' নামে। তাতে তিনি আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটি নির্দেশ ক'রে গঠনমূলক নানা প্রস্তাব করেছেন। ক্রমবিস্তার প্রণালীতে নিকটের বাস্তব রাজ্য থেকে শিক্ষা শুরু হওয়া উচিত—এই তাঁর মত। এজন্য তিনিও বিজ্ঞানকে শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যক বিষয় ধ'রে নিয়েছেন। নিকটতম বাস্তব হচ্ছে আমাদের দেহ ও গৃহপরিবেশ। অধ্যাপক সেন মহাশয়ের আলোচনাক্ষেত্রে দেখতে পাই এ দুটি বিষয়ের সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানই প্রথম গুরুত্ব লাভ করেছে। কথাগুলি সর্বসাধারণের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিশেষত তাঁর প্রবন্ধের একটি স্থল আমাদের এই বর্তমান আলোচনাক্ষেত্রে আরো বিশেষ উপযোগী। তিনি লিখেছেন: "আমাদের ইস্কুলের পাঠক্রমে বেচু-আনাল্যাণ্ড সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানবার ব্যবস্থা আছে, আমাদের প্রত্যেকের দেহস্থিত প্যান্‌ক্রিয়েটিক্ গ্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে কোন কথাই জানবার দরকার হয় না; গালফ্‌স্ট্রীম কোন্‌দিক দিয়ে কোথায় যায় এবং তার ফলাফল জানা অত্যাবশ্যক ব'লে গণ্য হয় কিন্তু আমাদের দেহের রক্তধারা কিভাবে সর্বত্র সঞ্চালিত হয়ে জীবনক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে তা জানা আবশ্যিক ব'লে স্বীকৃত নয়। ভূগোল বিদ্যার প্রয়োজন নেই এ কথা কেউ বলবে না, কিন্তু প্রাথমিক দেহবিদ্যার প্রয়োজন যে তার চেয়ে কম নয় একথাও স্বীকার করা চাই। ভূগোলের মোটামুটি জ্ঞান না থাকলে শিক্ষার ভিত্তিই গঠিত হয় না, প্রাথমিক দেহবিদ্যার অভাবে

ঠিক মতো অর্থাৎ শিক্ষিত লোকের মতো জীবন ধারণই অসম্ভব হয়। আমাদের কোটি কোটি লোকের জীবনযাত্রা প্রণালী ও দেশব্যাপী অজস্র রোগের প্রকোপের কথা ভাবলে কি মনে হয় না যে, শুধু প্রাণী হিসাবে আমাদের মাত্র বেঁচে থাকার মূলেও অশিক্ষা অহরহ কি মারাত্মক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে! আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজেরও প্রাত্যহিক দেহযাত্রানির্বাহের মধ্যে কত অজ্ঞতা ও কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তা উপলব্ধি করবার মত শিক্ষাও এদেশে নেই। দেশব্যাপী অস্বাস্থ্য ও মহামারী নিবারণের জন্য গবেষণাগার ও ভেষজসত্র নির্মাণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় ক'রেও কোন ফল হবে না, যদি বিদ্যালয়ের নিম্নতম স্তর থেকে শিক্ষার যোগে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা না হয়, কেন না, যে দুর্বলতার সুযোগে রোগ আমাদের প্রাণমূলে আক্রমণ চালাচ্ছে সে দুর্বলতা ততটা দেহগত নয় যতটা মনোগত; সে দুর্বলতা আমাদের অজ্ঞতা, আমাদের অশিক্ষা। পশ্চিমের কাছ থেকে আমাদের আর কিছু শিক্ষণীয় না থাকলেও একটি তত্ত্ব শিখতেও হবে, নতুবা মৃত্যু অনিবার্য। সে তত্ত্বটি এই: Knowledge is power, জ্ঞানই শক্তি। রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত ক'রে একটি দৃষ্টান্ত দেই।

"যে দেশে বসন্তরোগের কারণটা লোকে বুদ্ধির দ্বারা জেনেছে এবং সে কারণটি দ্বারা নিবারণ করেছে সে দেশে বসন্ত মারীরূপ ত্যাগ ক'রে দৌড় মেরেছে। আর যে দেশের মানুষ মা শীতলাকে বসন্তের কারণ ব'লে চোখ বুজে ঠিক ক'রে ব'সে থাকে, সে দেশে মা শীতলাও থেকে যান, বসন্তও যাবার নাম করে না।"—(সমাধান, কালান্তর)

বস্তুত দেশ থেকে অস্বাস্থ্য ও রোগের প্রকোপ দূর করবার সংগ্রামে দুর্গ স্থাপন করতে হবে বিদ্যাগৃহে—ডাক্তারখানায় নয়; সে সংগ্রামের অগ্রগামী সেনা হবেন শিক্ষকেরা, চিকিৎসক থাকবেন তাঁদের পিছনে।"

দৈবসংস্কার

সুসংস্কার বা রীতিনীতির উপর নির্ভর করেই জাতীয় সংস্কৃতি-সৌধ গ'ড়ে ওঠে। বাইরের দিকে তার আচার-অনুষ্ঠান মেলা উৎসবাদির শোভা, আর ভিতরের দিকে বিচার, বিশ্বাস, চিন্তাপ্রণালী ও চলাফেরার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে চরিত্র ঐশ্বর্যের দীপ্তি। জাতীয় সভ্যতার মান নির্ধারিত হয় দুইদিকের পরিচয়েই। প্রত্যেক জাতিই তার সংস্কৃতির উৎকর্ষসাধনে আজ বিশেষ তৎপর হয়ে উঠছে। ঢাল-তরোয়ালের লড়ালড়ি ছেড়ে সংস্কৃতির থালা সাজানোর দিকেই এখন সাড়া জেগেছে বেশি ক'রে।

সংস্কৃতিবান তাকেই বলি, যার শুধু একদিকে নয়, দশদিকেই চোখকান খোলা; জানা শোনা আছে, শিক্ষা আছে, তার সঙ্গে আছে সহবৎও; যার মধ্যে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলবার মতো জ্ঞান, রুচি, অভ্যাস ও সহৃদয়তার অভাব নেই, বিদগ্ধ বা ভদ্র পদবাচ্য হতে পারেন মাত্র তিনিই। অনুভূতির যে স্বচ্ছতা, চিন্তার যে গভীরতা, রুচির যে রম্যতা ও চরিত্রের যে দৃঢ়তা থাকলে সংস্কৃতি বা বৈদগ্ধ্য উপ্ত হয়, কেবল বিদ্যায় বা কর্মে তা লাভ করা যায় না, তার অধিকার লাভের জন্যে প্রতিদিনের ভদ্র আচরণেরও যোগ আবশ্যক হয়।

বাঁচতে হলে দেহের স্বাস্থ্য প্রয়োজন, আর বাঁচার মতো বেঁচে থাকতে চাই মনের স্বাস্থ্য। মনের স্বাস্থ্যের নামই সংস্কৃতি; বিকৃত অসুস্থ মনোভাব অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছু নয়। ব্যক্তির পক্ষে, জাতির পক্ষে এবং রাষ্ট্রের উন্নতির পক্ষে সংস্কৃতি অপরিহার্য। শিক্ষা দিয়ে তাকে আয়ত্ত ক'রে সাধনা দিয়ে রক্ষা করা চাই। কিন্তু কুসংস্কার সংক্রামক ব্যাধির মতো। তার উৎপত্তির মূলে কাজ করে অহেতুক ভয় ও বিচারহীন বিশ্বাস। শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে চাপা দিয়ে অনায়াসে সে প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। তাকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা অর্জন মার্জিত ও সুদৃঢ় বুদ্ধি না হলে আশাই করা যায় না। বহুদর্শী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এ বিষয়ে স্বচ্ছ ছিল। তিনি জানতেন, অধীত বিদ্যা এবং কৃত অনুষ্ঠানাদি সকল কিছুকেই সার্থক করে তোলে মার্জিত বুদ্ধিরূপ পরশমণির ছোঁওয়া। লোকের সেই বুদ্ধিস্থানেই শনির দৃষ্টি বহুদিন যাবৎ বিদ্যমান। সে ছিদ্র বন্ধ করবার উদ্বেল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি তাঁর 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণের' ভাষণের মধ্যে সেদিন (সমাবর্তন উৎসব,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪৩) সজোরে বলেছিলেন,—চাই কুসংস্কার বর্জিত সবল মুক্ত মনের গঠন। মহতী ছাত্রসমাজকে আহ্বান ক'রে সেখানে, কেবল বিদ্যা-চর্চাকেই সার করতে বলেন নি,—মুখ্য দাবি জানিয়েছেন এই বলে যে, অনশন ও দুঃখদারিদ্রের সহচর নারী সমস্ত জাতির জীবনীশক্তিকে ক্ষয় ক'রে চলেছে, তার প্রতিকারের কথা ভাবতে হবে আমাদের নিজেদেরকে—অশিক্ষিত কল্পনার দ্বারা নয়, ভাববিহ্বল দৃষ্টির বাষ্পাকুলতা দিয়ে নয়। বলেছেন,—

"অবাস্তবের মোহাবেশ কাটিয়ে পুরুষের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে দেশের সমস্ত অসম্পূর্ণতা মূঢ়তা কদর্যতা সব-কিছুকে অত্যুক্তি-বর্জিত ক'রে জেনে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করো। ...সত্যকার কাজ আরম্ভ করার মুখে এ কথা মানাই চাই যে, আমাদের স্বভাবে, আমাদের অভ্যাসে, আমাদের বুদ্ধি-বিকারে গভীরভাবে নিহিত হয়ে আছে আমাদের সর্বনাশ।"

এই সর্বনাশ রাহুর মতো বুদ্ধিকে গ্রাস ক'রে জাতির জীবনে অপঘাত ঘটিয়েছে বারেবারে। আজও কি তার মার শেষ হয়েছে ? ভূতের ভয়, তুকতাক, ছুৎমার্গ এ সব তো আছেই, সকলের উপরে আছে দৈবের অধীনতা। পুরুষানুক্রমে সংস্কাররূপে প্রবেশ করেছে তা জাতীর মজ্জায় মজ্জায়।

অসংখ্য ঘটনা ঘটে, যেগুলি সর্বনাশ আনে অনেকের, কিন্তু অনেকেই তার প্রতিকার না চেয়ে চলি দৈবের অধীনতা মেনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' নামক রচনায় বলেছেন, " 'আমি সব পারি, সব পারব' এই আত্মবিশ্বাসের বাণী আমাদের শরীর মন যেন তৎপরতার সঙ্গে বলতে পারে। 'আমি সব জানি' এই কথা বলবার জন্তে আমাদের ইন্দ্রিয় মন উৎসুক হয় তো হোক, কিন্তু তার পরেও চরমের কথা—'আমি সব পারি।' আজ এই বাণী সমস্ত য়ুরোপের। সে বলে 'আমি সব পারি, সব পারব।' তার আপন ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করার অন্ত নেই। এই শ্রদ্ধার দ্বারা সে নির্ভীক হয়েছে, জলে স্থলে আকাশে সে জয়ী হয়েছে। আমরা দৈবের দিকে তাকিয়ে আছি। সেই জন্যে বহু শতাব্দী ধ'রে আমরা দৈব কর্তৃক প্রবঞ্চিত।"

মধ্যযুগে লক্ষণসেন কবে খিড়কির দুয়োর দিয়ে রাজ্য ছেড়ে পালালেন,—ইতিহাসের সে-তারিখটা আমরা ভালো ক'রেই জানি। কিন্তু জ্যোতিষীর পাজি পুঁথিতে ভর করেছে দৈববিশ্বাস, সমস্ত জাতটাকেই সে ধাতছাড়া করে চলেছে; সে যে কতকাল থেকে, তার হিসাব কে রাখে! এই দুর্দৈব থেকে আজকের দিনেও সংস্কৃতির ঢক্কানিনাদী প্রতিষ্ঠাবান কাগজগুলি কিংবা মহাঅধিকরণের

মহাঅধিকারীর দল,—কারোরই কি আর ধাতস্থ থাকার উপায় রইল! আশা রাখা যায় কোথায়?

লক্ষণ সেনের সম-সাময়িক সমাজের চিত্র মিলে ডাঃ সুকুমার সেন লিখিত "মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী" নামক পুস্তকখানিতে: "সর্ব্বোপরি, আধিভৌতিক বাহুবল অপেক্ষা অধিদৈবিক মন্ত্রবলের উপর ক্রমবর্ধমান আস্থা জনগণমানসে জড়-তার মোহবিস্তার করেছিল।…এ কথা অস্বীকার করলে ইতিহাসকে অবজ্ঞা করা হবে যে সেকালে মন্ত্র-তন্ত্র স্বস্ত্যয়নের মাহাত্ম্য রণশৌর্যের প্রাধান্যের চেয়ে কম ছিল না।…তাই অসম অথবা বিষম বিগ্রহে গ্রহানুকূল্য ও মন্ত্র শক্তির উপর ভরসা রেখে ক্ষাত্রবাহুবল ছিল নির্ভরপ্রসুপ্ত। তুকতাকের উপর বিশ্বাস সে কালে রাজশক্তিরও যে কতটা দৃঢ় ছিল তার একটু নিদর্শন দিচ্ছি সেকালের একটি তথাকথিত রণনীতির বই থেকে। শত্রু সৈন্য যদি চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ায় তখন কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে বইটিতে অনেক রমক বিধান আছে। তার মধ্যে একটি বলছি। শ্মশানের ছাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল ও মূলের সঙ্গে বেটে তূর্যের গায়ে ভালো করে মাখিয়ে এই মন্ত্র পড়ে বাজাতে হবে,—

ওং অং হং হলিয়া হে মহেলি বিহঞ্চহি সাহিনেহি
মশানেহি থাহি লুঞ্চ্হি কিলি কিলি কালিহং ফট্ স্বাহা।

আর শ্বেত অপরাজিতার মূল ধুতুরা-পাতার রসে বেটে নিজের কপালে তিলক এঁকে সর্বজ্ঞোদয় মন্ত্র জপ করতে হবে। তা হ'লে সেই তূর্যর শব্দ শুনে "ভবতি পরচক্রভঙ্গঃ স্বসৈন্যবিজয়ঃ"।"

পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, জাতির ইতিহাস থাকবে কী? ইতিহাস তো মানুষের কাজকারবার নিয়ে। আমাদের জাতি যে দৈবের হাতের পুতুল! —দৈবই তাকে চালায়। আমাদের ইতিহাসই হচ্ছে দেবতার কীর্তিকাহিনী। এতে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের পুঁজির জন্যে কী পাবে? রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাতায়নিকের পত্রে' এরূপ কথাই বলেছেন; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাণীও এ প্রসঙ্গে স্মরিতব্য। সংসারে দেবতার অভাব নেই, শয়তানও আছে অনেকেই,—দুইয়ের মাঝামাঝি খাঁটি একটি মানুষ মেলাই ভার। তাকে চেনা এবং তার নেতৃত্ব মানা আরো কঠিন। অলৌকিক একটা কিছুর পায়ে মাথা না বিকিয়ে আমাদের অধিকাংশেরই সোয়াস্তি মিলে না। যে-দৈবের চিন্তা মানুষের সাধ্য-সম্বন্ধে মানুষকে উদাসীন ক'রে রাখে, কিন্তু সাধ্যের অতিরিক্তকে অযত্নে আরামে বিনা সাধনায় অমনি অধিকার করতে উৎসাহী ক'রে তোলে, ক্ষতি বা লাভ সকলটাতেই

হতবুদ্ধি হতচেষ্টা ক'রে ফেলে, যার বিহ্বলতা সংসারে আজগুবির এবং বুজরুকির প্রশ্রয় বাড়ায়, এককথায় মানুষকে যা বিষয়-বস্তুর সঙ্গে বোঝাপড়ায় বিমুখ ক'রে দীনতা হীনতা আলস্য ও মূঢ়তার দুর্গতিতে নিয়ে যায়,—মনুষ্যত্বের লাঘবকর সে দৈবের অধীনতাই আমাদের ধিক্কারের বিষয়।

দৈব যে সত্যি-সত্যিই দৈব নয়, সে যে আকস্মিক ঘটনা মাত্র এবং মানুষের চেষ্টাতেই যে তার প্রতিকার রয়েছে নিহিত, এ কথা এখনো অনেক সময়েই আমরা ভুলে যাই। অলৌকিক কিছুর পায়ে মাথা না বিকিয়ে আমাদের অধিকাংশেরই কি স্বস্তি মিলে? শিক্ষার ফলে আজ হয় তো সংস্কারের মোহটা কিছু পরিমাণে কেটেছে, কিন্তু বুদ্ধি পরিচ্ছন্ন হয় নি। তাই শিক্ষিত হয়েও মনের দুর্বলতা দূর করতে পারি নে। ভয়ে ভাবনায় হৃদয়াবেগের চাঞ্চল্যে মুহূর্তে মুহূর্তে কুসংস্কারের কাছে নতি স্বীকার করে ফেলি।

বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতের পরিবার,—সমাজের শিরোমণি তাঁরা। বাড়িতে তাঁদের মেয়ের বিয়ে। আড়ম্বরের অন্ত নেই। মনোমত পাত্র স্থির হলে পরে জ্যোতিষীর ডাক পড়ল। জ্যোতিষী বললেন—সম্বন্ধটি খুবই ভালো সন্দেহ নেই,—কিন্তু দেখা যাচ্ছে পিতা বেঁচে থাকতে এক্ষেত্রে বিবাহিতা কন্যা তাঁর সুখী হবেন না। কন্যার পিতা কথাটা শুনলেন, কিছু বললেন না। কন্যাদান সমাধা করে সকলের অলক্ষিতে চলে গেলেন অন্যত্র। অনতিবিলম্বে তাঁর আত্মহত্যার খবর রাষ্ট্র হয়ে পড়ল।

এমনতরো অপঘাত নানারূপে আমাদের মধ্যে দেখা দিয়ে জাতিকে ভিতরে ভিতরে মেরুদণ্ডহীন করে রেখেছে।

বিলেত ফেরৎ মস্ত ইঞ্জিনিয়র, অর্থের অভাব নেই। পাঁচ ছ'টি সন্তান হয়েছে। একটির ভাগ্য গণনা করে জ্যোতিষী বললে, এর অকাল-মৃত্যু ঘটবে। পিতা-মাতা শঙ্কায় আকুল হয়ে উঠলেন। আদরে-আবদারে ছেলেকে মাথায় তোলা হল, শাসন-বারণ গেল ঘুচে। ছেলে দুর্দান্ত দুর্মতিপরায়ণ হয়ে উঠল দিনে দিনে। তার অত্যাচারে টেঁকা দায়। কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই। ধনীর দুলাল,—প্রতিক্ষণে তার মৃত্যু-শঙ্কায় পিতামাতা উৎকুণ্ঠিত। ছেলেটি একে একে শৈশব কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে পদার্পণ করল। না শিখল লেখাপড়া, না শিখল শীলাচার; উচ্ছৃঙ্খল দুর্বিনীত হয়েই সে লোকের যত অভিশাপ কুড়োতে লাগল। জীবনভোর তার জীয়োনো রইল এই জ্ঞানকৃত ফাঁড়া। একদিন কোনো কুকীর্তিতে ক্ষুব্ধ হয়ে যদি পিতামাতার মনেই এ সন্তানের অকালমৃত্যু কামনা জেগে ওঠে, সেদিন পুত্র

দায়ী করবে কাকে?—দৈবকে, না তার সাক্ষাৎ দুর্দৈবস্বরূপ পরম স্নেহাতুর এই পিতামাতাকেই? শিক্ষাপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক পিতা পুত্রের মায়াতে একান্ত বিমূঢ় না হয়ে অন্য পথ গ্রহণ করতে পারতেন। তাঁর প্রকৃত কর্তব্য ছিল,—ছেলে যতক্ষণ বাঁচে ততক্ষণ তার হিতচিন্তায় তাকে ভালো পথে চালনা করা, তার শিক্ষা ও শাসনের দিকে যত্নবান হওয়া। এই হোতো মানুষের ধর্ম, পুরুষোচিত কর্ম। দুর্দৈবকে নিতান্তই এড়ানো না গেলে সে স্থলে শোকে একটু সান্ত্বনাও তো মিলত! অকাল-মৃত্যু যদি আদৌ না-ই ঘটে, তবে তো ছেলেকে এরূপ অমানুষ হয়েই বেঁচে থাকতে হবে।

দৈববিশ্বাস ছোটো-বড়ো উত্তম-অধম কাউকে ছাড়ে না। অশিক্ষিতেরা না হয় বিচার-বিবেচনাশক্তি প্রয়োগ করতে পারে না, দৈবের হাতের লাঞ্ছনা সহ্য করে তারা না জেনে না বুঝে। কিন্তু শিক্ষিতগণ যখন দৈবের পায়ে মাথা নত করেন।—সেই উদাহরণগুলি শিক্ষার মূল্যহীনতাই প্রমাণ করে; জাতির জীবনে কুসংস্কারের ঘুণ লাগা জীর্ণতাকে তাতে প্রকট করে তোলে।

যত শিক্ষাই আমরা আয়ত্ত করি অধিকাংশক্ষেত্রে বাক্যে এবং মগজেই তা ঠাসা থাকে। তাকে কার্যকরী করবার পক্ষে একান্ত বাধা সৃষ্টি করে সংস্কারে। এ জন্যই শিক্ষা বা সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সংস্কারের আলোচনাটা অপরিহার্য।

দেশে শিক্ষা নেই এমন কথা বলা যায় না, তবে তার কতটা সুশিক্ষা সেটা নিয়েই ওঠে প্রশ্ন। দু'একস্থলে এর মধ্যেও সুশিক্ষিতের সূক্ষ্ম বিচারশীল মনের উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠাবান একজন অধ্যাপক। তিনি যখন স্কুলে পড়েন তাঁদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ এক জ্যোতিষী তাঁর ঠিকুজী দেখলেন। অধ্যাপক নিজেও এই জ্যোতিষীকে যথেষ্ঠ শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। জ্যোতিষী সযত্নে তাঁর হাত দেখে কোষ্ঠি ঘেঁটে ভালোমন্দ অনেক কিছুই বললেন। কেবল বিদ্যাস্থানের সম্বন্ধে কোনো উক্তি করলেন না। অধ্যাপকের পিতা কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর মত স্পষ্টরূপেই জানতে চাইলেন। জ্যোতিষী তখন গম্ভীর হলেন; বারবার অনুরুদ্ধ হয়ে অবশেষে বললেন—ছেলেটির বিদ্যাস্থানে আছে শনি,—ওটা ওর হবার নয়। পড়া ছাড়িয়ে ছেলেকে অন্য পন্থা ধরোনোই শ্রেয়। সকলে দুঃখিত হলেন। মধ্যবিত্তের ঘর; পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁর উপরেই সকলের যত আশা-ভরসা। কী আর করা যায়। দৈবের লিখন। কিন্তু দৈবের উপরেও বুদ্ধির খেলা খেললেন এবার অধ্যাপকটি নিজে। দৈবকে অস্বীকার করবার মত মনোবল তাঁর প্রথমাবধি ছিল। বাড়ি থেকে পড়াশুনার পথ যখন বন্ধ হবার উপক্রম হল, তিনি জেদ ধরলেন,

পড়বেনই। বললেন, দেখে নিয়ো তোমরা, দৈবের লিখনকে আমি খণ্ডাবই, ভুল প্রমাণ করে ছাড়ব এই ভবিষ্যদ্বাণীকে। কেউ ফেরাতে পারলে না তাঁকে বিদ্যাচর্চ্চা থেকে। দীর্ঘকাল আর সেই জ্যোতিষীর কাছে ঘেঁষলেন না তিনি। কেবল যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পরীক্ষাগুলি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হলেন এবং এম-এ পরীক্ষায় ইতিহাসে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়ে বের হলেন,—সেদিন গিয়ে প্রণাম ক'রে এলেন নীরবে সেই জ্যোতিষীকে। কিছু আর বলবার দরকার হল না।

তবে এমন ঘটনা ঘটে কচিৎ। সাধারণত আমরা দৈব বিশ্বাসের যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে বলি পড়তেই উৎসুক থাকি; বুদ্ধিবিচারকে মনে সহজে স্থান দিই না। দৈববাণী তো দূরের কথা, মানুষের মুখের সহজ কথাকেও মানুষ দৈব-বিশ্বাসে দাঁড় না করিয়ে ছাড়ে না। সে যে কী মর্মান্তিক পরিহাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তারও উদাহরণ বিরল নয়। ডাক্তার,—কলেজ থেকে সদ্য বেরিয়েছেন, সবে শুরু করেছেন ডাক্তারি। প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক হাঁপানী রোগগ্রস্ত। একদিন তিনি বুক দেখাতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন ডাক্তারের কাছে। পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার বললেন, হার্টটা দুর্বল মনে হচ্ছে, ছুটোছুটি একটু কম করবেন। প্রতিবেশী ভদ্রলোক শুধোলেন—হার্টফেল হবে না তো। ডাক্তার সহজ ভাবে বললেন—ভয়ের কিছু নেই, তবে সাবধান থাকাই তো ভালো।

ভদ্রলোক আলাপ-আলোচনা সেরে বাড়ি ফিরলেন, দিব্যি ভালোমানুষ। বাড়ি গিয়েই নিলেন শয্যা। ভয়ে ভাবনায় তাঁর হার্টের বিট্ গেল বেড়ে, গুরুতর অবস্থা। ডাক্তারের ডাক পড়ল। তিনি তো অবাক! এই সময়টুকুর মধ্যে হার্ট একরম বিকল হল কেমন করে। কেন, ডাক্তার যে বলেছেন হার্টের অবস্থা সুবিধার নয়! শুনে ডাক্তার বেকুব। রোগী ভদ্রলোক পরদিন সকালেই মারা গেলেন। এঁরা না মরে সোয়াস্তি পান না।

প্রৌঢ়তার মাঝামাঝিতে পৌঁছে এক ব্যক্তি জানতে পেলেন, ঠিকুজিতে তাঁর লেখা তিনি হার্টফেল করবেন—এবং মারা যাবেন অমুক তারিখের অমুক সময়ে। মোটা বেতনের চাকুরে। সেই জানা থেকে, লাইফ ইন্‌সিওর, পেনসন, বিষয়সম্পত্তি,—সব কিছুর ব্যবস্থা একে একে চোকালেন। দিনক্ষণ স্থির ক'রে ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন সবাইকে একদিন খবর দিয়ে আনালেন। মস্ত ভোজ দিলেন। তখনো কাউকে কিছু বলছেন না। সবাই ভাবছে ব্যাপার কী। দিনের শেষে বসালেন সকলকে সামনে। অতঃপর ব্যক্ত করলেন তাঁর নিগূঢ় অভিপ্রায়।

সবাই তো শুনে অবাক,—সেদিনই রাত্রে নাকি তাঁর মৃত্যু অবধারিত। সকলে

ঠাট্টা শুরু করল। তিনি অবিচলিত তাঁর বিশ্বাসে। যাই হোক, রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শুয়েছেন, তখন অবধি দেখছেন, কিছু ঘটছে না। উদ্বেগের অন্ত নেই। এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন ঘুমিয়ে গেলেন। এক ঘুমের পর। রাত তখন একটা। দেয়ালে ঘড়িটা বেজে উঠতেই হঠাৎ ধড়মড় করে সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উঠে বসলেন, আর অমনি সোরগোল বাধালেন—"ডাকাত! ডাকাত!" সবাই ঘুম ভেঙে চারপাশে এসে জড়ো হল। কোথাও কিছু নেই,—তবে কী হল? কর্তা বলেই চলেছেন; বুকে যেন তার কী চেপে রয়েছে; গলা ভার। চাপা গলায় কেবলি চেঁচাচ্ছেন, "বাইরে,—ঐ তো। হৈ-হৈ রৈ-রৈ। শুনছে না কেন কেউ। ঐ যে ডাকাত আসছে! এসে পড়ল যে!"– সারারাত ঐ করেই কাটালেন। ডাক্তার এসে বললেন,– রোগ তো কিছুই নেই; তবে দীর্ঘকাল ধ'রে মনের ভিতরে পোষা ছিল কোনো-এক আকস্মিক ভয়। তাতেই ঘটেছে এই মনোবিকার।

তখন সকলের মনে পড়ল, ভদ্রলোক বলেছিলেন বটে, ঠিকুজিতে লেখা আছে —আজ তাঁর মৃত্যুদিন। তিনি যে এই মুহূর্তের জন্য মুহূর্তের-মুহূর্তে তৈরী হয়ে আসছিলেন সকলে তাই বলাবলি করতে লাগল। পরদিনই তাঁর হার্টফেল হল।

শুধু যে তিনিই প্রাণ হারালেন তাই নয়, এই ঘটনা চাক্ষুষ দেখে অনেকেরই এ থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে দৈব-বশ্যতায় প্রাণ হারাবার পথ পরিষ্কার হয়ে রইল! কারণ "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" এ নিয়ে দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই।

চিরজীবী রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এ সব দেখেশুনেই কি কবির এক সময় মনে জেগেছিল—"দুবেলা মরার আগে" না-মরার সঙ্কল্প?

এমনি মরার দেশে আমরা জানি "ললাটে লিখন দুঃখ খণ্ডনে না জাএ।" —(ধর্মমঙ্গল – রূপরাম)। আর মরতে মরতে যারা মাথা তুলে দাঁড়ায় তাদের কথা স্বতন্ত্র। সত্তর বছরের বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বিপন্ন জাতিকে মহাযুদ্ধে জয়ী করবার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে সফল হলেন। অতঃপর যদিও কুপোকাৎ হলেন নির্বাচনের ঘরোয়া-যুদ্ধে, তবু তাঁকে আঁটে কে। সদলে ধৈর্য ধ'রে রইলেন,—দশটি বছর ধরে জমি তৈরি করলেন। একদিন ফের স্বদেশের প্রতিপক্ষকে হারিয়ে শাসন-ঘাঁটি করলেন দখল। তারপরে দেখতে লাগলেন বিশ্বনেতৃত্বের স্বপ্ন। গদী পেয়েই পারস্য মিশর কোরিয়া ও মালয় সমস্যার কাঁটার মুকুট প'রে তিনি মাঘমাসে দুরন্ত শীতের মধ্যে পাড়ি জমালেন ওয়াশিংটনের উদ্দেশে। মনে মনে নিশ্চিত ধরেই নিয়েছিলেন বাঘেও তাঁকে ছোবে না, কুমিরও পালাবে পাতালে। কিন্তু যাত্রার ক্ষণটিতে অভাবিতরূপে জাহাজ 'কুইন মেরি' বসল বেঁকে। ধর্মঘট করলে

নাবিকেরা। যদি বা সে ঝঞ্ঝাট মিটল, জাহাজের নোঙর ওঠে না। তবু বৃদ্ধ অবিচলিত, নির্বিকার। এরই একটু আগে ঘটেছিল আরেক বাধা—দরকারী ফাইল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাড়াতাড়ি ফাইল বগলে দৌড়ে এলেন সেক্রেটারি। জেটিতে ধেয়ে আসতে আসতে বিনা নোটিশে তাঁর হৃদ্‌পিণ্ডের কাজ গেল বন্ধ হয়ে। জাঁদরেল মন্ত্রীর ডান হাত যেন খসে গেল। বৃদ্ধের কুছ-পরোয়া নেই। তখখুনি নতুন অনুচর নিযুক্ত হল, নোঙর তোলা হল, নতুন উদ্যমে চার্চিল চললেন গন্তব্যের মুখে জাতির কল্যাণ সাধনে (বিশ্বকল্যাণসাধনে!)। হাজার রকম বাধা এল, কিন্তু বৃদ্ধকে তাঁর সঙ্কল্প-সিদ্ধির নির্ধারিত পথ থেকে এতটুকু দমাতে পারলনা। এই জাত যদি এতদিন যাবত দেবতার বর পেয়ে থাকে তাতে আমাদের চোখ টাটালে চলবে কেন?

রবীন্দ্রনাথ ব'লে গেছেন, "আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, দেবতা তাদের সহায়তা করেন না। আত্মঘাত এবং আত্মগ্লানি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সমস্ত চেষ্টাকে যদি উদ্যত না করি, অদ্যকার বহু দুঃখ বহু অবমাননার শিক্ষা যদি ব্যর্থ হয় তবে মানুষের কাছ থেকে ঘৃণা ও দেবতার কাছ থেকে অভিশাপ আমাদের জন্য নিত্যনির্দিষ্ট হয়ে থাকবে যে-পর্যন্ত আমাদের জীর্ণ হাড়-ক'খানা ধুলার মধ্যে মিশিয়ে না যায়।"

বহু আগে থেকেই কবি ব'লে এসেছেন, "আকস্মিক ঘটনা"কে আমরা "দৈব ঘটনা" বলি এবং "বিনা বিরোধে তাহার পদতলে আত্মসমর্পণ করা"র স্বভাব আমাদের পেয়ে বসেছে। কিন্তু সর্বদা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে সংশোধনের পথ। সেই সংশোধনের চেষ্টার মধ্যেই মানুষের মুক্তি নিহিত রয়েছে। সেই মুক্তি আসবে ধর্মে-কর্মে, সর্ববিধ রোগে-শোকে। ব্যাপক একটি আলোচনার ক্ষেত্র থেকে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছেন:

"কোনো প্রবলশক্তি কিছুদিন আমাদের মাথার উপর চাপ দিলেই আমরা ধুলির মতো গুঁড়াইয়া সকলে মিলিয়া একাকার হইয়া যাই; তা সে ব্রহ্মণ্যশক্তিই হউক, আর রাজন্যশক্তিই হউক, শাস্ত্রই হউক আর শস্ত্রই হউক। য়ুরোপীয় প্রকৃতি কিছুদিন এইরূপ উপদ্রব সহ্য করিয়া অবশেষে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। যেখানে যে কারণেই হউক যখনই তাহার মনুষ্যত্বের উপর বন্ধন আঁট হইয়া আসে তখনই সে অধীর হইয়া উঠিয়া তাহা ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে—সে ধর্মের বন্ধনই হউক আর কর্মের বন্ধনই হউক।

য়ুরোপের মনুষ্যত্ব এইরূপ জীবন্ত এবং প্রবল থাকাতেই সহজে কোনো

বিকারের আশঙ্কা হয়না। কোনোরূপ বাড়াবাড়ি ঘটিলেই আপনিই তাহার সংশোধনের চেষ্টা জাগিয়া উঠে। রাজা প্রজার স্বাধীনতায় একান্ত হস্তক্ষেপ করিলে যথাসময়ে রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিয়া উঠে—শাস্ত্র ও পুরোহিত ধর্মের ছদ্মবেশে মানবের স্বাধীন বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত করিবার চেষ্টা করিলে ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হয়। এইরূপে, মানুষ যেখানে স্বাধীন এবং স্বাধীনতা-প্রিয় সেখানে সত্বরই হউক বিলম্বেই হউক, সংশোধনের পথ মুক্ত আছে। সেখানে রোগ আরম্ভ হইলে একেবারে মৃত্যুতে গিয়া শেষ হয় না।"

যখন এ কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তখন আমরা ছিলাম পরাধীন। এখন বাইরে আমরা স্বাধীন বটে, কিন্তু আমাদের মনের দিকের অবস্থা কী? সেদিনকার সামাজিক মনের খবর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমাদের মানসিক রাজ্যে আমরা যন্ত্রের রাজত্বই বহন করিয়া আসিতেছি। কী খাইব, কী করিয়া খাইব, কোথায় বসিব, কাহাকে ছুঁইব, জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে এবং দানধ্যান তপজপ প্রভৃতি ধর্মকার্যে আমরা এমনই বাঁধা নিয়মে চলিয়া আসিয়াছি যে, মন হইতে স্বাধীনভাবে চিন্তাও করিতে পারি না, স্বাধীনভাবে কার্যও করিতে পারি না। আকস্মিক ঘটনাকে দৈব ঘটনা বলিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকি।"

পরাধীনতার যুগ পেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কার্যের নানাক্ষেত্রে এখন কতটা কী আমরা করে উঠতে পারছি, সেটুকু বুঝে নেবার জন্যই পরাধীন এবং স্বাধীন বুদ্ধির লক্ষণগুলি জানা দরকার। জাতীয় চরিত্রে এবং কাজের মধ্যে গোড়ায় গলদ রেখে বাইরে স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে আড়ম্বরে আমরা নিরাপদ হব না কোনোকালেই; বিশ্বে বড়ো জাতি হয়ে ওঠার প্রয়াসও আমাদের বারেবারেই হবে ব্যর্থ। কবির লেখার মধ্যে ছোটো বড়ো স্বাধীন পরাধীন দুই রকম জাতির দুই রকম চরিত্র এবং কাজের বিশ্লেষণ করা রয়েছে দেশ-বিদেশের তুলনা দিয়ে। এর মর্ম-কথাটি হচ্ছে,—দৈবাশ্রয়ী নিশ্চেষ্টতার পথ একান্ত পরিত্যাজ্য। মানুষের যুক্তিসাপেক্ষ বুদ্ধিচালিত চেষ্টার উপরই রাখতে হবে পরম বিশ্বাস। এই বিশ্বাসেই শেষদিন অবধি মনুষ্যত্বের সাধক রবীন্দ্রনাথ মানুষকে জানিয়ে গেছেন অসীম শ্রদ্ধা। তাঁর সেই বিশ্বাসের বাণীতেই পাই,—মানুষই একদিন অ-দৃষ্টকে আনবে দৃষ্টের সীমায়। মনুষ্যত্বের সেই হচ্ছে বড়ো সাধনা।

টাইটানিক জাহাজ ডুবছে। মানুষ গর্ব ক'রেই ঘোষণা করেছিল দৈব-উপেক্ষা। জেনেছিল তার পুরুষকারের মহিমা অজেয়। কিন্তু ঘোষণা টিকল না। ভুল

ভাঙল। বাহ্যত এটাই বড়ো কথা। কিন্তু এই গর্ব-ডুবির মধ্যেও তার মহিমা-ডুবি হয়নি,—ভিতরের সে কথাটা আরো বড়ো। একটি কীর্তিগৌরব তার ভাসমান থেকে গেছে, যা কোনোকালেই ডুববার নয়। সকলেই এ ঘটনাও জানেন, মৃত্যু যখন সুনিশ্চিত তখনো যে-ক'জনকে বাঁচানো সম্ভব তাদের উদ্ধারের সুশৃঙ্খল চেষ্টায় মুহূর্তকালও মানুষ অলস থাকেনি। সে ক্ষেত্রে শিশু নারী ও বৃদ্ধদের আগে 'জীবনতরী'তে ক'রে রক্ষা করা হয়েছে। জাহাজের ক্যাপ্‌টেন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন কর্তব্যরত অবস্থায়। দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যকে চরমরূপে প্রত্যক্ষ দেখেও তিনি বিন্দুমাত্র বিহ্বল হননি, দৃঢ়মুষ্টি শিথিল ক'রে হাল ছেড়ে দিয়ে ভয় হতাশা বা নিশ্চেষ্টতার পায়ে তিনি মাথা বিকোন নি,—চিরকালের মানবজাতির মধ্যে তাঁদের এই ইতিহাস মানুষকে অমরতার পথে যে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা জুগিয়ে চলেছে, তার মধ্যেই সেদিনকার দুর্ঘটনার মৃতেরাও বেঁচে-বর্তে আছেন। এ সঙ্গে পাশাপাশি স্বতঃই মনে পড়ে, ক'বছর আগে কলকাতায় কালীপূজা উপলক্ষে সংঘটিত হালসীবাগানের সেই অগ্নিদাহের মধ্যে বিহ্বল বিশৃঙ্খল ছুটাছুটির ফলে অসহায়ভাবে মৃত্যু-লীলার দুঃসহ মর্মান্তিকতা!

বুদ্ধি ও চেষ্টার স্বাধীন বিকাশের প্রবর্তনার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ক'রেই আমাদের স্মরণীয়। যুগান্তরের নব অধ্যায়ও আশা করি মানুষের শক্তির পূর্ণ স্বাধীনতানিষ্ঠার জয়গানেই হবে মুখরিত। বহুদিন আগে থেকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে। আমাদিগকে সকল দাবিই আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে—হীনতার দ্বারা নহে, কিন্তু মহত্ত্বের দ্বারা, মনুষ্যত্বের দ্বারা। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'—দুর্বল পরমাত্মাকে জানিতে পারে না, দেবতাকে যে চাহে তাহাকে দেবগুণোচিত প্রকৃতিসম্পন্ন হইতে হইবে।"

চিত্তবিমূঢ়তায় অসহায়ভাবে দৈবের পায়ে একদিকে আত্মসমর্পণ, অন্যদিকে বাস্তব বুদ্ধিতে বিজ্ঞানের সাধনায় মানবধারাকে অমরজীবনে জয়যুক্ত করবার জন্য সর্ববিধ বিঘ্নবিপদের প্রতিকার-পথসন্ধান—সংসার ভ'রে এই চলেছে মানুষের দু'রকম সাধনা। বিজ্ঞানীরা দৈবকে জয় করতে গিয়ে কীভাবে মৃত্যুকে গবেষণার উপায় স্বরূপে অবশেষে বরণ করে থাকেন, তার ইতিহাস বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগের আবিষ্ক্রিয়াক্ষেত্রে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ভাববাদীদের মধ্যেও সে-ধারা সমুজ্জ্বল রেখেছেন কতজনাই। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে বা ধর্মের নীতি ও প্রণালীকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে স্বেচ্ছায় আগুনের মুখে আত্মজীবন আহুতি দিয়ে গেছেন,

পাত্র হাতে লয়ে বিষপান করেছেন, অম্লানবদনে ফাঁসি বরণ করেছেন,—শুধু অতীতে নয়, আজও চলেছে তাঁদের এই ধারা অব্যাহত। এমন কি পথেঘাটেও দেখা যায়, কত সাধারণ লোক রাজপথের ম্যান্‌হোলে-নিপতিত রুদ্ধশ্বাস দুর্ভাগা মেথরকে বাঁচাতে বা জলমগ্ন সন্তরণ-অপটু ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে এগিয়ে গিয়ে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করছেন জেনেশুনেই। এ কি দেশের দুর্দৈব, না তাঁদের দুর্দৈব, কিংবা দৈবকে অস্বীকার করতে গিয়েই তাঁরা দেবতা হয়ে যাচ্ছেন মানবসমাজে।

॥ ২ ॥

সৃষ্টির মধ্যে দেবতা হচ্ছে মানুষেরই সাধনার উপলব্ধ একটি উচ্চস্তরের সত্তা-বিশেষ। তা মানুষেরই আবিষ্কৃত এবং মানুষেরই তা উন্নত অংশ—দেহের উপরে প্রতিষ্ঠিত যেমন মস্তিষ্ক। সুতরাং দেবতা সম্বন্ধীয় দৈব প্রকৃত অর্থে আমাদের বিদ্বেষের বিষয় হতেই পারে না, সে ভক্তির বিষয়।

কিন্তু অধিকাংশ সাধারণ লোক আমরা অ-দেখা দৈবক্ষেত্রের সকল তত্ত্ব ঠিকমতো বুঝে ওঠবার মতো শিক্ষায় শিক্ষিত নই—সকলের শিক্ষার স্তর সেই উন্নতসীমায় পৌছলে তখন হয়তো সকলেরই মধ্যে প্রকাশ্যে সেই তত্ত্ব আলোচনার সময় আসতে পারে; কিন্তু শিক্ষিত অশিক্ষিত বিশেষ ও সাধারণ—সমস্ত শ্রেণী নিয়ে সংসারে সচল রয়েছে যে সমষ্টিরূপী জনগণ, যাদের নিয়ে চলেছে সমাজের সব ক্রিয়াকাণ্ড, তাদের সকলের বোঝবার ও করবার উপযোগী একটি সাধারণ স্তর এবং তার উপযোগী সাধারণ কতগুলি কর্তব্যই আমাদের অনুসরণ করা বিধেয়; কারণ, সমাজের কল্যাণের পক্ষে সেটিই শ্রেয় ও 'মহাজনে'র পথ। সেটি হওয়া চাই বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত এবং সহজবোধ্যভাবে সর্বজনের মধ্যে প্রচারিত ও আচরিত। সেই সাধারণ স্তরের সর্বজনীন শিক্ষা-উদ্ভূত ক্রমোন্নত মানই ক্রমে ক্রমে মানুষকে দেবতার আপাত দুর্বোধ স্তরের উপযোগী উন্নত করে তুলবে।

এস্থলে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি বিশেষ ক'রেই স্মরণীয়—"আমার মত এই যে ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা।"

অশিক্ষা যত না দূর হচ্ছে, তার চেয়ে কুশিক্ষা প্রশ্রয় পাচ্ছে কুসংস্কারকে বাহন পেয়ে। সমাজের মধ্যে শিক্ষার মান অত্যন্ত অসমান। লোকশিক্ষার

বিস্তৃতি না থাকায় শিক্ষিতদের একাংশের মধ্যেও শেষে নিজেদের শিক্ষার বিশেষ-অধিকারের পুঁজি নিয়ে দৈবের নামে লোক-ঠকানোর কুপ্রবৃত্তি সংক্রামিত হয়ে চলেছে। অর্থ ও বিষয়সম্পত্তির সমবণ্টন-প্রণালী প্রবর্তন দ্বারা সমাজে আজ শান্তি-শৃঙ্খলা আনবার প্রয়াস দেখা দিয়েছে; কিন্তু শিক্ষার সাম্যবিস্তার তার চেয়ে কম আবশ্যক নয়। সেদিকটায় রবীন্দ্রনাথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রথম থেকেই। তাঁর লোকশিক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ রচনা ও চেষ্টা তারই সাক্ষ্য দান করে। সর্বদা আপনার বিশিষ্ট সাধনায় অভিনিবিষ্ট থেকেও সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের এই আবশ্যিক কর্তব্যের কথা তাঁর মতো অবিরাম এমন গুরুত্বের সঙ্গে কম লোকই ভেবে এসেছেন ও ব'লে এসেছেন।

শিক্ষার উপযোগিতা এই যে, ঠিকমতো পরিচালিত হ'লে তাতে আমাদের চোখ কান খুলে দেয়। যা নিয়ে আমরা প্রত্যেকে সংসার করি, সেই সব জিনিসের পরিচয় ও ব্যবহারকৌশল শিক্ষার সাহায্যেই আমরা জানতে পারি। নিজেদের পরিচিত সংসারসীমা ছাড়িয়ে চারিদিকে যে বৃহত্তর সংসারবৃত্ত আমাদের ঘিরে আছে, অজানা তার অলিগলি, নিয়ম শৃঙ্খলা, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সবই শিক্ষালব্ধ জ্ঞানে ও অভ্যাসে আমাদের আয়ত্ত হতে পারে। অ-দৃষ্ট দৈবও এই ক'রেই একদিন বাস্তব অভিজ্ঞতার আওতায় এসে পড়ে। শিক্ষার কল্যাণে অন্তত তার উৎপাত থেকে সময় থাকতে আমরা সতর্ক হতে পারি। অনেকস্থলে বাইরের ঐ বৃহত্তর বিশ্ব পরিবেশের প্রভাব আমাদের সীমাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পেরিয়ে চলে আসে আমাদের ক্ষুদ্র ঘরে। তখন সেখানে আমাদের সাধ্যের সঙ্গে তুলনা ক'রে তার অপ্রতিহত বেগ আমরা মাথা পেতে নিতে কুণ্ঠাবোধ করিনে;—শিক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের কাছে এ ঘটনাকে প্রাকৃতিক লীলা ব'লেই মনে হয়, অলৌকিক কোনো দেবদেবী ভূতপিশাচের অস্তিত্বএর পিছনে আরোপ করায় না। এতে ক'রে একদিকে আকস্মিকতায় অবিচলিত থাকার সহ্য ধৈর্য বাড়ে, অন্যদিকে অহংকার কমে কিংবা শোক দুঃখ নিরাশা ও গ্লানি অপমানের জ্বালা থেকে নিজেকে বাঁচাবার মত সান্ত্বনাও মিলে। সান্ত্বনা দরকার প্রশান্তির জন্য। কোথাও একটু প্রশান্তি না থাকলে নিরন্তর উত্তেজনা বা আঘাতে অশান্তিতে ভিতরের স্বাস্থ্য টেঁকে না, মন ভেঙে পড়ে। ভাঙা মন সকল কাজের বার। 'হৃদয়ের দাহ এবং ক্ষোভ প্রাণকে খরচ করে'—এ মহাজন বাক্য (জাপানযাত্রী, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৮০)।

নৈতিক দায় থেকে মুক্ত হবার পক্ষে মানুষের সান্ত্বনার বিষয় দু'রকম হতে পারে, এক এই ভাবা যায় যে, যা ঘটেছে তার প্রতিকার ছিল সাধ্যাতীত, ছিল এমনি তা অপ্রতিরোধ্য ; আর ভাবা চলে, যতদূর যা করবার ছিল তা করা হয়েছে, যত্নের কোনো ত্রুটি হয় নি। জীবনযাত্রাসংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি মনোযোগ রেখে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার বা সুষ্ঠু পরিণতি লাভের পথ ক'রে দেওয়ার নাম হচ্ছে যত্ন। জীবনের সার্থকতা-বিচারের মাপকাঠি যদি এই সর্বাঙ্গীণ যত্ন-ধর্মকেই ধরে নেওয়া যায় তবে দৈবযোগের লাভ-লোকসানটা উপরি পাওনার সামিল হয়ে পড়ে। যত্নপরায়ণ হিসেবী মনে দৈব তার অভিঘাতের জোরটা সহসা তত খাটাতে পারে না, সে মনের প্রশান্তিও অনেকটা তাই নির্বিঘ্ন হতে পারে।

"যাত্রী" গ্রন্থে (পৃঃ ২৩৪) কবি বলেছেন,—"য়ুরোপে গেলে সবচেয়ে আমার চোখে পড়ে মানুষের এই সদা জাগ্রত যত্ন। কোথাও আন্দাজ খাটবে না, খেয়ালকে মানবে না, বলবে না 'ধরে নেওয়া যাক্,' বলবে না 'সর্বজ্ঞ ঋষি এই কথা বলে গেছেন।' জ্ঞানের ক্ষেত্রে, নীতির ক্ষেত্রে যখন আত্মশক্তির ক্লান্তি আসে তখন বৈরাগ্য দেখা দেয়। সেই বৈরাগ্যের অযত্নের ক্ষেত্রেই ঋষিবাক্য বেদবাক্য গুরুবাক্য মহাত্মাদের অনুশাসন আগাছার জঙ্গলের মতো জেগে ওঠে—নিত্য-প্রয়াসসাধ্য জ্ঞানসাধনার পথ রুদ্ধ করে ফেলে। বৈরাগ্যের অযত্নের ফাঁক দিয়ে দিনে দিনে চারিদিকে যে প্রভূত আবর্জনার অবরোধ জমে ওঠে তাতেই মানুষের পরাভব ঘটায়।" আত্মশক্তির শিথিলতায় নিয়ে যায় কোন্ পরিণামে, কবির এই উক্তি থেকে সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত,—সর্বক্ষেত্রে সাবধানতা ও যত্নশীলতা, এই দুটি জিনিসই দুর্ভাগ্যের মার থেকে বাঁচিয়ে মানুষকে জীবনে জয়যুক্ত ক'রে উত্তীর্ণ করে দিতে পারে—সংস্কৃতির পথে এই দুটিই প্রধান অবলম্বন।

সাবধানতার ফল কী হতে পারে, তার একটি সুন্দর গল্প আছে। দৈবজ্ঞ গুণে বললে—রাজার সর্পযোগ। রাজত্ব করা শিকেয় উঠল, রাজা দিনরাত ভাবেন, সকলকে শুধান,—কী করা যায়। রাজার ধর্মশালায় কতলোক আসে। একদিন এক সন্ন্যাসী এল। সে বললে—সাপ তো উপলক্ষ। আসলে সময়টা নিয়েই কথা। ওটাকে এড়াতে হবে। চেষ্টা কর—এইটুকুই মানুষের সাধ্য। সন্ন্যাসীর পরামর্শে রাজ্যের চারিদিকে পর পর চারটি পরিখা কাটা হল। প্রথমটি তার ক্ষীরসমুদ্র, দ্বিতীয়টি দুধসমুদ্র, তৃতীয়টি মধুসমুদ্র, আর,

চতুর্থটি তৈলসমুদ্র। ওদিকে রাজা নির্ঘাত মৃত্যু জেনেই বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। সাপ এল। পথে আসতে পড়ল ক্ষীরসমুদ্রে। রাগের ঝাঁজ অর্ধেক গেল উবে। দুধে ডুবে মেজাজ হল আরো মোলায়েম। মধুতে তাকে মধুর ক'রে দিলে। শেষে তেলের স্নিগ্ধতায় ভদ্রলোক হয়ে সে যখন রাজার কাছে এসে পৌছল ঠিক তার আগেই রাত ভোর হয়ে গেল। রাজার ফাঁড়া গেল কেটে। রাজা দেখলেন তিনি বেঁচে আছেন। তখন বুঝলেন সাবধানতার মর্ম।

এটি নিছক গল্প। কিন্তু এর ভিতরকার ইঙ্গিতটি সত্য। একথা নিশ্চিত, দেশে এরূপ মনের প্রসার হলে তার থেকে সর্ববিষয়ে প্রতিকারের পথও কিছু না কিছু বেরবেই। ঘটুক দুর্ঘটনা, সেটা দুঃখের বিষয় হলেও দোষের নয়। কিন্তু দুর্ঘটনার বাহুল্যটা হচ্ছে জাতির অসতর্ক উচ্ছৃঙ্খল ঢিলে মনের পরিচায়ক. তা একান্তই নিন্দার্হ, তার ভবিষ্যৎও সেজন্য আশঙ্কাময় বলতে হবে।

এবারে গল্প ছেড়ে একটি সত্য ঘটনা বলা যাক্। অনেকদিন পর অনেক ঝামেলা কাটিয়ে বাসায় একটি পরিচারক মিলল। বেহারী যুবক, জাতিতে গোয়ালা; কাজ বা বেতন নিয়ে প্রথম থেকেই তার কোনো বোঝাপড়া বা বাছবিচারের বালাই নেই। সে খেটে যায় একমনে। দুপুরের অবসরে দুদিন বাদে দেখা গেল সে খাতা নিয়ে কী লিখছে। বইয়ের শেল্ফ্ ঝাড়পোঁছ করতে গিয়ে একদিন সে পেয়ে গেল তুলসীদাসের বিনয়পত্রিকা একখানি, তার সঙ্গে আরো খানকয়েক 'কিতাব'—হিন্দী সাহিত্যের চয়নিকা। যেন হারামাণ খুঁজে পেয়েছে, এমনি খুশি হল। সেই থেকে রাত্রিতে শুরু হল তার পড়া, দুপুর কাটে লেখায়। একদিন শুনাল তার ডায়েরী ;—নাটক লিখে চলল একমনে। কথায় কথায় বোঝা গেল, লেখাপড়া কিছু সে জানে। কিন্তু তাঁর ঝোঁক এদিকে বেড়ে যেতে কাজে ঘটল বাধা। কাজ সেরে লিখে উঠে সে একটু ঘুমতো। এদিকে ঘুম থেকে উঠতেই বেলা যেত ফুরিয়ে। তাকে বলা হল লেখাটা একটু কমিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার কথা,—সময়মতো যাতে সব দিক সে বজায় রাখতে পারে। কথা শুনে সে একটি কথাই মাত্র বললে,—সময় নিয়ে তো কথা ?—সময় তো আমার হাতে ! দুপুরে না ঘুমলেই চলবে। তা ব'লে লেখাপড়া কমাব কেন ! ঠিকমতোই দেখবেন কাজ করে যাব। তারপরে কিছু তাকে আর বলার প্রয়োজন হয়নি। কর্তব্যে এমনি সে রয়েছে হুঁশিয়ার। তার শিক্ষা, তার বৃত্তি—বেশি দূর এগোয়নি বটে কিন্তু তার বুদ্ধিবিচার ও চরিত্র যে স্তরে পৌছেছে তাতে তাকে সাধারণ শ্রেণী থেকে কিছু

উন্নতমনা বলতে বোধ হয় বাধা ঠেকবে না কারোরই : সময়কে যত্ন দিয়ে নিজের অনুকূলে চালাবার এই যে দৃঢ় নিঃসংশয় নিশ্চিন্ততা—ভবিতব্য-ভাবিত শিক্ষিতের দেশে তথাকথিত-অশিক্ষিতের মুখে এরূপ বড় একটা আশা করা যায় না। বরঞ্চ উল্‌টোটাই শোনা গিয়ে থাকে—কালের দোহাই দিয়েই আমরা বসে থাকি। সকল চেষ্টার সমাপ্তি ঘটে 'সময়ের ফের'-এর উপর কারো হাত নেই ব'লে। দৈববাদের প্রতিক্রিয়ার দিক হচ্ছে এই মনোবৃত্তি। একে না রুখলে রক্ষে নেই। হাতে সময় থাকতে অযত্নে কত সময় যে অমনি হারিয়ে যাচ্ছে,—তার কথা কে বলে।

একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটে গেল। তাকে অনিবার্যবোধে দৈববিশ্বাস দিয়ে তখনকার মতো মেনে নিলেও পরমুহূর্ত থেকেই অ-দেখায় নিহিত ঘটনার কার্যকারণকে মানুষের সাধ্যায়ত্তে আনার সাধনায় যথোপযুক্ত অনুসন্ধানে উদ্যোগী হয় শিক্ষিত মন। তখন অন্তত সে ধরণের দৈব-পুনরাবৃত্তি কোথাও আর না ঘটতে পারে—এই থাকে তার সতর্কতা। একটি ক্ষেত্রেও যদি অতঃপর সেরূপ ঘটতে দেখা যায়, তবে কেবল সেই দুর্গত পরিবার বা ব্যক্তিবিশেষই নয়, যথার্থ শিক্ষিত হ'লে পারিপার্শ্বিক গোটা সমাজই তার জন্য ধিক্কারের সঙ্গে অনুভব করতে থাকবে,—যেন সেইটে সমাজের বড়ো পাপ এবং তার প্রতিকারটা সার্বজনীন প্রায়শ্চিত্তের বিষয়।

উদ্যোগীনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

এই কথা-ক'টিকে করা চাই আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির মূলমন্ত্র। কিন্তু কেবল লেখাপড়ার চর্চাজাত পাশকরা-শিক্ষায় প্রচলিত বদ্ধমূল সংস্কার দূর হবার নয়। প্রতিপদে এই বাণীর অনুকূল আচরণের জন্য সামাজিক দাবী জানানো চাই। সামাজিক এই নৈতিক মান অক্ষুণ্ণ রেখে চলার তাগিদ সর্বত্র জাগ্রত থাকলে একই রকমের দুর্ঘটনা বারবার লোককে ভোগাবে না। হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে অসহায়-ভাবে এমন অদৃষ্টের মার-খাওয়া কালে-কালে জাতির চির অভিশাপের বিষয় হয়ে চলতে পারবে না। আমরা জানব—অদৃষ্ট মানে ঘটনার সাময়িক অনিবার্যতা মাত্র,—চির অনিবার্যতা নয়। আমরা মানব "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।" মানুষের জন্য রয়েছে মহাতেজা কর্ণের সেই বাণী—"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মমায়ত্তং হি পৌরুষম্।" এক-একস্থানে দৈবকে স্বীকার করতে হয় হোক, কিন্তু, সংসারে আমারও সাধ্যের বিষয় কিছু আছে। সে আয়ত্ত করার কৌশল আমি না জানি,

জানতে হবে আমাকে উপযুক্ত গুরুর কাছ থেকে, অর্থাৎ মানুষের অতীত অভিজ্ঞতার ধারাবাহীদের শিক্ষা থেকে। এটা খাঁটি বাস্তবের কথা। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে রবীন্দ্রনাথও সেই কথাই বলেছেন, "পুরুষের পক্ষে পুরুষত্ব যত সহজ, মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব তত সহজ নহে। মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া মানুষকে যাহা পাইতে হইবে, তাহা নিদ্রিত অবস্থায় পাইবার নহে। এইজন্যই সংসারের সমস্ত কঠিন আঘাত আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে,—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয় দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। উঠ, জাগো, যথার্থ গুরুকে প্রাপ্ত লইয়া বোধ লাভ করো। সেই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, কবিরা এইরূপ বলেন।"

এই প্রেরণা নিয়ে মানুষ এখন ভগবানের খোঁজেই যাক্, বা বাস্তব যে কোন সিদ্ধির পথই ধরুক,—সবরকম সিদ্ধির গোড়ার কথাই এই "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"। পুরুষসিংহ বিবেকানন্দের বাণী থেকেও আমরা এই জেনে এসেছি। দৈব-নির্ভর-নিশ্চেষ্ট অলস মন নিয়ে কোন সাধনাই সার্থক হবার নয়; চাই যথোপযুক্ত চেষ্টাতৎপর মনুষ্যত্বের স্বাধীন বিকাশ।

সফরের মুখে একবার গান্ধিজী উপস্থিত হলেন দিল্লীতে "দিলখুশা" ভবনে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে তিনি সেবার অনশন আরম্ভ করলেন। দেহ খুব কাতর। সংবাদ পেয়ে দলে দলে দর্শনার্থী এসে ভীড় করতে লাগল। এণ্ড্রুজ সাহেব দ্বাররক্ষীরূপে ঠেকাচ্ছেন জনতা। কঠোরভাবে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এমন সময় বহুদূর গ্রাম থেকে এলো এক বৃদ্ধ কৃষকদম্পতি। একমাত্র ছেলে তাদের রোগশয্যায়। বাঁচবার আশা নেই। দুয়ারে ঠায় তারা বসে রইল। মহাত্মাকে না দেখে যাবে না। তাদের বিশ্বাস, গান্ধিজী স্বয়ং ভগবান, তার চরণামৃতে সকল জ্বালা দূর হয়। ছেলে সেই পা-ধোয়া জল পান করলেই সেরে উঠবে। এণ্ড্রুজ তাদের ঘরে ঢুকতে দেবে না, তারাও ঘরে ঢুকবেই। গান্ধিজীর কানে কথাটা গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন আসতে দাও, এক্ষুণি আসতে দাও; আমি যে ভগবান নই, একথাটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। লোকের মধ্যে এ ধারণা থাকা একটুও ভাল নয়। শুনে এণ্ড্রুজ আর কী করেন। কত বড় বড় লোককে ফেরাতে হচ্ছে, কত প্রয়োজনীয় কাজের কথাকে ঠেকাতে হচ্ছে,—মহাত্মার সময়ের তখন এমনি মূল্য, আর এরা কোথা থেকে এসে এমনিতেই দেখা পেয়ে গেল! বুড়োবুড়িকে মহাত্মা বললেন,—কেন এসেছ শুনেছি, কিন্তু আগে আমার দুচারটে কথার জবাব দাও। ভগবান মানো? উত্তর হল,—নিশ্চয় মানি। সেইজন্যই

তো এসেছি। গান্ধিজী বললেন,—জানো তো তাঁর মতো মহৎ আর-কিছু হতে পারে না। ক্ষুদ্র একটা মানুষকে তোমরা ভগবান বলছ, এতে কি ভগবানকে ছোট করা হয় না? তার আবার পা-ধোওয়া জল! সে জল খেলে অসুখ সারবে, এমন বাজে কথা বিশ্বাস করো কী করে?

বুড়োবুড়ি মনের আনন্দে বেরিয়ে গেল। দাওয়াই তাদের পাওয়া হয়ে গেছে। সে দাওয়াই হচ্ছে বিচারশীলতা। দেহের রোগমুক্তির চেয়ে আরো বড়ো আরোগ্য তাদের ভিতরে তাতেই এনে দিয়েছিল। দেখে সকলে আশ্চর্য হল।

মনে রাখা চাই, আমাদের এই বর্তমান স্বাধীনতার মূলে রয়েছে এই মহাত্মারই প্রাণপাত সাধনা। তাঁর কর্মের আদর্শের স্থলে স্থাপিত করে রেখেছিলেন তিনি নরোত্তম রামচন্দ্রের পৌরুষোদ্দীপ্ত মহাজীবন। তিনি সংসারে চলেছেন স্বাবলম্বনের উপর প্রাধান্য দিয়ে। বাধা জয় করেছেন প্রতিপদে, মানুষেরই বুদ্ধিতে বীর্যে, সেই অমিত শক্তিধর রামচন্দ্রেরই মতো। এ স্বাধীনতার দীক্ষামন্ত্র তাঁরই দেওয়া সেই মহাবাণী—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।" সে বাণী স্মরণ রেখে চেষ্টা করে দেখার গৌরবই আমরা অর্জন করব—সেই আমাদের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' নামক রচনায় বিশেষ করেই বলেছেন—'আমরা সব কিছু পারব' এই কথা সত্য করে বলবার শিক্ষাই আত্মাবমাননা থেকে আমাদের দেশকে পরিত্রাণ করতে পারে—এ কথা ভুললে চলবে না।… আমাদের শিক্ষালয়ে নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগিতার হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই তা হলেই বুঝব দেশে লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হতে চলল। এই আমন্ত্রণ ইকনমিক্‌সে ডিগ্রি নেওয়ায় নয়, চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর ক'রে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়; অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যচর্চায় নয়, পৌরুষচর্চায়।"

পরিবেশ

যে-পরিবেশে যে আছে, সেখানকার দায়িত্বই তার জীবনের প্রাথমিক দায়িত্ব। মানুষ যদি বে-হিসাবী না হয়, যদি সে পারিপার্শ্বিক দায়িত্ব এবং আত্মশক্তির পরিমাপ ক'রে সবদিকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিমাণ মতো সামর্থ্য নিয়োগে অগ্রসর হয়, তবে এমন সমস্যা কমই আছে, যা তাকে ঠেকাতে পারে।

পরিবেশের থেকেই মানুষ কালে কালে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আসছে। জলবায়ু, প্রাকৃতিক নানা ধারা ও লোকের যোগাযোগের মধ্য দিয়ে চলে আসছে তার জীবনযাত্রা। সকলের স্থায়ী কল্যাণের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে মূল্য পাচ্ছে তার সামাজিক রীতিনীতিগুলি। তার চিন্তা, তার ভাষা, তার কাজ—সবই তার পরিবেশের সঙ্গে বহুলাংশে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং তার শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশ একটি প্রধান বিষয়রূপে গুরুত্ব লাভ করবে—এ খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষায় পরিবেশ ক্রমেই গৌণ হয়ে পড়ছে। ঘরের কাছের প্রতিবেশ অজানাই থেকে যাচ্ছে, সে স্থলে দূরের ব্রহ্মাণ্ড এখন জ্ঞাতব্য হয়ে উঠছে। পুঁথিগত তত্ত্ব ও তথ্যের ভারে মন বোঝাই হচ্ছে ; মানুষ জ্ঞান ও কর্মের বিপুল বোঝা নিয়ে বিব্রত হচ্ছে। কোনোখানেই বাস্তবের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না, নড়তে চড়তে কেবল বাধছে ঠোকাঠুকি।

দেশের ও সমাজের দু'দিককার স্বাভাবিক দু'রকম পরিবেশই মানুষকে গড়ে তোলে ; মানুষের শিক্ষকের কাজও পরিবেশই অনেকটা করে থাকে। সুতরাং পরিবেশের ভিতরে নিহিত স্বাভাবিক সাহায্য ও নানা নির্দেশ গ্রহণ ক'রে চক্র হতে চক্রান্তরে পরিক্রমণ ক'রে চলাই আমাদের জীবন বিকাশের প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু, এই সঙ্গে এ-ও আবার জানবার আছে যে, মানুষের প্রয়োজন ও ইচ্ছানুসারে নূতন মালমশলায় পরিবেশকে ঢেলে সাজিয়ে তৈরি ক'রে নিয়ে নূতন ধরণের মানুষও সৃষ্টি করা চলে। যে দিক দিয়েই দেখা যাক্; মানুষের শিক্ষার পক্ষে পরিবেশের সাহায্য সব দিক দিয়েই অপরিহার্য। এক মত অনুসারে পরিবেশ হয় শিক্ষক, অন্যমতে পরিবেশ শিক্ষার উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়, এই মাত্র। সমাজ গঠনে পরিবেশের মূল্য কতখানি হতে পারে, তার বিশেষ ইঙ্গিত পাওয়া যায় পাশ্চাত্যের মনীষী প্যাবলবের কাজ থেকে। শিক্ষা হচ্ছে সমাজ গঠনের প্রাথমিক

মূল অধ্যায়। সুতরাং, প্যাবলবের মতের তাৎপর্যও আমাদের পক্ষে তলিয়ে বোঝা আবশ্যক।

শুধু জ্ঞানে নয় সামাজিক কর্মের যোগেও কাছের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে সুসংগত করে চালাতে সক্ষম হলে পরে স্বাভাবিক ভাবেই সময় আসবে নূতনতর পরিবেশে প্রবেশ করবার। পরিবেশ থেকে পরিবেশান্তরে প্রবেশের দ্বারা মানুষ বৃহত্তর ক'রে আপনাকে সকলের মধ্যে এবং সকল লোককে আপনার মধ্যে পেতে থাকবে। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা তাকে যে শুধু সর্ববিষয়ে অনুরাগী করবে, তাই নয়, সর্বদিকে বিস্তারশীলও করবে। এজন্যই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাকে সমাজের বুনিয়াদ-স্বরূপ গ্রহণ করা আবশ্যক হয়েছে। বিশেষ-বিশেষ দিক ধ'রে শিক্ষাচর্চা বা বিশেষ শ্রেণীর জীবন গঠনের যে-রীতি বর্তমানে প্রচলিত আছে, তার ফল বুঝতে কিছু বাকি নেই। এখন থেকে মানুষের ভাবী ইতিহাস রচনার জন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা ও সর্বাঙ্গীণ জীবনের আদর্শের দিকে। জীবনের সে গতির আদর্শ একমুখী-প্রসারিত খাড়া উচ্চ দীর্ঘাকৃতি নয়, তা দিগ্‌বলয়ের মতোই সর্বমুখীব্যাপ্ত গোলাকার। হয়তো এতক্ষণে আমরা বুঝতে পারব, গতির প্রতীক কেন দণ্ড নয়, কেন হয়েছে তা চক্র।

পরিবেশবাদ ও প্যাবলব

মানব-সমাজে কালে কালে নানা মতবাদ দেখা দিয়েছে। এই মতবাদ স্থূল বস্তুগুলির মতো বাইরের প্রত্যক্ষ বিষয় নয়, নিরবয়ব মনের অদৃশ্য জিনিস। কিন্তু বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়ে মতবাদগুলি সংসারকে সর্বদা সক্রিয় রাখছে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, জগৎ বস্তুময়। স্থূল ও সূক্ষ্ম, বস্তুময় জগতের এই দুই রূপ। মতবাদগুলি সূক্ষ্ম রূপ। আগে স্থূল, না, আগে সূক্ষ্ম,—সৃষ্টির ধারা স্থূল হতে সূক্ষ্মে, না সূক্ষ্ম হতে স্থূলের দিকে চলেছে,—প্রধানত এই নিয়েই মতভেদ। যাঁরা মনে করেন স্থূল আগে, পরে সূক্ষ্ম, স্থূলের থেকে ক্রমে হয়েছে সূক্ষ্মের অভিব্যক্তি,—জগতে তাঁরা বস্তুবাদী বলে খ্যাত।

বস্তুবাদের আধুনিক গুরু মার্কস্। তাঁর অভিমত ব্যাখ্যায় মার্কস্‌পন্থীরা বলছেন—"বস্তু ও মনের পরস্পর নির্ভরশীলতা তো আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা। তাহা সত্ত্বেও মার্কসবাদের মতে বস্তুই হইতেছে প্রাক্, মন তাহার সৃষ্টি। বস্তুর বিবর্তন প্রক্রিয়ার কোন এক সংযোগে মনের উদ্ভব।....মার্কস্ মন অপেক্ষা বস্তুর প্রাধান্যকে কখনও অস্বীকার করেন নাই। করেন নাই বলিয়াই তাঁহার মতবাদের দার্শনিক নাম দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ।" (—পরিচয়, চৈত্র ১৩৫৮)।

অর্থনীতির বিচারের পথ ধ'রে মার্কস্ তাঁর এই দার্শনিক মতবাদে এসে পৌঁছেছেন। জাতিতে জার্মান-ইহুদি হলেও, রুশদেশে রুশজাতির মধ্যেই মার্কস্ প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন। তাঁর অভিমতকে জগতে কার্যকর করে তোলে রুশিয়েরাই। কিন্তু পরবর্তীকালে খাস রুশ দেশে রুশ জাতির মধ্য থেকে আরেক মনস্বীর আবির্ভাব ঘটে। বস্তুবাদের মূলসূত্রকে তিনি অন্য আরেক দিক থেকে আবিষ্কার ক'রে বিজ্ঞানের আরেক ভিত্তির উপর দৃঢ়তর ক'রে স্থাপন করেন। তাঁর গবেষণার ফল সৃষ্টির বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় কতখানি সহায়ক হয়েছে, বিশ্বমানবের সমাজ-কাঠামোকে ঢেলে সাজাতে কতখানি তা কাজে লাগছে, বস্তুবাদের এই দিককার পরিচয় জানতে হলে, মনীষী প্যাবলবের জীবনী ও কর্মধারার সম্যক্ আলোচনা অপরিহার্য।

"বস্তু আগে, মন পরে"—এই মতবাদের উপর ভিত্তি ক'রেই বিশ্বজনসমাজকে ঢেলে সাজাতে সাম্যবাদীরা বদ্ধপরিকর। আমাদের দেশেও ভাত-কাপড়ের

বৈষয়িক সমস্যাটাই সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় বিষয়বস্তুকে ভিত্তি ক'রে সমাজ ব্যবস্থার যে মতবাদ দেখা দিয়েছে, তার কথাটা নেহাত তুচ্ছ নয়। নানাদিক থেকে যতদূর সম্ভব তাকে বুঝে দেখবার দরকার আছে। তাতে বাস্তবের মূল্যবিচারে দৃষ্টির স্বচ্ছতা জন্মাবে, ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক যোগের দিকেও আমাদের আগ্রহ বাড়বে; কাজের ব্যবস্থা ও ব্যবহারের রীতি স্থির করবারই যে শুধু সুবিধে হবে তাই নয়, যুক্তিসহ হয়ে নৈতিকবোধ গড়ে উঠবে পাকাপাকিভাবে।

যারা অন্যপথের লোক, 'মনঃপূর্বংগম'-মতবাদী,—তাদেরও পক্ষে বস্তুবাদের খোঁজখবর আজকের দিনে কিছু-কিছু জেনে রাখা শ্রেয়। বিচিত্র মতের লোক নিয়ে সংসার। সকলের সঙ্গেই যোগ রক্ষা ক'রে চলতে হয়। ঘরকুনো হয়ে থাকা কিংবা কাউকে কোনো বিশেষ এলাকায় সম্পূর্ণ ঠেকিয়ে রাখা এখন সহজ নয়। দিনে দিনে এই মেলামেশাই আরো বাড়াবে। এরূপক্ষেত্রে পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পরের জানা থাকলে, হয়তো বিবাদের সীমা বাঁচিয়ে, প্রতিবাসী হিসাবে জীবনযাপনের সুযোগও পরস্পরে পেতে পারে।

শিক্ষা এবং সমাজ-সংগঠন এই দু'দিক দিয়েই বস্তুবাদী প্যাবলবের বিষয়ে আলোচনার সার্থকতা আছে। প্যাবলবকে সাধারণ লোকে কমই জানে। বিজ্ঞানের অনুশীলকদের সামান্য অংশের মধ্যেই তাঁর পরিচয় সীমাবদ্ধ। তাঁদের মধ্যেও আবার তাঁর জীবনী বা তাঁর আদর্শের সুদূরপ্রসারী নৈতিক প্রবর্তনা সম্বন্ধে কৌতুহল জন্মেছে সামান্যই। তাঁর মতবাদ যে মানবতার মহান বিকাশের কাজে বলিষ্ঠ এক নৈতিক উপাদান জুগিয়ে চলেছে,—এ সত্য কেবল অনুমানের মধ্যে পর্যবসিত নেই, সমাজগঠনের বাস্তবক্ষেত্রে এখন তা কার্যকর হয়েছে। প্রমাণ-প্রয়োগের সুযোগ আজ সুস্পষ্ট।

প্যাবলবের জন্মভূমি রুশদেশ। প্যাবলব ছিলেন ধর্মযাজকের ছেলে, কর্ম-জীবনে হলেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। পরিপাকক্রিয়ার সম্বন্ধে গবেষণার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর প্রধান বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলেছিল কুকুরের মস্তিষ্ক নিয়ে। স্নায়ু ক্রিয়া-রহস্য উদ্‌ঘাটন ছিল তার উদ্দেশ্য। এক-একটি বস্তুর আকার ও তার গুণের প্রভাব দুই-ই আমাদের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়। এ দুয়ের মিলিত প্রভাব মস্তিষ্কের স্নায়ু-মণ্ডলকে (nerve-system) স্পন্দিত করে। হাসি-কান্না, দৌড়-ঝাঁপ, নিদ্রা-জাগরণ ইত্যাদি যা-কিছু, সবই তার ফলে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

খাবার সামনে না রেখেও কৃত্রিম ব্যবস্থায় কুকুরের লালা-নিঃসরণ ঘটানো হল। তাতে দেখা গেল, বাইরের কারণগুলো মস্তিষ্কের পূর্বধৃত স্মৃতিকে কুকুরের ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে আপনা-আপনিই উত্তেজিত ক'রে তুলছে এবং ঠিক একই লালা-নিঃসরণ-রূপ কাজের প্রকাশ ঘটেছে তার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে। এ-যেন, ইন্দ্রিয়গুলি এক-একটা যন্ত্রবিশেষ; পরিবেশের বস্তু ও ঘটনানিচয় বাইরে থেকেই সেগুলিকে চালিত করছে।

প্যাবলবের পরীক্ষণরীতি এইরূপ:—বাইরের সকল রকম প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে, অন্ধকার ঘরে একটি কুকুরকে বেঁধে রেখে, তার সামনে খাদ্য দেওয়া হল। এতে কুকুরটির মুখে লালা চলে এল। খাবার দেওয়ার সঙ্গে যন্ত্রযোগে একটি ক্ষুদ্র শব্দ করা হতে লাগল। পরে দেখা গেল খাদ্য সামনে ধরা না হলেও শুধু শব্দ শুনেই আপনা থেকে কুকুরের মুখে লালা নিঃসরিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে একটি ঘটনার সঙ্গে আরেকটি ঘটনার সংযোগ ছিল সামান্যই,—একদিকে একটি ছোটো শব্দ, অন্যদিকে লালা নিঃসরণ ক'রে মুখগহ্বর আহার্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—আহার্য সামনে থাকার প্রয়োজন হচ্ছে না। বাইরের এই আনুষঙ্গিকতার প্রভাব একইরূপ কার্য ঘটিয়ে তুলল কুকুরের ভিতরে। এটা হল ব্যবস্থার দ্বারা সংঘটিত প্রতিবর্তিতার (Conditioned reflex) ফল।

আবার কিছুদিন এমনি ক'রে খাবার না দিয়ে-দিয়েই চলল; শুধু শব্দটাই হতে থাকল। তার সঙ্গে খাদ্য পাওয়ার যোগ আর যখন রইল না, তখন কুকুরের মুখেও লালা দেখা দিল না। এ সব ঘটতে দেখেই বলা হয়েছে যে, বাইরে থেকে বস্তুযোগে এক-একটি প্রভাব ভিতরে তৈরি করা যায়, আবার বাইরে থেকেই আরো নানা অবস্থার সৃষ্টি ক'রে আগের সে প্রভাবকেও নূতন প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। ("We can condition a conditioned reflex.......chains of conditioned reflexes are built up and come into play."—The Science of Life: H. G. Wells. pp. 864, 865)

প্যাবলবের মতের সমধারার কর্মী ছিলেন আমেরিকার ডাঃ জে. বি. ওয়াট্‌সন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল—"আচরণবাদ"। প্যাবলবের 'অবস্থানুগত প্রতিবর্তিতা'র মতো তাঁরও পরীক্ষা-ক্ষেত্রের নানা উদাহরণের তিনি উল্লেখ করেছেন।

একটি শিশুকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিতান্ত জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিয়ে

একটা গামলার কাছে বসানো হল। সে তাতে চীৎকার করল, দৌড়ে পালাবার উপক্রম করল। তাকে যতই বলা হল,—দেখবে এসো, গামলার ভিতর সুন্দর মাছ আছে,—তার ভয় কাটল না কিছুতেই। এখন একে নিয়ে কী করা যায়? সেই গামলার ভিতর অন্য শিশু নির্ভয়ে হাত পেতে দিচ্ছে এরূপ দেখিয়ে বা তাকে লজ্জা দিয়ে টিট্‌কারী দিয়ে, যতই কলাকৌশলে তার সহজ আচরণ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা যাক, সব বৃথা হবে। সে ভীতুই থেকে যাবে। কিন্তু একটি উপায়ে ফল পাওয়া যেতে পারে। খাবার সময় ১০-১২ হাত লম্বা একটি টেবিলের এক মাথায় শিশুকে খাবার দিয়ে আরেক মাথায় গামলাটা বসিয়ে তার উপরে একটা ঢাকনা দিয়ে রাখা যাক। শিশুটি আপন মনে খেতে থাকবে, আর, ওদিকে গামলাটাকে নেড়েচেড়ে ঢাকাটা উঠিয়ে একটু আধটু ক'রে শিশুর দিকে সরিয়ে আনা হ'তে থাক্। এরকম কয়েকবার ধীরে সুস্থে অভ্যাস করিয়ে নিলে অবশেষে দেখা যাবে সে গামলায় হাত দিতে আর ইতস্তত করছে না। বিরক্তিও তার দূর হয়ে গেছে।

এভাবে, একটা অজানা-অচেনা, ভীতিকর, অবস্থার পরিবর্তে মনোরম পরিবেশের মধ্যে আরেকটি অবস্থার সৃষ্টি ক'রে যুক্তিহীন ভয়কেও খাওয়ার সময়কার সুখদায়ক স্মৃতির সঙ্গে জড়িত ক'রে তোলা যায়,—ডাঃ ওয়াটসনের এই পরীক্ষাটি প্যাবলবের কাজের ধারার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মেলে। ("By continuing this process of substituting a pleasant conditioning stimulus for an unpleasant one, the identical object was finally changed from a source of irrational fear to an agreeable reminder of dinner-time. This is entire harmony with Pavlov's work."—The Science of Life. p. 880)

আচরণবাদ নিয়ে গবেষণারত ওয়াটসন্ শিশুদের উপর বংশধারার বিশেষ-বিশেষ গুণের প্রভাব-বর্তন পর্যন্ত স্বীকার করেন না। পৃথিবীর শিশুদের মন এক-একখানি শাদা কাগজের মতো। তার উপর পরিবেশিক প্রভাব ঘটিয়ে ইচ্ছামতো তাতে ধনী, দরিদ্র, ভিখিরি বা চোরের মনোবৃত্তি আনা যেতে পারে ব'লে ওয়াটসন্ বিশ্বাস করেন।

গবেষণার পথে এগিয়ে যেতে যেতে ১৯৩০ সনে প্যাবলব তাঁর কাজের সারোদ্ধার করে "A Physiologist's Reply to Psychologists" (মনস্তত্ত্ববিদের

উদ্দেশে শরীর-তত্ত্ববিদের উত্তর) নামক রচনায় বলেন, "মানুষ একটি বিশিষ্ট প্রণালী ছাড়া কিছুই নয়। ইংরেজিতে যাকে বলি system। আরো স্থূলভাবে বলা চলে, যন্ত্র। প্রকৃতির সর্বত্রই যে অলঙ্ঘ্য নিয়মের রাজত্ব, মানুষ তার শাসনসীমার বাইরে নয়। তবে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মানুষ-যন্ত্রটির স্বাতন্ত্র্য কোথায়?—এর জবাব পাওয়া যাবে মানুষের অদ্বিতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ-শক্তির মধ্যে। যথাযথ অনুশীলনের ফলে আমাদের মধ্যে এই ধারণাই প্রবল ও প্রধান হয়ে ওঠে যে, তার স্নায়বিক ক্রিয়া অসাধারণভাবে নমনীয় এবং অসীম শক্তির বাহন। এর মধ্যে কিছুই নিশ্চল বা নিয়ন্ত্রণাতীত নয়—এর সবকিছুই আরো-ভালোর পথে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে। প্রয়োজন শুধু অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির।" ("Man is of course, a system (more crudely, a machine), and like every other in nature it is governed by the inevitable laws common to all nature, but it is a system which within the present field of our scientific vision, is unique for extreme power of self-regulation···The chiefest, strongest and most permanent impression. We get from the study of higher nervous activity by our methods in the extraordinary plasticity of this activity, and its immense potentialities, nothing is immobile or intractable and everything may always be achieved, changed for the better, provided only that the proper conditions are created").

আমেরিকার নিয়ুইয়র্ক ও ইংলণ্ডে এডিনবার্গের বিজ্ঞানকংগ্রেসে প্যাবলব কয়েকটি বক্তৃতায় তাঁর মত ব্যাখ্যা করেন। স্বদেশে কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট তাঁর গবেষণাকে সাদরে গ্রহণ ক'রে তাঁর কাজের প্রসারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় যত্নবান হন। ১৩টি খণ্ডে প্যাবলবের লেখাগুলি তাঁরা প্রকাশ করেন। একটি বিবরণীতে জানতে পাওয়া যায়—প্যাবলবের জীবদ্দশায়, তাঁর কাজ যাতে এগোয় তার জন্য সোভিয়েট-গবর্ণমেণ্ট এমন সব অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন, সে রকম আগে কোথাও হয় নি। লেনিনের প্রবর্তাধীনে জন-প্রতিনিধি-সভা প্যাবলবের প্রয়োজন মেটাতে একটি সমিতি স্থাপন করেন। সরকারী একটি হুকুম-নামাও এই মর্মে প্রচারিত হয়। তাঁর কাজের সুবিধের জন্য দুটি গবেষণাগার গড়ে ওঠে,—একটি লেনিনগ্রাদে, অন্যটি কোল্টুসীতে। লেনিনগ্রাদের গবেষণাগারের নাম হয় 'দি ফিজিওলজিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ দি একাডেমি অফ্ সায়েন্সেস্'; কোল্টুসীতে হয় জীববিদ্যার

কেন্দ্র। প্যাবলব সেটিকে বলতেন তাঁর conditioned reflexes সম্পর্কিত গবেষণার রাজধানী। ("In Pavlov's life time the Soviet government created unprecedented conditions for the advancement of his work. On Lenin's initiative the council of peoples commissars set up a special committee to provide him with the conditions he needed, and a government decree was issued to his effect. The government founded two research institutes for his benifit—the Physiological Institute of the Academy of Sciences in Leningrad, and the Biological Station in Koltushi, which Pavlov called "The capital of the conditioned reflexes.")

১৯২৪ সনে লেনিনগ্রাদে প্রবল বন্যা হয়। তাতে জন্তুজানোয়ার সবই প্রায় ডুবে যায়। একটি কুকুরের আচরণ সে সময় প্যাবলব লক্ষ্য করেন। বন্যার স্রোতে কুকুরটি আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাকে পরীক্ষাগৃহে এনে রাখা হল। পরে টিন পিটিয়ে, বাতাসের বেগ বাড়িয়ে, মেঝেতে জল ঢেলে, – নানা কৃত্রিম উপায়ে ঝড় ও বন্যার আভাসপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে দেখা গেল—ঠিক আগের মতোই কুকুরটি কুঠরির ভিতরে থেকেও বন্যায় ভাসবার সময়ের মতো আড়ষ্ট হয়ে রইল। আবার, ক্রমে একসময় যথাযোগ্য পরিবেশের সংস্থান ঘটিয়ে মানুষের স্নায়ু-রোগও সারানো গেল।

এসব পরীক্ষা-স্থলে দেখা যায়, প্যাবলবের (conditioned reflex) মতের প্রধান কথাই হচ্ছে, পরিবেশ। পরিবেশের বস্তু ও তৎসন্নিবেশের দ্বারা সংঘটিত ঘটনা-সাদৃশ্য যখন মনের ক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত ক'রে থাকে, তখন মানতে হয় শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবেশ সৃষ্টি ব্যাপারটার কার্যকারিতার গুরুত্ব আছে। সমাজের বেলাতেও আছে। স্বভাবতই এ-সূত্র খাটিয়ে বলবার কারণ ঘটে যে, নৈতিক দিক দিয়ে ভালো হওয়ার জন্য কেবল উপদেশ না দিয়ে মানুষের পরিবেশের অর্থাৎ সমাজের অবস্থার উন্নতি-বিধানের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। মন্দের কারণগুলি দূর করে দিলে মানুষের ষড়রিপু এবং সে-সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়াগুলিও দূর হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সমাজে সর্বত্রই এই মৌলিক নীতি চর্চার ফলে মানুষ শুধ্‌রে গিয়ে উন্নত হয়ে উঠবে, তাতে বিচিত্র কী।

পদার্থ ও পরিবেশ, এ দুটি বিষয় কেন যে আধুনিক রুশের সমাজ-গঠনে আজ এত গুরুত্ব লাভ করেছে, তা বোঝা যাবে স্ট্যালিনের একটি উক্তি থেকে। তিনি

বলছেন,—প্রকৃতি হচ্ছে একটি একক ও অদৃশ্য পদার্থ। তার প্রকাশ দু'রকম—বস্তুগত ও ভাবগত। এই যে আমাদের সমাজ-জীবন, তারও প্রকাশের ধারা দুটি—বস্তুগত ও ভাবগত। আমাদের জানতে হবে, প্রকৃতি ও সমাজ-জীবনের উন্নতি এই-রকমেই হয়ে থাকে : ভাবগত দিকটি হচ্ছে সচেতনতার দিক। বাইরের বস্তুগত দিকটার উন্নতি হয়ে চলেছে আগে-আগে। পরে খুলছে ভাবগত দিক। আগে বাইরের অবস্থা বদলায়, তার সঙ্গে বস্তুগত দিক বদলে যায়; তারপরে আনুষঙ্গিকভাবে বদলাতে থাকে আমাদের চেতনা বা ভাবগত দিক। ("A single and indivisible nature expressed in two different forms—material and ideal; a single and indivisible social life expressed in two different forms—material and ideal—this is how we should regard the development of nature and of social life.……The development of the ideal side, the development of consciousness, is preceded by the development of the material side, the development of the external conditions; first the external conditions change, the material side changes, and then consciousness, the ideal side, changes accordingly."—'Anarchism or Socialism')

স্ত্যালিনের মতের সঙ্গে প্যাবলবের মতের মিল রয়েছে মূলগতভাবে। বস্তুর পরিবর্তনে মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে তোলে। পৃথিবীতে সত্যের প্রকাশ এই রীতিতেই চলে আসছে।—দুজনের এই এক রূপই সিদ্ধান্ত। প্রত্যেক ব্যক্তি আমরা সাময়িক সত্য। বস্তুর বিচিত্র রূপ,—জড় ও জীবের সমাবেশস্থল এই সংসার। তার মধ্যে লীলায়িত আমাদের ধারাবাহিক বিশ্বসামাজিক চিরসত্য। এই তত্ত্বটিকে ভিত্তি ক'রে রাশিয়া থেকে কিছুদিন আগে প্যাবলবের জীবনের একখানি চলচ্চিত্র (Film) প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে দেখানো হয়েছে কেমন করে প্যাবলব জাগতিক সত্যকে একটি শাশ্বত যান্ত্রিক-নীতিরূপে প্রত্যক্ষ অনুভব ক'রে নিজের সাময়িক জীবনের সুখদুঃখ মান-অপমানের উর্ধ্বে উঠে বিজ্ঞান-সাধনার পরম আনন্দে নিমগ্ন থাকতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজের বিস্তার দেখবার আগ্রহে তিনি বহুদিন বাঁচতে চেয়েছিলেন ("I should like to live for years and years.")। বার্ধক্যে পৌঁছে আন্ত্রিক ব্যথায় তিনি কাতর হয়ে পড়েন। পেটে অস্ত্রোপচার করাবেন স্থির করলেন। সে দেশের

সমসাময়িক সব বড় বড় সার্জেন পিছিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁদের মনে দেখা দিল প্যাবলবের মহামূল্য জীবনের ক্ষতির আশঙ্কা। অবশেষে নিজেই প্যাবলব বিজ্ঞানের নামে সাহস দিয়ে তাঁদের ছুরি ধরালেন।

বিজ্ঞানই ছিল তাঁর সর্বস্ব। রাষ্ট্রদণ্ডে হাত বদল হচ্ছে। রুশিয়ার জার-তন্ত্র হঠে গিয়ে গদি ছেড়ে দিল বলশেভিকতন্ত্রকে। নেতা লেনিন দূত পাঠালেন গোর্খিকে। প্যাবলবের বাড়িতে এসে গোর্খি অভিনন্দন জানালেন, রাষ্ট্রীয় সাহায্যের প্রস্তাব করলেন। প্যাবলব শুধু বললেন, পথে কুকুর দেখছিনে, পরীক্ষা-কাজের অসুবিধা হচ্ছে। কুকুর জোগাতে পার? গোর্খিকে বিদায় দেবার মুখে ডেকে বললেন, তুমি তবু কিছু ধার্মিক আছ, আমি জীবনটা কাটালেম বাস্তবের পূজা ক'রে। ("One God……that's Mister fact.") Observation, observation and observation—এই হল প্যাবলবের কর্মপ্রচেষ্টার মূলনীতি। অনুরণিত হতে থাকে তাঁর এই শেষ বাণী: "যাকে বুঝতে চাও তাকে বার বার দেখো, অক্লান্তভাবে দেখেই চলো।"

ইঁদুর, কুকুর, বাঁদর প্রভৃতি পশুশ্রেণীর ক্ষেত্রেই প্যাবলবের মত বেশি প্রযোজ্য হয়েছে। অপরিণত-স্নায়ু-ও-বুদ্ধিশীল জীবদের ক্ষেত্রে তা খাটলেও অপেক্ষাকৃত উন্নত-স্নায়ু-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম-পরিণত-বুদ্ধির বয়স্ক মানুষের শ্রেণীতে তা সবদিক দিয়ে কতটা কার্যকর হবে, এখনো সে বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ হননি। তবে একথাও ঠিক, মানব সমাজের সকল ক্ষেত্রে না হোক, বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে এ মতের সাহায্যে সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব হ'লে তাও কম লাভের ব্যাপার নয়। কালে কালে আরো উন্নততর গবেষণায় এ মতের প্রসারে ক্রমশ স্তরে-স্তরে এর প্রয়োগের সীমাও যে না বাড়তে পারে এমন কে বলবে!

অবস্থানুগত প্রতিবর্তিতা (Conditioned Response) মতটি সম্বন্ধে জোয়াড্ (C. E. M. Joad) তাঁর "The Mind and its Workings" গ্রন্থে বলেছেন,—এক্ষণে কুকুরদের ক্ষেত্রে যা করা সম্ভব হচ্ছে মানুষের ক্ষেত্রেও তাই করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু মানুষের স্নায়ুজাল আরো বেশি জটিল এবং মানুষকে পারিপার্শ্বিক বাধাজনক উত্তেজনার হাত থেকে আলাদা করে সরিয়ে রাখা কঠিন,—এই সব কারণে, যাতে অবস্থার প্রভাব প্রতিফলনের নীতি-উপযোগী প্রক্রিয়ার যোগাযোগ ঘটে, তা ক'রে তোলা আরো দুরূহ। ছোটো ছোটো শিশুদের ক্ষেত্রেই পরীক্ষাগুলি সফল হতে দেখা গিয়ে থাকে। ("Now what can be done with dogs can be done also with human beings;

but owing to the greater complexity of the human nervous system and the difficulty of segregating the human being from all other distracting stimuli, it is much harder to establish the connexion between stimuli upon which conditioning depends. Experiments are most successful with small children.")

প্যাবলবের গবেষণা প্রাণিব্যবচ্ছেদের সাহায্যে সম্পাদিত হত। এজন্য জগতের অনেক মনীষীর নিকট এ কাজ নিন্দার্হ হয়েছে। কিন্তু দেখা যায়,—শেষাবধি হিংসা নিবারণ দ্বারা স্থায়ী শান্তি ও কল্যাণ স্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়েই প্যাবলব আপাত-হিংসাকে অপরিহার্য-বোধে আচরণ করে গেছেন; পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের প্রতিও নির্দেশ জানিয়ে গেছেন,—সিদ্ধিলাভ না হওয়া অবধি একইরূপে এই কাজ চালিয়ে যাবার জন্য।

এইচ্. জি. ওয়েলস্ প্যাবলবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, প্যাবলব ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে পরম হৃদয়বান; গবেষণা কাজের জন্য পোষা কুকুরদের প্রতি তাঁর মায়ামমতা খুবই আন্তরিক ছিল। কুকুরগুলিও তাঁকে এত ভালোবাসত যে সর্বদা তাঁকে ঘিরে থাকত। প্রাণিব্যবচ্ছেদ কথাটা শুনতেই যে নৃশংসতার কথা সাধারণত মনে উদয় হয়, কার্যত সে রকম আচরণ এ সব পরীক্ষা-স্থলে করা হত না। যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে নির্দয়তা ও ক্লেশ সৃষ্টি বাঁচিয়েই প্যাবলব তাঁর কাজ চালিয়েছেন। যেটুকু অস্ত্রোপচার না করলে নয়, সেটুকুই করা হত। কুকুরদের ঘা মানুষের ঘায়ের চেয়ে তাড়াতাড়ি সেরে যেত। কিন্তু এমন সহৃদয় লোক হয়েও সত্যের সাধনাক্ষেত্রে প্যাবলব ছিলেন একান্ত নির্বিকার। সেখানে প্রাণিব্যবচ্ছেদের ব্যাপারে তিনি অচল অটল একনিষ্ঠ, অধ্যবসায়ী গবেষক।

সমস্ত জগতে কার্যত মনস্তত্ত্বে ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্যাবলবের অবিষ্কার এনেছে যুগান্তর। কিন্তু ধর্মে, সমাজে, এমন কি রাষ্ট্রেও এর তত্ত্ব-প্রভাব যে দূর-প্রসারী,—এর প্রমাণ আপাতত দেখা যচ্ছে রুশ দেশে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীর মত আজ সেখানে রাষ্ট্রবারাও তাদের মত-প্রচার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সম্বধিত ও অনুসৃত হয়ে চলেছে।

মানুষের দেহযন্ত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি বাইরের পরিবেশের দ্বারা কিভাবে সামগ্রিকভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছে তার সুষ্ঠু বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের কাছে। ("The mechanisms of interaction of all functions of the body under the influence of the external environ-

ment."—Scientific Session on the Physiological Teachings of Academician I. P. Pavlov 1950, p. 34)। রুশদেশের সমসাময়িক সমাজের একদল লোক, এমন কি তাঁর সহকারী গবেষকদের-ও মধ্যে কেউ কেউ আত্মা উড়িয়ে-দেওয়া প্যাবলবকে তাঁর এই মতের জন্য সত্যদ্রোহী বলে নিন্দিত করেছিল। কিন্তু তাদের দ্বারা অনাদৃত প্যাবলবের মত-ই শেষে পৃথিবীতে নূতন সমাজের ভিত্ গাঁথবার কাজে লাগল। মানুষের উপর থেকে ঘুচিয়ে দিল সে মানুষের ঘৃণাবিদ্বেষের দৃষ্টি, মানব-দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে ফেলল সে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক নিয়ম-শৃঙ্খলার উপর।

অন্য পক্ষ হয়তো বলবেন, প্যাবলব সব-কিছুকেই যান্ত্রিক-প্রতিফলন নিয়মের কোঠায় ফেলে মানুষকে-ও যখন প্রতিপন্ন করেছেন যন্ত্র ব'লে, তখন মানুষের স্বাধীনতার গৌরব আর কী বাকি রইল। এর দ্বারা মানুষকে তিনি মানুষের শ্রেণীগত শাসন-জোয়ালের নীচে থেকে টেনে শেষে কিনা জড় প্রকৃতির যান্ত্রিক জোয়ালে জুড়ে দিলেন!

বার্নার্ড শ তাঁর শেষ বয়সে রচিত "Everybody's Political What's What?" গ্রন্থে প্যাবলবকে 'ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক মূঢ়তার প্রতিনিধি' ("Prince of pseudo scientific simpletons")রূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই পরিহাসোক্তি অনেকের কাছেই অন্যান্য বহু শ্লথ-ভাষণের মতোই হয় তো হাল্কাভাবে গৃহীত হবে। সে যা হোক, রুশদেশে প্যাবলবের প্রভাব আজ লক্ষণীয়। প্যাবলবের মতো লোকদের জীবনীগুলি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, প্রাকৃতিক বস্তু-বিচারের দিকে জগতের দৃষ্টি ধাবিত হচ্ছে। সত্য অলৌকিক হয়ে শুধু গল্প গুজবের খোরাক জোগাচ্ছে না। দৈব-অভিভূতির দ্বারা রহস্য-মণ্ডিত হয়ে থাকবার সুযোগ সব জিনিসেরই কমে আসছে। ক্রমেই বিশ্বপ্রকৃতি মানবের সবল স্বাভাবিক বুদ্ধিবিচার ও কর্মসাধনার অধিগম্য বিষয় হয়ে তার গভীর ঘনিষ্ঠতা লাভ করছে।

প্যাবলবের শারীরতত্ত্বের স্থূলবাস্তব পরীক্ষাগুলি থেকে আবিষ্কৃত প্রতিবর্তিতার সূত্রটি বস্তুবাদের দার্শনিক তত্ত্বেও প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। কীভাবে তা ঘটেছে, তা জানতে হলে এবারে প্যাবলবের মতের নীতিগত প্রভাবের দিকটা কিছু আলোচনা করা দরকার।

আজ দেশবিদেশের আলো এসে আমাদের চোখে পড়েছে। বিচার দ্বারা বুঝে নিতে হবে প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃত মূল্য। মনে রাখতে হবে, প্যাবলবের মতটি পৃথিবীতে এখন একটি বড়ো দেশের প্রধান শক্তিউৎস। প্যাবলবের

পরিবেশবাদ সেই শক্তিউৎসের রহস্যদ্বারের চাবিকাঠি বিশেষ। বস্তুগত-পরিবেশ-সৃষ্টি কম্যুনিষ্টদের একটি প্রধান নীতি।

বিষয়বস্তুর বণ্টন-অব্যবস্থা নিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এবং শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর দ্বন্দ্বের শেষ নেই। থেকে-থেকে যুদ্ধ দেখা দিয়ে জাগিয়ে তুলছে হিংসা। বোমা-কামানে চলছে হাতের মার, ব্যবসা-বাণিজ্য-মহাজনি যোগে চলছে ভাতের মার। হিংসার ছোঁয়া এড়িয়ে অনেকে খুঁজছেন অহিংসার পুণ্যপথ। পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন বাদ দিয়ে রুশিয়েরা চলেছে বিজ্ঞানের বাস্তব পথ ধরে। রুশদেশ থেকে যেমন বিস্ময়কর বাস্তবতার বাণী বয়ে আনছে এই প্যাবলবের জীবন, ভারতবর্ষে তেমনি আত্মিকতার উদ্দীপনা-উৎস জাগিয়ে রেখেছে অহিংসপন্থী মহাত্মাজির জীবন। মহাত্মাজি শুধু উপদেশ-দাতা নন, তাঁর জীবন-ও তাঁর মহৎ উপদেশের কর্মময় রূপ। সে কথার আলোচনা যথাস্থানে হবে। আপাতত আমরা দেখতে পাই যে,—নৈতিক দিক দিয়ে কমিউনিষ্টদের সাধনার সঙ্গে প্যাবলবের সাধনার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। প্যাবলবের মতো তারাও বলে,—শান্তি চাই। বলে,—সমাজে হিংসাটা হচ্ছে ভুল-মত ও ভুল-ব্যবস্থার আমদানি। পুরানো দিনের গতানুগতিক সংস্কার ও কাজের ধারা বদলানো চাই। অসমান বিষয়াধিকারের অসংগত নীতিই এজন্য দায়ী। স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনবার একমাত্র উপায় বৈষয়িক সম-ভোগবাদের নীতিতে নূতন সমাজ স্থাপন। চাই নূতন পরিবেশ। পুরোণো কায়েমি শক্তিগুলি একাজে হয়তো বাধা দেবে, কিন্তু পথ কেটে চলা চাই। হিংসা-অহিংসার মাপকাঠি ক্ষেত্র-অনুসারে বিচার্য। এমন কি, তাঁদের মতে অহিংস অবস্থা সৃষ্টি করবার জন্য স্থলবিশেষে প্রথম-প্রথম হিংসার অভিযান যদি দরকার হয়, সে-ক্ষেত্রে প্যাবলবেরই মতো খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মন নিয়েই মানুষকে সত্য-প্রতিষ্ঠার সেই কাজে অবিচলিতভাবে অগ্রসর হ'তে হবে।

আজ হিংসার সংঘাতে সংসার আলোড়িত। দুই দেশের দুইটি দৃষ্টিতে এই হিংসা ও অহিংসার ন্যায্যান্যায্য দু'রকমে বিচারিত হয়ে থাকে।

বিরুদ্ধতার থেকে ক্রোধ দেখা দেয়। ক্রোধই হিংসাকে ডেকে আনে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বুদ্ধি-বিচার দ্বারা নৈতিক আলোচনার ভাবাত্মক পথে বিরাগের কিছু প্রশমন করা চলে। কিন্তু মাত্র মনোভাব বদ্‌লালেই বিরুদ্ধতা সবসময় ঠেকানো যায় না। হিংসা-ও যে একএক ক্ষেত্রে কিরূপ অনিবার্য হয়ে ওঠে, এবং পরিবেশই যে তার মূল কারণ,—বিচারে তা প্রকাশ পাবে।

গ্রীষ্মকালে আগুনের তাপ যতটা বিরুদ্ধ ঠেকে, শীতের দিনে লাগে তার

বিপরীত। আবার গ্রীষ্মকালেই রান্নার দিক দিয়ে রাঁধুনির সেই আগুনের তাপ যত অনুকূল হয়, উত্তাপ-কাতর শ্রান্ত রাঁধুনির বিশ্রাম ও আরামের দিক দিয়ে আগুনটা তেমনি হয়ে ওঠে বিরুদ্ধ। আগুনের কিন্তু সর্বত্রই রয়েছে এক প্রজ্বলিত মূর্তি। দেশকালপাত্র অনুসারে অর্থাৎ পরিবেশে প'ড়ে দাঁড়াচ্ছে তার বিভিন্ন রূপ, কোথাও সে বন্ধু, সে আদরের জিনিস, আবার কোথাও সেই একই বস্তু হয়ে উঠেছে শত্রু,—তাকে বর্জন করতে পারলেই রক্ষা। তার কাজেলাগা-না-লাগাও নির্ভর করছে পরিবেশের উপরেই। পরিবেশই ঘটাচ্ছে তার গুণ দোষ, তার শ্রেণীভেদ, তার মূল্যের তারতম্য। বিশেষ ক্ষেত্রের একটি বিশেষ গুণের প্রাধান্য থেকেই বস্তুর এক-একটি বিশিষ্ট পরিচয় দাঁড়ায়। সমগ্র বস্তুটির সর্বাঙ্গীণ পরিচয় আমরা অল্পক্ষেত্রেই নিয়ে থাকি, বা পেয়ে থাকি। সে-পরিচয় নিতে গেলে জানা যেত,—এক বা একাধিক ক্ষেত্রে যে-বস্তু অনিষ্টকর, ক্ষেত্রান্তরে একইকালে সে হয়তো আগুনের মতো আলো বিকিরণ দ্বারা অন্ধকার দূর করার সম্ভাবনা ধারণ ক'রে শুভকরও হয়ে থাকে।

বস্তুর আংশিক কোনো ভালো বা মন্দ ক্রিয়ার জন্য সমগ্র বস্তুটির সমাদর করা বা ধ্বংস সাধন করা বিধেয় কিনা,—আধুনিক সাহিত্য-ও এ-প্রশ্ন উঠিয়েছে। বিশিষ্ট একটি মতই দাঁড়িয়েছে এই নিয়ে। বস্তুকে সমগ্র দিক দিয়ে বিচার ক'রে তবে তার মূল্য যাচাই হবে। বিশেষত, যে বস্তু সৃষ্টি করার শক্তি নাই তাকে নষ্ট করার আগে দায়িত্বের কথাটুকু মানুষের ভাবতে হয় বৈকি। হিংসা কোনো-কোনো ধর্মে বর্জনীয় হয়েছে, সে কি শুধু মৈত্রীভাবের উদ্দীপনায়, না, প্রাণ-সৃষ্টির অক্ষমতাটাও সে সঙ্গে বিচার্য হয়েছে, তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

যে-ক্ষেত্রে বিপক্ষের লোকগুলির মধ্যেও প্রিয়জনকে অনুভব করা গেছে সেক্ষেত্রে, তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও, তাদেরই রক্ষার তাগিদে, প্রত্যাঘাতে প্রতিনিবৃত্ত থেকে, নিজেকে অনেকে অকাতরে নিহত হতে দিয়েছেন। মতের মর্যাদা-রক্ষা ও কর্মের প্রসারের জন্য আদর্শের প্রেরণায়, প্রয়োজন-স্থলে দেহ বিসর্জনও ঘটে থাকে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট মতবাদ সংসারের কাজের পথে আমাদের এই বুদ্ধিই জোগাচ্ছে যে, আগুন সম্বন্ধে প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সাবধানতা অবলম্বন। তা সত্ত্বেও রান্নার বেলায় দৈবাৎ কাপড়ে আগুন ধরে গেলে বা হাত পুড়িয়ে ফেললে,—যেমন, আগুনটার প্রতি দোষারোপ বা রাগবিরাগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তাকে যেমন তখন অন্যকাজে লাগানো, স্থানান্তরে সরিয়ে ফেলা বা নিবিয়ে দেওয়াই হয়

শ্রেয়, তেমনি বাঘকে কিংবা বাঘ জাতীয় বিরুদ্ধ পক্ষকেও বস্তু-ধর্মের তাগিদে হত্যা-ক্রিয়া-ঘটানোর উপলক্ষ মাত্র ব'লে জানতে হবে। তাকেও সাবধানে এড়িয়ে যাওয়া বা গত্যন্তরাভাবে দরকারবোধে নির্বিকারভাবে হত্যা করাই হবে শ্রেয়।*

বাঘ জীবজগতের পক্ষে সর্বনাশী। সেখানে সে আগুনেরই মতো প্রকৃতি-চালিত হিংসাগুণের একটি যান্ত্রিক কেন্দ্র-বিশেষ। কিন্তু তারও মধ্যে অন্য গুণের সমাবেশ রয়েছে; সে তার সন্তানের মাতা হিসাবে জীবধর্মে অপত্য-স্নেহের আধার। বলবিক্রমের কেন্দ্র তো বটেই। কিন্তু বিশেষ পরিবেশে তার মারাত্মক গুণটি একান্ত হয়ে যখন দেখা দেয়, তখন একটি প্রাণী থেকে বহু প্রাণের সর্বনাশ ঘটাবার অবকাশ রোধ করাটাই হয়ে থাকে অব্যবহিত কর্তব্য। পরিবেশকে নিরাপদ রাখতে এরূপ ক্ষেত্রে হিংসার আশ্রয় অপরিহার্য হয়ে ওঠে, একথা সত্য। কিন্তু এও দেখা গিয়েছে, লোকের মনে অর্থাৎ পরিবেশের মধ্যে ভয় বা হিংসাভাবের অস্তিত্ব না থাকলে অনেক সময় বিপক্ষেও হিংসার উদ্রেক হয় না। এ কেবল ভারতের পুরাকালীন কাব্যপুরাণে বর্ণিত অহিংস আশ্রম-পরিবেশের কথা নয়; কচিৎ যদিও ঘটে, তবু ব্যাঘ্রগহ্বরে পালিত মানব-শিশুর বাস্তব বিবরণ† আজো মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে সে সত্যকেই সূচিত করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হিংসাই হিংসার একমাত্র প্রতিষেধক না-ও হতে পারে। এজন্যই হত্যার পূর্বে দেখা চাই, বাঘকে না মেরে পারা যায় কি না। সার্কাসের বাঘকে শোনা যায় খেলোয়াড় তার চাবুকের ডগায় বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগিয়ে বাধ্য করে এদিক-ওদিক চল্‌তে। সহজ উপায়-ও আছে, যথা—হৈ-হল্লোড় করা, বা আগুন দেখানো। যে ভাবেই হোক, বাঘটাকে তার নিজস্ব পরিবেশে বনে-বাদাড়ে তাড়ানো অসম্ভব নয়। মানুষের নিজের দিক থেকেও কোনো উপায়ে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব কিনা তাও সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেতে পারে। কোনো-কোনো দেশে খুনী আসামীকে ফাঁসি না দিয়ে তার পরিবর্তে তাকে শিক্ষাপূর্ণ পরিবেশে রেখে তার অন্তরীণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শাসনের পরিবর্তে সংশোধনই এর উদ্দেশ্য। এ সবই অহিংসার সূচনা। এসব প্রবর্তনার মূলে

* শত্রুকে যদি শত্রু ব'লে তাকে দ্বেষ না কর তবে তার বিরুদ্ধে হাত চালাবে কী ক'রে? রাস্তায় পাথর পড়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালাই যেমন ক'রে, অপ্রমত্ত বুদ্ধি নিয়ে।......"—চার-অধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ।

† "ব্যাঘ্রজননী কর্তৃক পালিতা মানবকন্যা" (অমলা ও কমলা) ১৯২০ সনের ঘটনা।—"হিমাদ্রি" সাপ্তাহিকে প্রকাশিত। ২৮ মার্চ, ১৯৫২ তারিখের সংখ্যাটি দ্রষ্টব্য।

প্যাবলবের আবিক্রিয়ার পারিবেশিক প্রতিফলননীতি লোকের অগোচরে সূক্ষ্মভাবে কাজ করে চলেছে কি না, তা বিবেচনা-সাপেক্ষ। কারণ, এ সব ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবই হচ্ছে মূল অবলম্বন। বাহ্যিক বিষয়ের সংস্থানকে মুখ্য ক'রে হিংসাকে অহিংসার দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে কম্যুনিষ্ট রুশ, —আমাদের দেশে তার বিপরীত পথে, অর্থাৎ বস্তুভারের উপর নির্ভর কমিয়ে মনঃশক্তির সাধনাকে মুখ্য ক'রে চলেছেন কর্মযোগী গান্ধিজী। আধুনিক কালে তাঁর সত্যাগ্রহের ইতিহাসও সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পরিবেশ তাঁর পক্ষেও দরকার। সে পরিবেশ বেশির ভাগ মানসিক। মানুষের বাইরের অবস্থা হবে সেখানে বস্তুভারহীন; কিন্তু ভিতরে মানুষ হবে সংবেদনশীল সবল মনোভাবে সমৃদ্ধ। এই হল গান্ধিজীর 'সর্বোদয়ে'র পথের পরিচয়।

গান্ধিজীর কর্মনীতি চলছে প্রধানত মানুষের নৈতিকবোধের উন্নতি চেয়ে। যাদের বোধ সেই স্তরের উপযোগী, তাঁরাই তাঁর অনুগামী হয়ে চলেছেন। এই সঙ্গে রুশদেশের বস্তুগত-পরিবেশসৃষ্টির নীতিও পাশাপাশি বিচার্য। এদেশেও সেই নীতি আজ প্রভাব ছড়াচ্ছে। সমাজের একটা অংশ এই নীতিরই যখন পরিপোষক, তখন পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে, সংসারে যতক্ষণ এই স্তরভেদ বর্তমান আছে ততক্ষণ বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের জন্য বিভিন্ন মতের আবশ্যকতাও স্বতঃসিদ্ধ। সকল মানুষের পক্ষে একটি মাত্র নীতির প্রয়োগ কার্যকর না-ও হতে পারে। হয়তো এইটেই বেশি সত্য হয়ে দাঁড়াবে যে, সমাজের পক্ষে বিশেষ-বিশেষ সময়ে বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে দুটি নীতিরই যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। কারণ, মানুষের স্বভাব বিচিত্র। তাকে কোনো বিশেষ পথে পরিবর্তিত করতে হলে তার প্রতিবেশ চাই স্বতন্ত্র রকমের।

এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে যেখানেই আমরা কেবল মানুষের নৈতিক বোধের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছি, সে সব ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল ফলছে না। গান্ধিজীকে তাঁর আদর্শের অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ধৈর্য ধরে কাজ করতে হয়েছে। প্রাক্-স্বাধীনতার পরিবেশে চোরা-বাজারীদের ফাঁসি দিয়ে সমাজকে ভালো করবার কথা নেহেরুজী খুবই বলেছিলেন, পরে তাঁকেই আবার ঘুরিয়ে বলতে হল,—চোরাবাজার কোথায়-না চলে! ভিন্ন পরিবেশে জওহরলালের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিও পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে মত স্থির রাখতে পারলেন না। এতেই বুঝতে পারি পারিবেশিক বিপ্লবের প্রয়োজন কতদূর। আর কতই তা কঠিন! প্রায় গর্ডিয়ান-গেরো কেটে ফেলার মতোই

ব্যাপার। খোলা নাকি যায় না। কিন্তু সে গেরো কে কাটবে? কে শক্তি-প্রয়োগ করবে? আত্মবান্ ব্যক্তি? না সাকার পরিবেশ?—এ তর্কের আশু কোনো মীমাংসা নেই। না থাক্,—যে কোনো একটি পথ বেছে নিয়ে এগিয়ে চলাটাই দরকার।

বস্তুবাদীরা বলেন, অন্ধকারকে তাড়াতে গিয়ে শূন্যের মধ্যে আমরা ঘুষোঘুষি ক'রে মরছি কিনা তা দেখা দরকার। ঘরে আলো চাই। সেজন্য একটি দেশলাই-কাঠি জ্বালানো আবশ্যক। তা না ক'রে, হাজারও যদি মাথা খুঁড়ে মরি,—সে কেবল পণ্ডশ্রম এবং সময়কে জলে দেওয়া হয় মাত্র। ভুল প্রণালীর লক্ষবার নিখুঁত পুনরাবৃত্তিতেও এক কণা সফলতা মেলবার কথা নয়। নৈতিক আহ্বানে সাড়া দেবার লোক সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প। বাদবাকী অধিকাংশ লোককে উন্নত ক'রে তোলবার পক্ষে বাইরের পরিবেশের মধ্যেও প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর বিধি-মতো সংস্থান এবং সে সঙ্গে শিক্ষা ও উৎসব অনুষ্ঠানাদি ক্রিয়ার সামাজিক প্রবর্তন ঘটানো দরকার; তা না ক'রে, কেবল ব্যক্তির ভিতরের দিকের স্বাধীন ধর্মবুদ্ধির উপর সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নির্ভর করলে, ভুলই হবে। স্বাধীন বুদ্ধি ব'লে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব আছে কিনা, তাই নিয়েই এখন কথা উঠছে। প্যাবলব তো পরিষ্কারই বলেছেন,—স্বাধীন চৈতন্য ব'লে জিনিস আদৌ নেই। যা আছে এবং যার থেকে সব কিছু কাজ হচ্ছে, সে বস্তুটি হচ্ছে একটি প্রাকৃতিক নীতি,—তারি নাম যান্ত্রিক প্রতিফলন-ক্রিয়া, বাইরের পরিবেশের উপরেই তার একান্ত নির্ভর।

প্যাবলবের মতবাদ সম্বন্ধে একজন নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত প্রায় সামসময়িক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। "ম্যান দি আন্‌নোন্" (Man the Unknown) নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থে ডাঃ অ্যালেক্সিস্ ক্যারেল (Alekis Carrel) একস্থলে যা বলেছেন, তার মর্মানুবাদ এই,—"প্যাবলবের পরিভাষা অনুসারে Conditioning-এর অর্থ হল কয়েকটি অনুষঙ্গী মনক্রিয়ার প্রতিষ্ঠা-মাত্র (establishment of associated reflexes)। এতকাল ধ'রে সার্কাসী পশু-শিক্ষককের দল যে-সব মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ ক'রে এসেছে সেটাই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পন্থার চেহারা নিল প্যাবলবের আবিষ্কারে। এই জাতীয় Reflex গঠনের মূলে থাকে একটি অপ্রিয় বস্তুর সঙ্গে একটি বিরোধী প্রকৃতির কাম্যবস্তুর সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠা। ঘন্টার বা বন্দুকের আওয়াজ এমন কি বেত-ছড়ির আওয়াজও কুকুরের কাছে তার কাম্য খাদ্যের সমতুল্য আনন্দদায়ক হ'তে পারে। মানুষের মধ্যেও এই প্রবৃত্তিটি দেখা যায়। অজানা বিদেশ-

পর্যটনের আনন্দে মানুষের কাছে খাদ্যাভাব বা অনিদ্রাও তেমন প্রকটভাবে পীড়াদায়ক মনে হয় না। শারীরিক কষ্ট বা দুঃখানুভূতি অতি সহজে সহ্য করা যায়, যদি তার সঙ্গে থাকে কোনো সাফল্যবোধ বা কামনাপূর্তির আনন্দ। ... ...এমন কি মৃত্যুর সঙ্গেও যখন কোনো মহৎ adventure-এর অনুষঙ্গ উপস্থিত থাকে, তখন সেও তার সহাস্যমূর্তিতে দেখা দেয়—সে-মৃত্যু আত্মদানের সৌন্দর্যাবলেপে রমণীয়, আত্মার ঐশ্বরিকতায় উদ্দীপ্ত।..."

পরিশেষে, দু'একটি কথা ভাববার থাকে। পরিবেশের বস্তুপ্রভাবে মানসিক-ক্রিয়া এবং সেই অনুসারে বাহিক ইন্দ্রিয়চেষ্টাও প্রভাবিত হয়,—এইটিই যদি বিশ্বসৃষ্টির মূলনীতি ধরা যায়, তবে তার ফলে এ কথাই স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় যে, পৃথিবীতে যা-কিছু ঘটছে, সবই তা কোনো-না-কোনোভাবে দিনেদিনে ঘটে-আসা পারিবেশিক বস্তুপ্রভাবেরই স্বাভাবিক ফল। দরিদ্রের দারিদ্র্য যেমন, ধনিকের ধনিকতাও তেমনি পরিবেশের প্রভাবেই মানুষের মধ্যে সৃষ্ট হয়ে চলেছে। তাহলে একথা বলা অযৌক্তিক হবে যে, বিশেষ কোনো দেশের বিশেষ কোনো নীতি হচ্ছে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বা খেয়ালমতো এক অস্বাভাবিক সৃষ্টি; কিংবা হিংসা নামক জিনিসের প্রসারের জন্য কোনো বিশেষ দেশের কোনো কৃত্রিম ব্যবস্থাই মাত্র দায়ী। একথা বলা দ্বারা কেবল পারস্পরিক দোষারোপের প্রবৃত্তিই প্রশ্রয় পায়, হিংসাবিদ্বেষের পরিবেশ তাতেই আরো বাড়ে। আমাদের মনে রাখতে হবে—"যে আদর্শ অন্য আদর্শের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তাহা আদর্শই নহে।" (রবীন্দ্রনাথ, সমাজভেদ প্রবন্ধ, স্বদেশ গ্রন্থ, ১৩০৮)

ভারতবর্ষে জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রমধর্মের সৃষ্টি দ্বারা গুণ ও কর্মের দিক দিয়ে সম-স্তরের লোকদের এক-একটি প্রতিবেশ গড়ে' তুলে, বিশাল মানবসমাজকে মোটামুটি চারটি বড়ো ভাগে ভাগ করে দিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমিয়ে শান্তি স্থাপনেরই পথ খোজা হয়েছিল কিনা এ বিষয়ে ভালো ক'রে অনুসন্ধান হওয়া দরকার। তথ্যের উল্লেখ রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে'র বিশ্লেষণাত্মক বাণীতে—"ভারতবর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়া সমাজকলেবরকে এক এবং বিচিত্র কর্মের উপযোগী করিয়াছিল—নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধ-বিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া রাখিতে দেয় নাই। পরস্পর প্রতিযোগিতার পথেই সমাজের সকল শক্তিকে অহরহ সংগ্রামপরায়ণ করিয়া তুলিয়া ধর্ম কর্ম

গৃহ সমস্তকেই আবর্তিত আবিল উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখে নাই। ঐক্য নির্ণয়, মিলন সাধন, এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তিলাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল।…ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানব-জাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে।…যে সমাজে শৃঙ্খলা আছে, ঐক্যের বিধান আছে, সকলের স্বতন্ত্র স্থান ও অধিকার আছে, সেই সমাজেই পরকে আপন করিয়া লওয়া সহজ। হয় পরকে কাটিয়া-মারিয়া-খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সুগৃহীত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া, এই দুই রকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মানব-সভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।" (ভারতবর্ষ, ১৩০৯)

নানা কারণেই ভারতবর্ষ এখন জগা-খিচুড়ির দেশ হয়ে পড়েছে। তার পূর্ব আদর্শের উপযোগী পরিবেশ এখন আর এখানে অটুট নেই। নানা 'ইজ্‌মে'র সঙ্গে কম্যুনিজমের নামও এখানে খুবই শোনা যাচ্ছে। কালের পরিবর্তনে সর্বত্রই এরূপ যোগাযোগ ঘটে থাকে। আমেরিকায় বা রুশিয়ায়ও ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির সম্পর্কে আগ্রহের উদ্দীপন বা জ্ঞানের প্রসার ঘটেছে। কোনো আদর্শই কোনো বিশেষ দেশের বা মানুষের একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি নয়। অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে উঠলেই তদনুরূপ আদর্শ নানা স্থানে দেখা দেবে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় অবধি সে কারণেই কম্যুনিজমের গতি কেউ রোধ করতে পারছে না। অবস্থার উপযোগী কারণ বর্তমান থাকলে ভারতবর্ষে কম্যুনিজম্‌ বিস্তৃতি লাভ করবে, তা আশ্চর্য নয়। তবে এইটুকু আমাদের করা উচিত, এদেশে অতীতে যে-সব সমাজসংগঠনের বিচিত্র চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভূত হয়েছিল, তাদের বিষয় বিশদভাবে আগে জেনে নেওয়া ভালো। সে সব আদর্শ ও উদ্যোগের ভালোমন্দ পরিণতিফল নির্ণীত হলে এদেশের পরিবেশে বস্তুবাদী কম্যুনিজমের প্রয়োগ সম্বন্ধেও আমরা হুঁশিয়ার হতে পারব। কে জানে, হয়তো আত্মা বা ঈশ্বর-বিমুখ প্যাবলবকেও সে সঙ্গে আমাদের তত বিজাতীয় ব'লে অবাঞ্ছিত না ঠেকতে পারে। আমরা আরেকদিক থেকে পর্যবেক্ষণ ক'রে এগোতে

এগোতে মানুষকেই সৃষ্টির চরম বাস্তব অভিব্যক্তির বিষয় ব'লে জানব। ভাববাদী-ধারার উদ্গীত সত্যকেই আরেকভাবে বস্তুবাদী ধারার মুখে প্রতিভাসিত হতে দেখব। এবং এতদিন দেশে যে শুনে আসছি—

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

এই মহতী বাণীরই পরিপূরক ব'লে মনে হবে, যখন প্যাবলবের ভাষায় বিজ্ঞানকে বলতে শুনব : "প্রকৃতির সর্বোত্তম আত্মপ্রকাশ ঘটছে মানুষেরই মধ্যে। পৃথিবীতে অমরতা শুধু তারই প্রাপ্য—কর্মে ও মানবতায় সে মৃত্যুহীন।" ("Man is the supreme manifestation of Nature. He alone is deathless on earth—in deeds and in humanity.")

পরিবেশের গুণে সত্যের রূপ প্রতিফলিত হয়। সেই পরিবেশের সমস্ত রহস্য বাইরের থেকে সকলের পক্ষে সব সময় বোঝার উপায় নেই। বোঝবার সাধনাই মানুষ করতে পারে আর সেইটিই হল তার কাজ। একাজে কোনো পূর্বসংস্কারের একান্ত অন্ধবশবর্তী হয়ে চললে সত্যকে পাওয়া দুষ্কর। দেশ-কাল-পাত্র-গত পরিবেশের অনুপাতেই সকল কিছুই বিচার ক'রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যারা তা না করবে তারা দুর্বল। প্যাবলব বলেন, সত্য দুর্বলকে ধ্বংস করে ("Truth kills the weak")।

তবে প্যাবলবপন্থী বিজ্ঞানীদেরও প্যাবলবের যুক্তি-অনুসারেই বলা চলে যে, মতের গোঁড়ামির দুর্বলতা তাঁদেরও না পেয়ে বসলেই ভালো। কারণ, পরিবেশের গুণে সত্য কোথায়-যে কোন্ নিগূঢ় কারণে কত কী রূপে প্রতিভাত হয়, তার সবদিককার চরম সন্ধান জেনে সে-বিষয়ে শেষকথা কোনোদিন কেউ বলতে পারবে কি না, সেখানে চিরকালই হয়তো মনুষের সন্দেহ থেকে যাবে। আর, সেই সন্দেহের উপরেই চলবে জ্ঞানবিজ্ঞান 'কর্ম ও প্রেমে'র আকুলি-ব্যাকুলি অনুসন্ধান। সেই তো মানুষের শাশ্বত জয়াভিযান। সেইটিই আসলে প্রগতি।

সত্যের বিশেষ-বিশেষ রকমের বাস্তব-সব পরিচয় বিজ্ঞান আমাদের গোচরে এনে ধরতে পারে। কিন্তু সেই পরিচয়ই তো সব নয়, ভাবের দিককার পরিচয়ও আছে, তা স্বতন্ত্র রকমের। সত্য সেখানে বিশেষ দৃষ্টিকোণ হতে পরিলক্ষিত হয়ে আরেক রহস্যজালে সৌন্দর্যরসমণ্ডিত হয়ে থাকবে চিরদিনই। সত্যের সে-পরিচয় দেওয়ার অধিকারী যাঁরা, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও প্রকাশ-প্রণালী বৈজ্ঞানিকদের বাস্তব প্রণালীর সঙ্গে যদি মেলে ভালোই, না মিললে, শেষ পর্যন্ত যাঁর যাঁর রুচি, বিশ্বাস ও

বিশেষ উপলব্ধির ভালোমন্দের উপরেই তাঁদের গতিবিধি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় কী।

বিজ্ঞানের বলে বিমানে আমরা চড়ব। কিন্তু পুষ্পকরথের বর্ণনাসমৃদ্ধ পৌরাণিক কাব্যরস আস্বাদনেও আমাদের বাধবে না। অনেক সময় এ-ও দেখা যায়, বাস্তবে যেটা ঘটে, অনুভূতিতে তার ছায়াপাত হয় পূর্ব থেকে। কোন্ নিগূঢ় কারণে এরূপ হয়ে থাকে, মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা তা নিয়ে গবেষণা করবেন, কিন্তু তার কারণ আবিষ্কারের আগে থেকেই এ রকম ঘটনা চিরকাল যে ঘটে আসছে, একথা সকলেই জানেন। রূপক আকারে হোক, বা এই পূর্বগামিনী ছায়াপাতের আলেখ্য হিসাবেই হোক,—বিজ্ঞান ছাড়াও উপলব্ধির আরেকটি পথে সত্যের প্রকাশ এরূপেও যদি ঘটে, তাকে অস্বীকার করতে পারি কোন্ পরিপূরক লাভের আশায়। তা হলে, শিল্পসাহিত্য ও মানবস্বভাবের বিচিত্র ঐশ্বর্য থেকেও আমাদের বঞ্চিত হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে কিনা, তাও বিবেচ্য।'

তবে অন্যদিক থেকে, আরেকটি কথাও ভাববার আছে। বৈচিত্র্যমূলক সমাজব্যবস্থার ফলে এতকাল আমরা যে-সম্পদসম্ভারই যেদিক দিয়ে পেয়ে আসি না কেন, তার তুলনায়, পৃথিবীতে লোকের দুঃখযন্ত্রণার ভার আবার কতখানি বেড়েছে—সেও দেখতে হবে। সে-স্থলে যদি সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় আমাদের অধিকাংশের দুঃখের লাঘব ঘটে, তবে তাতেই বা আমাদের আপত্তির কারণ থাকবে কেন? নূতন সমাজব্যবস্থায় নূতন সম্পদেরও যে নূতন নূতন সম্ভাবনা না দেখা দেবে, তারই বা ঠিক কী।

একদিক থেকে মনে হয় পুরোনো পথ শ্রেয়, কারণ, পুরোনো পথের পরিচয়টা জানা আছে; সেরূপ আবার, নতুন পথ অজানা হলেও ঠিক এই কারণেই তাকে সৃষ্টি করে নেবার গৌরবটাও কম লোভের বিষয় নয়। পুরোনো পথে যারা দুঃখ-ভোগী, নতুন পথে দুঃখের আশঙ্কা থাকলেও তারা সে পথে ভাগ্যান্বেষণে গিয়ে যে একবার ভিড়বে, এও খুবই স্বাভাবিক। ধর্ম ও সাহিত্যাদির দ্বারা অনুশাসিত পুরোনো পথ এবং বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যবস্থিত নতুন পথের মধ্যে এই মতদ্বৈধের গোলযোগ আজ অল্পবিস্তর সব দেশেই ঘনিয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য:

"বিজ্ঞান যে বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্তন করেছে সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের—এই জন্যেই মানুষকে তাতে দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকল রকম দুঃখ দৈন্য পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর করবার জন্যে সে অস্ত্র গড়েছে, মানুষের

অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান। কিন্তু, এই বিজ্ঞানই কর্মের রূপে যেখানে মানুষের ফল কামনাকে অতিকায় ক'রে তুললে সেইখানেই সে হল যমের বাহন।...থামাতে হবে লোভ। সে কি ধর্ম-উপদেশ দিয়ে হবে। তাও সম্পূর্ণ হবে না। তার সঙ্গে বিজ্ঞানেরও যোগ চাই। যে-সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক থেকে দমন করে সে-সাধনা ধর্মের, কিন্তু যে-সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে-সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধির আজ মিলনের অপেক্ষা আছে।" (যাত্রী, পৃঃ ১৭৮-১৭৯)

ভারতবর্ষের গান্ধীবাদ ও রুশদেশের সাম্যবাদের মধ্যে হিংসা ও অহিংসা এবং ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে বিরোধের মতো, দুয়ের কার্যপ্রণালীর মধ্যে অন্যদিক দিয়েও প্রভেদ বিদ্যমান। বাইরের বাস্তব পরিবেশ সকলের পক্ষেই এক রকম ক'রে দিয়ে সকলকে এক-অবস্থায় রেখে শিক্ষিত করা ও একই রীতিতে জীবনযাপন করার জন্য একই আইনে পৌরসমাজ নিয়ন্ত্রিত করা,—এই উদ্দেশ্যটি কার্যকর রূপ গ্রহণ করেছে কম্যুনিজমের কেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতির মধ্যে। তার থেকে ঘটেছে সে-দেশে কল-কারখানা ও কমিযুনের বিস্তার। এ দেশের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির চিন্তা ও কাজের মধ্যে দেখা যায় সমাজের সমষ্টি-জীবনকে সুগঠিত করার লক্ষ্য ঠিক রেখে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকেও অক্ষুণ্ণ রাখার একান্ত প্রয়াস। পাছে সেটি সমষ্টির চাপে কোনোদিক দিয়ে চাপা পড়ে, এজন্য তাঁরা কিছু শঙ্কিতও বটেন। তাঁরা মনে করেন, সমাজের বর্তমান অবস্থায় স্বভাবত সকল মানুষ সমান নয়। অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত এই অসাম্য বর্তমান আছে ততক্ষণ লোকের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব-বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্য ও তার স্বাধীন বিকাশের সুযোগ ক'রে দেবার জন্য, এক-একটি স্বতন্ত্র পরিবেশ দরকার। এজন্য বিকেন্দ্রীকরণ-প্রথায় ছোটো ছোটো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত। সেই ধারণার বশেই স্বদেশী আমলের থেকে দেখা দিল এদেশে ছোটো ছোটো আশ্রমিক শিক্ষানিকেতন ও কুটীর-শিল্পীদের বিকেন্দ্রীকৃত কর্মশালার প্রবর্তন। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজী দুয়েরই সাধন-স্থল ছিল বিকেন্দ্রীকৃত ধারার দুটি প্রতিষ্ঠান।

গায়ের জোরের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া, কবে যে বাস্তব পরিবেশের সহজ প্রভাবে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ভিতর থেকে একাকার ক'রে তোলা যাবে, কিংবা, ব্যক্তি কবে যে আপন স্বাতন্ত্র্যকে সমষ্টিবদ্ধ সামাজিক প্রগতির পথে কোনোদিক দিয়ে বাধাজনক না ক'রে সানন্দে সেই পথে নিজেকে সহায়ক করতেই যত্নবান

হবে, এই চরম পরীক্ষার দ্বারাই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে হবে দু'দেশের দুটি ধারার। বাহ্যিক বা আত্মিক যে ভাবেরই হোক না কেন, এ দু'য়ের মধ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন যখনই যার ক্ষেত্রে অনুভূত হবে,—সেখানে তখনই একজনের কথা সকলের স্মরণে আসবে,—তিনি আমাদের এই আলোচনার মধ্যমণি,—"পরিবেশের প্রভাব"-নীতিবেত্তা মহামতি প্যাবলব।

দুঃখবাদের প্রতিবাদপূর্ণ, পৌরুষাত্মক উদ্দীপনায় সমৃদ্ধ প্যাবলবের বাণী। আশা, উদ্যম ও আনন্দের আকর্ষণে তা আমাদের উদ্বোধিত করে। কাজের পথ দিয়ে তাতে আমাদের নিয়ে যায় সুচির মানবধারা-সংগমের দিকে।

মানবসমাজগঠনের প্রাথমিক ক্ষেত্র হচ্ছে গৃহ, পরবর্তী ক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষায়তন-গুলি। এই দুই ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের সঙ্গ মানুষকে গড়ে তুলতে কতখানি সহায়ক হয়ে থাকে তা সকলেই স্বল্লাধিক অবগত আছেন। জন্মগত স্বভাবকে বা ভাগ্যদেবতা নামক দৈবনির্দিষ্ট অলক্ষিত বিধানকেই জীবন-ধারা নিয়ন্ত্রণের অমোঘ কারণ ব'লে অবিসম্বাদিতরূপে ধ'রে না নিয়ে, পরিবেশকে উদ্দেশ্যানুকূলে সুসংস্কৃত ক'রে তুলে নেবার অধ্যবসায়ের মধ্যেই মানুষের সৃষ্টিশীলতার ন্যস্ত দায়িত্ব পালিত হয়। কেন না, পার্থিব সীমায় মানুষ যখন থেকে জন্ম নিয়েছে তখন থেকেই সে দেখে থাকে সৃষ্টি বা প্রকাশের বহু বিচিত্রধারা তাকে ঘিরে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত। এই প্রকাশের ধারাকেই সাধ্যমতো উপলব্ধি ও পরিণতি দান করার কাজ পরমধর্মরূপে স্বতই মানুষের সম্মুখে চিরদিন বিরাজিত রয়েছে। জ্ঞানে ও কর্মে সাধ্যের সীমা তার কতদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, মানবসভ্যতা ক্রমাগত তারই জরিপ করে চলেছে। সাধ্যের অন্তর্গত নিয়ন্ত্রণাধীন উপাদানগুলির অন্যতম হচ্ছে পরিবেশ ও সঙ্গ। এ দুয়ের ওপারে ভাগ্যের অ-দৃষ্ট লীলাভূমি। কিন্তু আমরা দৃষ্টিভ্রমে অনেকেই সাধ্যের সীমার মধ্যেই ভাগ্যের অধিকারকে প্রশস্ত ক'রে দেখে অমূলক তার দাস হয়ে থাকি। এই ক'রে সম্ভাব্য সুযোগ এবং সফলতা দুই থেকেই বঞ্চিত হয়ে দুর্গতি ভোগ ক'রে চলি।

পরিবেশের প্রভাবনিয়ন্ত্রণের জাদুদণ্ডের সন্ধান দিয়ে প্যাবলব নবীন শিক্ষার্থী সম্প্রদায় এবং পরিণত শ্রেণীর মানব-সাধারণকে আত্মসম্বল ও আত্মসম্মানের মাহাত্ম্যে সচেতন করে তুলেছেন। সকলকে মুক্তি দিয়েছেন তাদের আপন নিখিল শক্তিস্বরূপের সঙ্গে সহযোগসাধনের সম্ভাবনাময় পথে। বিশেষত যারা মূর্খ, অক্ষম, অভিশপ্ত ব'লে নানা ক্ষেত্রে নানা চেষ্টা ও প্রাপ্য ফল থেকে অবজ্ঞা বা ঔদাস্যে বর্জিত হয়েছে,—উপাদান, পরিবেশ, প্রণালী ও সঙ্গের সংস্কার সাধন দ্বারা তাদের উন্নতির যোগ্যতা

হয়েছে প্রমাণিত—এইটি যদি লোকে চাক্ষুষ দেখতে পায় তবে অন্ধের দৃষ্টিলাভের মতো সে ঘটনা কি মানুষের কাছে এক নবজন্ম নিয়ে আসবে না ?

শিশুকে মানুষ করবার সময় থেকে, তার সহজ প্রতিভা ছাড়াও প্রতিবেশের প্রভাবের কথা এই জন্যই বরাবর স্মরণ রাখা দরকার। প্যাবলব এই বাস্তব দিকটাতেই বিশেষ ক'রে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রেও এইজন্যই প্যাবলবের মতবাদের অনুশীলন তার সার্থকতা বিচারের অপেক্ষা রাখে।

শিক্ষার আধুনিক বাহন

অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যুগ্মদান আশ্চর্যরূপে ফলপ্রদ হয়। কিন্তু অপব্যবহারে লেগে সমাজকে তা ধ্বংসের ইন্ধনই বেশি জোগাচ্ছে। এই যুগ্মদানেরই যা ফল, জনশিক্ষার উপযোগী আধুনিক সুপরিচিত সেরূপ বিষয়ের মাত্র কয়েকটির কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাচ্ছে : প্রথমটি সংবাদপত্র, দ্বিতীয়টি সিনেমা, তৃতীয়টি রেডিয়ো ; এ সঙ্গে আরো দু'টি বিষয়ের কথা বলা দরকার, দুটিই পুরোনো, কিন্তু নূতন ক'রে এখন আবার তাদের চর্চা হচ্ছে,—একটি কুটীর শিল্প, অন্যটি সংগীত।

দেশে সংবাদপত্রের প্রচলন আজকাল বাড়তে শুরু করেছে। দেশবিদেশের সঙ্গে যোগের অন্যতম সহজ উপায় এই সংবাদপত্র। একে শিক্ষার বাহন করতে হলে এর সংবাদ-পরিবেশন থেকে সম্পাদকীয়-নিবেদন অবধি সকলই নিরপেক্ষ, সহজবোধ্য এবং যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করা চাই। সুস্থির মতের পূর্বাপর সংগতিপূর্ণ সম্পাদকীয় রচনা দুর্লভ। বিজ্ঞানের বিষয় লেখা হলেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় ফুটে ওঠে না ; সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার আদর্শের দিকে ধাপে ধাপে যা চালিত করে নিতে পারে, পরিবেশের পক্ষে যা নিতান্ত আজগুবি ব'লে অনাদৃত না হয়, বা অপরপক্ষে যাতে লোককে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে রহস্যোন্মাদ ক'রে না তোলে, এমন খবরই জোগাতে হবে। এখন খবরের কাগজ হয়ে আছে—ব্যবসায়ের উপলক্ষ, আর না হয় দলীয় প্রচারের যন্ত্র-বিশেষ। উত্তেজনায় মাতিয়ে তুলতে পারার চেয়ে সর্বাঙ্গীণ জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির উদ্রেক করাতেই সংবাদপত্রের সার্থকতা।

সিনেমার রাজত্ব সর্বত্র। ছবি দেখেনি এমন লোক পাড়াগাঁয়েও মেলা ভার। সংবাদপত্র পড়তে পারে না অনেক লোকই,—কিন্তু সিনেমা দেখতে তেমন বাধা নেই ; বাধা দেয় পয়সায়। না খেয়েও লোকে সিনেমা দেখে নিচ্ছে। উত্তেজনাই এর প্রাণধর্ম। সংবাদপত্রের চেয়ে সিনেমার মধ্যে চিত্তবিনোদনের ভাগ বেশি সুলভ। শিক্ষার আবেদনের সুযোগ থাকলেও তা আমোদের তোড়ে ভেসে যায়। আর্থিক অপব্যয় হয়, স্বাস্থ্যহানিটাও উপেক্ষার নয়। প্রেক্ষাগৃহের দূষিত বদ্ধ হাওয়ায় শ্বাসক্রিয়ার অনিষ্ট ঘটার সঙ্গে অন্ধকার ও হঠাৎ তীব্র আলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি ঘটাও খুবই স্বাভাবিক। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার যান্ত্রিক অতিপ্রয়োগে যেমন হয়ে থাকে,—সিনেমা মানুষের আনন্দ সৃষ্টির স্বত-উৎসারিত

সহজ পথগুলিও তেমনিভাবেই নষ্ট করে দেয়। যাত্রা, কবি, কীর্তন, কথকতা প্রভৃতি দেশ থেকে প্রায় উঠে যেতে বসেছে। সংবাদপত্র এবং রেডিয়োর চেয়ে সিনেমার প্রভাব প্রবল ও ঘনিষ্ঠ। অথচ সিনেমাতে যেমন সহজে কোনো একটি ধারণার সৃষ্টি হয় তেমনি সহজেই কর্পূরের মতো তা মিলিয়েও যায়। কেবল রেখে যায় একটা নেশা। যান্ত্রিক চক্রাবর্তনের অনুকরণে ফিরে ফিরে ছবি দেখার নেশা বা অবশ অভ্যাস আর ফুরোতে চায় না। সমাজ সংগঠনের নানা উদ্যোগগুলির বাস্তব-চিত্র নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে এনে লোকের চোখের উপর তা ধ'রে রেখে বুঝিয়ে দেবার সুযোগ মিলছে সিনেমার দৌলতে। আনন্দের বিচিত্র আয়োজনের সঙ্গে শিক্ষার এই দিকটি উল্লেখযোগ্য।

রেডিয়োর ব্যবহার এখনো ব্যয়সাপেক্ষ। সাধারণ লোকে পথের থেকেই যেটুকু শোনবার শোনে। জনশিক্ষার কাজে লাগাবার পক্ষে রেডিয়ো খুবই সুবিধাজনক। কিন্তু সংবাদপত্র, সিনেমা বা রেডিয়ো, সকলের ক্ষেত্রেই একটিমাত্র প্রস্তাব নিবেদন করার আছে এই যে, কেবল বাইরের থেকে খবর ছবি গান জোগালেই যথেষ্ট হবে না—সুদূর গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত কেন্দ্র গঠন ক'রে ব্যাপকভাবে স্থানীয় জীবন-যাত্রা থেকে যোগ্য উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য বিকেন্দ্রীকৃত বিচিত্র সংগঠনের জাল ছড়িয়ে দিতে হবে দিকে দিকে। শহরের মূল কেন্দ্রের কাজ হবে, সংগৃহীত বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য বিধান ক'রে এমন সব উপহারের জিনিস সম্পাদন করা, যাতে সকল অঞ্চলের মানুষেরই কৌতূহল অনুরাগ আনন্দ সদ্‌বুদ্ধি ও সাধুবোধ পুষ্টি লাভ করে। সাহিত্যিকের অনুভূতি, শিল্পীর অলংকরণ-নৈপুণ্য ও বৈজ্ঞানিকের সম্পাদন—নানা গুণীর নানা গুণপনার সমাহারে এই কাজ সম্পন্ন করে তুলতে হবে। তারপরে বিজ্ঞানের যন্ত্রশক্তি যোগে আবেদনবহ এই দান বিলোতে হবে ঘরে-ঘরে। বিজ্ঞান তবেই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার সহায়ক হবার যোগ্যতা দেখাতে পারবে। তার কাছে যখন আঞ্চলিক সর্বাঙ্গীণ জীবন-গঠনের অনুকূল প্রেরণা ও বিশদ নির্দেশ পাওয়া যাবে তখনই শিক্ষার বাহন হয়ে উঠতে তার আর বাধা থাকবে না।

বিজলী, প্রেস, রেলওয়ে, টেলিগ্রাম, ওষুধপত্র, ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিষয়গুলি আমাদের জীবনের এখন নিত্যসঙ্গী। এদের ছেড়ে শহরের জীবনযাত্রা তো কল্পনাই করা যায় না। গ্রামেও এদের প্রচলন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ সবই বিশেষ শিক্ষার দান। এদের আমদানি যতটা হয়েছে, তাকে উপেক্ষা করা যায় না, সাধারণের পক্ষে এদের ব্যবহার সুলভ ক'রে সে আমদানি সার্থক করতে হবে,

কিন্তু ওদিকের চেয়ে এখন বেশি ক'রে মনোযোগ দিতে হবে সর্বাঙ্গীণ চর্চায়। তবেই বিজ্ঞানের বিশেষ-চর্চা আপনা থেকে ঠিক মাত্রায় শমিত হয়ে চলবে। বইয়ের বহুল ব্যবহারে স্মৃতিশক্তির হানি ঘটেছে, ওষুধপত্রের অত্যধিক প্রয়োগে নষ্ট হয়েছে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সাহায্যে আন্তর্জাতিক মেলামেশায় দেশবিদেশের সঙ্গে যতই যোগ বৃদ্ধি হোক, তেমনি পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় ফাটল ধরেছে। আমাদের এদিকে সতর্ক হতে হবে। দেশবিদেশের হালচাল জেনে, তার জিনিসপত্রের নমুনা দেখে স্বভাবতই নিজেদের ঘরোয়া ব্যবহারে সে সব বস্তুকে কাজে লাগাবার ইচ্ছা জাগে। এই ক'রেই লোক পরের প্রত্যাশী হয়ে উঠে। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার মধ্যে এ-সব বৈদেশিক যোগের স্থান থাকবে পরিমিত মাত্রায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে সে মাত্রা স্থির করতে হবে।

সমবায় প্রথায় বিজ্ঞানের যন্ত্রশক্তি যোগে একদেশের বিশেষ উপজাত উদ্বৃত্ত দ্রব্য বা সৃষ্টিসম্ভার অন্য দেশের বিশেষ উপজাত উদ্বৃত্ত দ্রব্যসম্ভারের সঙ্গে অদল বদল ক'রে নেওয়া যেতে পারে। স্বভাব-উদ্বৃত্তের অপচয় নিবারণ করে তারস্থলে দ্রব্যের এরূপ সদ্ব্যবহার করা হলে, কেবল দ্রব্যেরই সার্থকতা ঘটবে তা নয়, এই সূত্রেই পরস্পর সাহায্যে পরস্পরের নানা অভাব দূর হয়ে, নূতন বিষয় উপভোগের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দেশে দেশে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবারই কথা।

কিন্তু, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যুগেই এখন যা হচ্ছে তার একটি দিকের উল্লেখ মাত্র এখানে করা হচ্ছে। খাদ্য মানুষের প্রধান প্রয়োজনের বিষয়। "ফ্র্যাঙ্ক বুদো বলিতেছেন যে, আমরা খাদ্য উৎপাদন যথেষ্ট করিতেছি, কিন্তু বণ্টনটা ঠিকমতো হইতেছে না। যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্টি। মানুষ যখন হইতে সঞ্চয় এবং সঞ্চিত সম্পদ রক্ষার জন্য বল প্রয়োগ আরম্ভ করিয়াছে তখনই প্রাকৃতিক সম্পদ বণ্টনে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। যত অসুবিধার সূচনা ঐখানেই।" (প্রবর্তক)

কেবল যে অধিক উৎপাদন ও বণ্টনের অব্যবস্থাই মানুষের অসুবিধার সবখানি, এমন নয়, তার আনুষঙ্গিক আরেকটি সাংঘাতিক কুফলেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। অধিক উৎপাদনের তাগিদে কলকারখানার প্রসার। কিন্তু কলকারখানার থেকে তৈরি খাদ্যবস্তুগুলি যে মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির পক্ষে কী ক্ষতিকর, তা বলা যায় না; অথচ অল্প লোকেই তা জানেন বা জেনেও এ বিষয়ে মনোযোগী হন। কিছুদিন পূর্বে গান্ধিজীর অনুগামিনী শ্রীমতী মীরা বেন "বিষের কারখানা" নামক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানী এবং বিশেষ ক'রে চিকিৎসকমণ্ডলীর দৃষ্টি

এদিকে আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমেরিকার প্রথিতনামা দন্ত-চিকিৎসক ডাঃ প্রাইসের লেখা—"Nutrition and Physical degenaration" (আহার ও দৈহিক অবনতি) নামক পুস্তকে দেখানো হয়েছে যে তিনি "সুদূর উত্তর প্রান্তের এস্কিমোদের দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিষুবরেখার উষ্ণতম অঞ্চল ঘুরিয়া দক্ষিণে শীতপ্রধান অঞ্চলের অসংখ্য লোকের দেহ ও দাঁত পরীক্ষা করিয়াছেন। যাহারা পূর্বের স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতেছে ও গৃহজাত খাদ্য গ্রহণ করিতেছে এবং...যাহারা বর্তমান আধুনিক কলে তৈরি খাদ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছে, উভয়ের শারীরিক পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। সর্বত্র একই চিত্র। একই ধরনের খাদ্য সব জায়গায় মানুষের স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করিতেছে। ডাঃ প্রাইস এই খাদ্যের একটি তালিকাও দিয়াছেন—সাদা আটা বা ময়দা (কলে পেষা), কলে ভাঙা চাউল, বনস্পতি, টিনে বদ্ধ সব্জী ও ফল, মোরব্বা, সিরাপ ইত্যাদি (সমস্তই সাদা চিনিতে প্রস্তুত), আরো নানাবিধ কলে প্রস্তুত খাদ্য দেহের নিয়মিত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। কলে পেষা ময়দা ও কলে ভাঙা চাউল ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর; অস্থি গঠনের কাজকে ইহা দারুণভাবে ব্যাহত করে, ভালো দাঁতকে খারাপ করিয়া দেয়। এর পরই অনিষ্টকারী সাদা চিনি ও বনস্পতি ঘি-এর স্থান। ...খাদ্য গ্রহণ ব্যাপারে যাঁহারা পুরাতন নিয়ম এখনও বজায় রাখিয়াছেন, তাহাদের তুলনায় আধুনিক তথাকথিত প্রগতিবাদী লোকদের স্বাস্থ্য কত খারাপ। আপনাদের পিতা পিতামহদের সঙ্গে আলোচনা করিলেও জানিতে পারিবেন, বর্তমানের তুলনায় আগেকার যুবক কত সবলদেহী ছিল।" (লোকসেবক)

আমাদের দেশের সরকারী শিক্ষাপরিকল্পনার গতি কোন্ দিকে, বলা কঠিন। দেশের সমস্ত লোককে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেওয়ার অব্যর্থ উপায় তারা ধরে নিচ্ছে,—প্রধানত শিল্পের উন্নতি করা। কিন্তু সে-শিল্প যতটা বড়ো বড়ো কল-কারখানার ততটা কুটীরের নয়। কাজ এবং মজুরী জোগানো যাবে বেশি কলের প্রসারে। কিন্তু কল আমাদের জীবনে সভ্যতার যে প্রেরণা জোগাচ্ছে, তাতে দারিদ্র্যের মান মুছে গেলেও দরিদ্রের দুঃখ অভাব ও মনের দারিদ্র্য দূর হবে কিনা, সেইটেই প্রশ্ন। যন্ত্রের সঙ্গে অন্ধভাবে যুক্ত থেকে অসংখ্য মানুষ যন্ত্রই হয়ে যাবে। অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানদের জীবনযাত্রার উপকরণ যত বেশি জুটবে, তত বেশি অতৃপ্তি, এবং প্রতিযোগিতা উঠবে সীমা-ছাড়া হয়ে। প্রাচুর্যই বাড়িয়ে চলবে অভাবের বিক্ষোভ। ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর সংঘর্ষও আসন্ন হয়ে উঠবে।

প্রচলিত-শিক্ষায় দৈহিকশক্তির ব্যবহার কমে গিয়ে মস্তিষ্কের চালনাই

প্রাধান্য লাভ করছে। হাঁটাহাটির অভ্যাসের বদলে যান-বাহনের উপর নির্ভর বাড়ছে। কৃত্রিম আলো, কৃত্রিম হাওয়া, কৃত্রিম খাবার, আমোদ আহ্লাদও কৃত্রিম ধরনের,—আবাসপত্র, সাজসজ্জা—সব দোকানে-কেনা কলের জিনিস, জীবনযাত্রায় একঘেয়েমির ছড়াছড়ি; দেখে দেখে অরুচি ধ'রে গিয়ে দেহেমনে অসুস্থতা দেখা দিচ্ছে। মনে যতই ঘুন ধরছে, বাইরে ততই বস্তুর আড়ম্বরের দ্বারা বৈচিত্র্য-সৃষ্টির চেষ্টা বাড়ছে। কলের কল্যাণে একই রকমের জিনিস আমদানি হয়, এবং সকলের সেই একই ধরনের জিনিস সমভাবে ভোগ করার একটা ব্যবস্থা হয়ে থাকে বটে, কিন্তু মানুষ নিজেও এতে হয়ে যায় কলের পাইকিরি মালের মতো—একই ছাঁচে ঢালা পদার্থ বিশেষ। এর তিক্ততা মানুষের মন বেশিদিন বরদাস্ত ক'রে উঠতে পারে না। কুটীর শিল্পের প্রচলনে বিকেন্দ্রীকৃত প্রথায় ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে মানুষের বিশেষ বিশেষ রুচিবৈচিত্র্য রক্ষা ক'রে চলার সুযোগ মেলে। এজন্যই বুনিয়াদী শিক্ষার বুনিয়াদ হয়েছে কুটীর শিল্প। সরকারী সাহায্যে এই শিল্প সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারত; তাতে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন কেন্দ্র থেকে কাজ চললেও, সমবায়-প্রথায় কলের মতোই ব্যাপকভাবে জিনিস জোগানো যেত সর্বত্র; দ্রব্য-সরবরাহের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকত নিরঙ্কুশ। কলকে দাসের মতো খাটিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে পায়ের উপর পা তুলে সুখে থাকতে চেয়েছিল মানুষ, এখন মানুষের হাতে জন্ম নিয়ে তাকেই নিজের প্রয়োজনে দাস ক'রে খাটাচ্ছে কল-কারখানাগুলি। কলের মাল কাটাবার বাজার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই মানুষের সভ্যতার ভোল ফিরছে দিনে দিনে; এক এক সময় যুদ্ধ বেধে উঠছে,—জীবনযাত্রার তালিকায় রকমারি উপকরণের যোজনা হচ্ছে এবেলা-ওবেলায়, শিক্ষাসংস্কৃতিরও চাকা ঘুরছে তারি তাল ধ'রে।

দেহের প্রয়োজনের অনুপাতে দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হলে বিষয়-জমানোর সুযোগ মিলত কম; কিন্তু সীমাবদ্ধ সেই প্রয়োজনটুকু মিটে গেলে বাকী সময় লোকে নিশ্চিন্তে মনের চর্চার অবসর পেত বেশি এবং সে চর্চার পিছে জীবিকার তাগিদ বা অর্থের প্রলোভন লেগে না থাকায়, কোনোদিকেই সে বিদ্যাচর্চা কারো মুখাপেক্ষী হত না। স্বাধীন মন সুস্থ বিকাশে আনন্দের সঙ্গে পূর্ণতা লাভ করত। যাদের আদিম অসভ্য বলি, তাদের মধ্যে ক্ষয় ধরে থাকলেও সভ্যসমাজের অনুপাতে দেহে-মনে স্বাস্থ্য ও আনন্দ এখনো বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। শিল্পরুচি এবং ধর্মবোধের

সহজ যে-পরিচয় তারা দিয়ে থাকে, কলকারখানার অধীন সভ্যসমাজে তা একান্তই দুর্লভ। শিক্ষিত হয়ে আমরা তাদেরও মারছি, নিজেরাও মরছি। আমাদেরি আবিষ্কৃত অস্ত্র এ্যটম্ বম্; আমাদের সভ্যতার অবিস্মরণীয় সেই আধুনিক কীর্তি আজ আমাদের মৃত্যুবাণ হয়ে দেখা দিল বিশ্বত্রাস ল'য়ে। বিশ্বত্রাণের মন্ত্র এখনো উঠছে—উৎসাদন আর উৎপাদন বৃদ্ধি। চাই সর্বগ্রাসী সামরিক উৎসাদন, চাই বিশ্বপ্লাবী শিল্পের উৎপাদন। সেই দিক্‌হারা বেপরোয়া দৌড়! ভাবনা শুধু কে হারে, কে জেতে! এই প্রতিযোগিতাই উন্নতি, উন্নতির চেষ্টাতেই সুখ! অশান্তির দাবানল জ্বালিয়েই রব তোলা হচ্ছে বিশ্বশান্তির! এ শুধু দলে লোক ভিড়োবার কৌশল। শান্তির নাম ক'রে—সাধারণ সরলমতি লোকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা। শান্তিবচনের স্তোকবাক্যে যেরূপ শান্তি আসবার তাই আসছে। চলছে সংগ্রামের আয়োজন,—কিন্তু এদিকে বলা হচ্ছে "শান্তি", কারণ জীবনসংগ্রামে শ্রান্ত জনসাধারণের মনোবৃত্তির উপর জাদুমন্ত্রের কাজ করবার পক্ষে এই ধুয়াটাই সবচেয়ে প্রশস্ত। পদে পদে আবার নীতির দোহাই উঠছে। নৈতিক মান মনের বিষয়। বাইরে শারীরিক ভোগসুখের ক্ষুধার তাড়নায় বিষয়বস্তুর প্রাচুর্যে বশীভূত হয়ে মানুষের মনের দৃঢ়তা বজায় থাকছে না। প্রয়োজনস্থলে নৈতিক বিচারবুদ্ধি ও সংগ্রামের প্রবৃত্তি সতেজে মাথা তুলতে পারছে না। অন্তর্বলের জোগান ক্ষীণ হয়ে আসছে। ভিতরে ভিতরে কাজের বেলা নীতি লঙ্ঘন ক'রে কথায়-কথায় নীতির প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। মনুষ্যত্বের অধঃপতনের এই অদ্ভুত অবস্থাকেই অগত্যা মানুষ বাস্তবতা ব'লে আত্মসান্ত্বনা পেতে হাস্যকরভাবে সচেষ্ট।

আমরা বস্তুর উপর নির্ভরশীল ব'লে বস্তু কেনবার মূল্য জোগাড়ের জন্য লম্বা-লম্বা মাইনে বা বেপরোয়া টাকা-রোজগারে মাতি। আর সে টাকাকেই বৈতরণীর ভেলা ক'রে বসে আছি। ভাব অনুভূতি বিসর্জন দিয়ে টাকার জোগাড় দেখতে হ'লেও পশ্চাৎপদ হইনে। এককালের অর্জিত ব্যক্তিত্ব আজ আরেককালের জমিদারি। বাজারে ভাঙিয়ে খাবার পণ্য হয়ে উঠেছে সেই অমূল্য সম্পদ।

শক্তির জড় স্তরের লক্ষণ হচ্ছে একরোখা গতির প্রাধান্য। চেতনার স্তরের লক্ষণ হচ্ছে বিচিত্রমুখী গতির সামঞ্জস্য প্রবণতা। বস্তুর লক্ষণ জড়তা, মানুষের লক্ষণ চেতনা। শক্তি যেমনি তার সামঞ্জস্য সাধনের বৃত্তি হারিয়ে ফেলে, অমনি সে জীবকেও জড়ত্বের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। আমরা বস্তুকে

চাই এবং তাকে উপভোগের জন্য সঙ্গে সঙ্গে চাই সবদিক দিয়ে উন্নতধরনের সামঞ্জস্যের চর্চা। বস্তুর পরিমাণ আর বৈচিত্র্য-বৃদ্ধি, একরোখা প্রবৃত্তির লক্ষণ; পরিণামে জড়ত্ব। ফলে ভোগ-সামর্থ্যের বিনষ্টি। আজ মূঢ় সভ্যতাকে পেয়ে বসেছে সেই পরিমাণ-বৃদ্ধির ভূতে।

জগতে আজ পর্যন্ত যত শিক্ষাবিধি প্রবর্তিত হয়েছে, একরোখামির দোষ তার প্রত্যেকটারই কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে অঙ্গহানি করে রেখেছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আদিম জাতিগুলির মধ্যে দৈহিক শ্রমসাধ্য কৃষি ও কুটীর শিল্প পেয়েছে প্রাধান্য। পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে প্রধানতর হয়ে উঠেছে বিচিত্র বিদ্যা অর্থাৎ বেশি করে মনের চর্চা; বিশেষ ক'রে আত্মার খোঁজে আধ্যাত্মিকতায় ঝুঁকেছে প্রাচ্য জাতিরা। কোনো সভ্যতাই সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্যের পথে এগোয়নি। ফলে চিরকালই মানুষ ভুগে আসছে; দেশে দেশে দুঃখ পাচ্ছে নানাদিক দিয়ে। আদিমরা তো উচ্ছিন্ন হতেই চলল, সভ্যতাগর্বী বিত্তবান পাশ্চাত্য জাতিদের কবরস্থল যুদ্ধাঙ্গনগুলি, আর আমাদের চিত্তপ্রধান সভ্যতা আত্মসমীক্ষার ঝোঁকে ভোগের পথকে সাধারণের কাছে গৌণ ক'রে দেখাতে গিয়ে, প্রতিক্রিয়ায় বিত্তের প্রতি অলস নির্বীর্যের লালসা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

সর্বদেশেই এখনকার শিক্ষা- ও সমাজ-ব্যবস্থা যে প্রবণতা সৃষ্টি করছে, তা মানুষকে সামঞ্জস্যপূর্ণ সর্বাঙ্গীণ পূর্তির দিকে নিয়ে যায় না। জীবিকার জন্য কলমপেষা সার ক'রে তদনুযায়ী কেতাবী বিদ্যার রাজ্যে মনের চর্চাই হচ্ছে পনেরো আনা; দেহের শ্রম এবং আত্মার প্রসার এ শিক্ষার কাছে কার্যত হয়ে আছে গৌণ। এ জন্যই আমরা এ শিক্ষাকে একরোখা জড়মতি শিক্ষা বলতে বাধ্য হচ্ছি। এর পরিবর্তে চাই দেহ খাটিয়ে দেহযাত্রার উপযোগী অন্নবস্ত্র, মন খাটিয়ে জ্ঞানার্জন এবং এ দুয়ের অনুশীলনের ফলে সমানভাবেই চাই অনুভূতির প্রসারে আত্মার অখণ্ডত্ব উপলব্ধি। কেবল তথ্য জেনে এটা হয় না, এসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। সেই জন্যই পৃথিবীকে প্রথমত সীমাবদ্ধ করতে হবে পারিপার্শ্বিকে।

সমস্ত সভ্যতারই শিক্ষা-পদ্ধতির পরিণাম বিবেচনা ক'রে আমাদের সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। শক্তির জড় অবস্থা থেকে সচেতন অবস্থাটাই যখন প্রগতির অবস্থা, আর, একরোখা হওয়ার থেকে সামঞ্জস্যসাধনই যখন চেতনার লক্ষণ, তখন মানুষের দেহে মনে প্রাণে সমানুপাতে সর্বাঙ্গীণ অনুশীলনই শিক্ষার

পরস্পরের থেকে আলাদা আলাদা জীব হয়ে আছে বটে, সেখানে সে অজ্ঞানতা-পাশবদ্ধ এবং পৃথক পৃথক ; কিন্তু মনের গহনে চিন্তামণিপুরে সে শিব; একবার অজ্ঞানতা-পাশ ছিন্ন ক'রে নিজের সেই প্রকৃত স্বরূপের দিকে জ্ঞানের দৃষ্টি ফেরালেই দেখবে সে নিজেকে পাশমুক্ত, আর দেখবে সেখানেই সে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে বিচ্ছিন্ন সবার মধ্যে মিলিত হয়ে আছে একরূপে। এই জন্যই সাধারণ মানের জ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে, আপামর সকলের একাত্মবোধ জাগিয়ে দেবার কাজে সাহায্য করার দ্বারা সার্থকতা দাবী করে পাশ্চাত্য সর্বজনীন শিক্ষা।

তার দ্বিতীয় সার্থকতার দাবী এই যে, সমাজে যতক্ষণ অসাম্য থাকবে, ততক্ষণ মানুষের শিশুকাল থেকেই জ্ঞান-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সেই অসাম্যের রূপকে বাস্তবত জেনে এবং ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দিনে দিনে তাকে সয়ে নিয়ে নিয়ে পরবর্তী সংসার-জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়াটাও শিক্ষার একটা অন্যতম আবশ্যকীয় অঙ্গ। ছোটো বড়ো ভদ্রাভদ্রের সমাবেশের স্থল ঐ আধুনিক স্কুল-কলেজগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীরা সেই বাস্তব জীবনের পরিচয় ও অভ্যাসেরই সুযোগ পায়।

শিক্ষায় কিন্তু হিন্দুমত বরাবরই ভিন্ন। তার কথা হচ্ছে,—অধিকারবাদের। জ্ঞান বিতরণ সর্বজনীন হলে কী হবে, পরিবেশ ও পাত্র বিচার না করে জ্ঞান ছড়ালে তার থেকে বিপর্যয় ঘটা অনিবার্য। শিক্ষার সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থার যোগ আছে। শিক্ষায় অধিকার দেবার সময় সামাজিক ভালোমন্দ সম্ভাবনাও বিচার করতে হবে। স্থূলবৃত্তির লোকদের মধ্যে কেবল ঐ উপদেশ এবং ব্রত-পর্ব-কথা, গান-গল্প, যাত্রা-কবি-বাহিত পথে মনের ক্ষেত্রেই মাত্র শিব-জ্ঞানটুকু জাগিয়ে রাখা যায়, তাতেই সমাজ-কল্যাণ যেটুকু ঘটার ঘটে থাকে। তদতিরিক্ত তত্ত্ব বা বিচারের অধিকার দেওয়াই অপব্যবহারের আশঙ্কাজনক।

শিক্ষাক্ষেত্রে এ যাবৎ দু'টি পক্ষ এবং তাদের দু'টি পথ পাওয়া যাচ্ছে। ভারতীয় পক্ষ হচ্ছে সনাতন শ্রেণী-বিচারী অধিকার-ভেদের পথ, আর পাশ্চাত্য বনেদী পথটি হচ্ছে আধুনিক সর্বশ্রেণীক অধিকার-নির্বিচারী পথ। এই দুই পক্ষ এবং দুই পথের যতই উপযোগিতা থাক্—মূলে এরা দুয়েই এবং এদের দু'পথই আসাম্যমূলক সামাজিক অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষয়-ব্যবহারে জীব-মানুষের বিভিন্নতা আর মনোগত শিবত্বের একত্বতত্ত্ব যতই এরা যে-ভাবে চালিয়ে যাক্, তার বাস্তব ফল যে মানুষের কল্যাণের পক্ষে এখন বিশেষ কার্যকরী হচ্ছে না, তা ইতিহাস খতিয়ে একটু বিবেচনা ক'রে দেখলেই বোঝা যায়।

সেই থেকেই আজ আর-এক পক্ষ দাঁড়িয়েছে। মনের চিন্তায় এবং জীবনের ব্যবহারে সর্বত্র সকলের মধ্যে একতা এনে দেখবার চেষ্টায় নিরত রয়েছে সেই তৃতীয় পক্ষ। সবাই যে শিব অর্থাৎ মূলত এক ও সমব্যবস্থার অধিকারী, তা শুধু পুঁথির কথা বা কানে-দেওয়া গুরুর মন্ত্র থেকে তত্ত্বগতভাবে মনে-মনে জেনে রাখলেই হবে না, বা ব্যবহারেও তা কোনো কোনো শ্রেণী বা বর্ণ-বিশেষের জানলে চলবে না,—কাজে-কারবারে সর্বশ্রেণীর সকলে সমানাধিকামূলক জীবন যাপন করেই বাস্তবেও শিবত্বের সত্য প্রমাণ করে চলতে হবে। এ জন্য শুধু শিক্ষায় সর্বজনীনতা মেনে চললেই হবে না; শিক্ষাকে সর্বাঙ্গীণ ফলদায়ক করবার জন্যই শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ পরিবেশকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক'রে চালাবার জন্য সমাজেও সর্বজনীন সমতার অবস্থা আনা চাই।

সম-অবস্থার সমাজ গড়ার নীতির সঙ্গেই মাত্র সংগত হতে পারে সর্বজনীন শিক্ষার এই বর্তমান নীতি। তা না হলে সমাজে যত দিন লোকের সাংসারিক ব্যবস্থার ভিন্নতা থাকবে, ততদিন শিক্ষাতেও পাত্রহিসাবে মান-বৈষম্য থাকা দরকার। সে দিক দিয়ে বর্ণাশ্রমধর্মী ব্যবহারিক ভেদপন্থী প্রাচীন ভারতীয় অধিকারীবাদী-সমাজে, অধিকারীবাদী শ্রেণীক-শিক্ষার পদ্ধতিটি খুব বেশী অসংগত ছিল না বলেই স্বীকার করতে হবে।

কিন্তু দেশের সেই পূর্বাবস্থা নেই। এ দেশের সমাজ—আর এ-দেশেরই সমাজ নেই,—এখন তা পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে প্রভাবিত হয়েছে গভীরভাবে। সুতরাং এ দেশের বর্তমান যুগের শিক্ষাধারাও পাশ্চাত্য সমাজ-শিক্ষাধারার কিছু যে অনুবর্তন করবে—এ জানা কথাই। তার ভালো-মন্দ ফলও অপরিহার্যরূপে এসে এ দেশে বর্তাবে; কারণ এটা হচ্ছে বিতর্কের অতীত বাস্তব সত্য। ওদিকে পাশ্চাত্যেরই অতি আধুনিক সাম্যবাদীধারার প্রভাবও আজ এ দেশে ক্রিয়াশীল। দ্রুত আমূল পরিবর্তনের দ্বারা সামাজিক সাম্যমূলক অবস্থা আনয়নই তার উদ্দেশ্য।

এখন থেকে জানতে হবে, প্রত্যেকের জন্মগত অবস্থার সীমায় দেহে-মনে সাবালক হয়ে না-ওঠা অবধি কারো জাতের বিচার নেই, শিক্ষাজীবনে সকলেই সমান মর্যাদার পাত্র। তার পরে যখন কোনো ব্যক্তি তার বুদ্ধি ও চেতনার বিকাশে সাবালক বয়সে এসে পৌছুল তখন তার সেই জন্মগত অবস্থার সীমায় থেকে বা তার বাইরে গিয়ে যে-ই যে-বৃত্তি অবলম্বন করুক, তাতে ন্যায়ধর্মের সঙ্গে সাধ্যমতো কর্তব্য ক'রে চললেই সে সমাজের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হবে। অর্থাৎ কর্তব্যপরায়ণ একজন খাঁটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা একজন আধুনিক শিক্ষায়

উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে, একজন কর্তব্যনিষ্ঠ মেথরের কাজের দক্ষিণায় তারতম্য থাকবে না। যেহেতু দেহ থেকে মনের শক্তি অনন্তগুণে অধিক ও তার পরিধিও বৃহত্তর সেজন্য মানসিক শ্রম যাঁরা করেন তাঁরাই বরাবর মানুষের শ্রদ্ধাসম্মান পেয়ে এসেছেন বেশি ক'রে। এই বৈদগ্ধ্যজাত স্তর-তারতম্যের সঙ্গে অর্থ বা বিষয়-গত স্তর-বৈষম্য এসে দু'দিক থেকে শিবের উপর টেনে দিয়েছে মায়ার আবরণ। এ আবরণ বহাল থাকতে তার ভিতর দিয়ে শিবের নিজেরই পক্ষে অন্যের মধ্যে নিজেকে বা নিজের মধ্যে অন্যকে চেনা হচ্ছে কঠিন। এ জন্য শিক্ষারই কাজ হবে এখন, মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি এবং অন্যান্য বৃত্তি সমূহের বিকাশলাভের সূচনা থেকেই লোকের মনের চোখে শুধু সেই দৃষ্টিটি ধরিয়ে দেওয়া, যাতে গুণ ও অবস্থাটাকে মাত্র বাইরের একটা আবরণ ব'লেই লোকে দেখে' চলে এবং তার ভিতর দিয়ে লোকে-লোকে শুধু সর্বত্র এক ও অবিচ্ছিন্ন মানবসত্তাকেই জানতে পায়।

চরিত্র, জন্ম, কর্ম ও সমাজের সমস্ত বাহ্যিক ভিন্নতাকে স্বীকার ক'রেও চিন্তামণিপুরে যাতে লোককে সাক্ষাৎ শিবরূপে দেখা যায়, বিশেষভাবে সেই লক্ষ্যে চলেছিল ভারতীয় শিক্ষা-ধারা। জন্মগত ও মানসিক চারিত্রিক ভেদটাকে ছেড়ে দিয়ে শুধু সমাজের বৈষয়িক ও ব্যবহারিক ভিন্নতাকে স্বীকার ক'রে এক ধাপ এগিয়ে সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষা চালিয়েছিল বনেদী পাশ্চাত্য সমাজ। কিন্তু আরেক ধাপ এগিয়ে, শিক্ষার সঙ্গে বৈষয়িক অবস্থাতেও শিবের প্রত্যক্ষ পরিচয় দাবী করছে আজকের পাশ্চাত্যের নূতন এক দল, শিক্ষা ও সমাজ দুয়েরই সম্পূর্ণতার জন্য।

যতদিন তাদের সাম্য-সংস্থাপক প্রয়াসের ফলে সকল মানুষেরই জীবন-যাত্রামান সমান হয়ে না দাঁড়াচ্ছে, ততদিন এই প্রচলিত সর্বজনীন শিক্ষার মধ্যেই ভারতীয় পন্থার সূত্র ধ'রে মনে-মনে সমুদয় লোককে এক অখণ্ড মানবসত্তা হিসাবে সমান দেখার মানসিক শিক্ষার উপর যেমন জোর দিয়ে চলতে হবে, তেমনি যতদূর সম্ভব বাইরেও আচার-ব্যবহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে, জীবনযাত্রায়ও ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মচারী সকলে প্রত্যেকে যাতে সমতা রক্ষা ক'রে চলে, সাম্যবাদী মতের সেই শিক্ষানীতি ধরিয়ে দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রকে ভিত্তি ক'রেই গড়ে তুলতে হবে নূতন সমাজের ইমারত।

কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, সমাজের সম, অসম সর্ব অবস্থাতেই সর্বকালে সকলের মধ্যে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শগত কাম্য বিষয়টি হচ্ছে, পারস্পরিক

প্রীতির যোগ। সে যোগকেই দৃঢ়তর করবার জন্য এখনকার বাহ্যিক অবস্থারও এই যা সমতা বিধানের প্রচেষ্টা! সেই উদ্দেশ্যেই এখন শিক্ষার কার্যকলাপ সংশোধিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া যেমন আবশ্যক, তার সঙ্গে সকল মানুষের আন্তরিক সক্রিয় সহযোগিতাও তেমনি অপরিহার্য।

ধনিকতা ও ভাবীসমাজ

প্রীতির ভিত্তিতে গুণের চর্চা নিয়ে সকলের সমমাপে নিয়ন্ত্রিত সাংসারিক জীবনযাত্রাই নূতন সমাজের কাম্য।

দৈহিক জীবনী শক্তিতে বেঁচে থাকে লোকে এক জীবন, কিন্তু গুণে বাঁচে সর্বকালে। গুণ শুধু বিদ্যা বা শিল্প নয়, চরিত্রও। এজন্যই দেহের চেয়ে গুণ-জ্ঞানের মূল্য লোকের কাছে অধিকতর বটে। কিন্তু দেহে না বাঁচলে গুণী হবে কে? তাই আবার দেহে বাঁচা এবং দেহীকে ভালোবাসার নীতিই হচ্ছে মানুষের মূলের বড়ো ধর্ম। বেঁচে থেকে লোক কী করবে? সেখানেই আসে তার কিছু-না-কিছু করার কথা। তার স্বভাবের তাগিদই তাকে দিয়ে যে কর্ম করায়, সে কর্ম শুধু তার খাওয়াপরা-সার না হয়ে যাতে সকলের আনন্দ সৃষ্টি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সেবার কর্ম হয়, যাতে সকলের প্রতি মনের প্রীতি বাড়ে, মানুষ সভ্যতার স্তরে এসে চেষ্টা ক'রে চলেছে সেই দিকে। যে শক্তিতে তার এই উদ্দেশ্য সফল হয়, সেটাই মানুষের গুণ। আশেপাশের অন্য সবাইকে অবনতির অতল গহ্বরের মুখে রেখে গুণের ধনিকতার অসামঞ্জস্যপূর্ণ মাথাউঁচানো বাড়াবাড়িটাই যা আজ আপত্তির বিষয়, নয়তো গুণ মানুষের চিরকালই কাম্য। সমস্ত সমাজকেই তুলতে হবে গুণের ক্রমোন্নত স্তরে ধীরে ধীরে। সহজাত শক্তিতে অধিকারী বলে শুধু শ্রেণী-বিশেষের উপরে উঠে গেলে চলবে না।

সমাজের চিন্তা চলছে সর্বক্ষেত্রে ধনিকতার বর্তমান ব্যক্তি-কেন্দ্রিক গতির নিরোধ চেয়ে। আজকের মানুষও ধনিকতাই চায়, কিন্তু সেই চাওয়া অন্যরকমের। প্রত্যাশিত ধনিকতা থাকবে সর্বজনের মধ্যে প্রসারিত হয়ে সর্বকল্যাণে সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত। আর্থিক ক্ষেত্রে কোটিপতির অস্তিত্ব লোপ পাবে, কিন্তু সেই কোটি টাকাটা চলতি থাকবে কোটিজনের অধিকারগত হয়ে একটাকা অংশে; কিংবা তা একত্র কোথাও থাকলেও কোটিজনের মালিকানায় তার ব্যবস্থা হবে নিয়ন্ত্রিত। অবশ্য প্রত্যেকের অংশের একটাকার মানকে ক্রমে কোটিটাকায় বাড়িয়ে তুলবার যৌথ চেষ্টা চলবে কেন্দ্রীভূত একটি সুসম্বদ্ধ গোষ্ঠী থেকে, ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যে নয়।

অর্থের মতো, গুণের ক্ষেত্রেও মানুষের বন্ধ্যা ধনিকতাকে ঢালাই করে নিতে হবে। এজন্য সহজাত অধিকারের কথা গৌণ রেখে মানুষের ইহলৌকিক চেষ্টাসাধ্য শিক্ষা ও অবস্থা নিয়ন্ত্রণের সুপরিকল্পিত ব্যাপক ব্যবস্থায় রত থাকাই হচ্ছে আশু প্রয়োজন। এজন্য উচ্চশিক্ষার উচ্চ ঐশ্বর্যশালী ধাপগুলি অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পাশ করার বা গবেষণা করার বিদ্যামন্দিরগুলি আপাতত কিছু মাত্রায় সচল রেখে তার স্থলে দেশের পল্লীতে পল্লীতে সাধারণ মানের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এবং সেই সঙ্গে সংবাদপত্র প্রচার ও লাইব্রেরি বিস্তারে শিক্ষা বিভাগের সমুদয় অর্থ ও শক্তি নিয়োজিত করতে হবে। আপাতত প্রত্যেক ব্যক্তির দুয়ারে এই ভাবে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। ক্রমে সমস্তের সেই শিক্ষার মানকেই সমান রকমে উন্নীত করে এগিয়ে নিতে থাকলে অতি শীঘ্র না হলেও কিছুকাল পরে গুণেরও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা সহজ হয়ে আসবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সকলের সাহিত্যিক ব্যবহারের উপযোগী বাংলা গদ্য এবং দেশব্যাপী আপামরের সহজবোধ্য বাংলা শিক্ষার আদি প্রবর্তক। আশুতোষ মুখুজ্যে মশায় সমমানের শিক্ষাবিস্তারের পথের আভাস দেখিয়ে গেছেন, বাংলা সাহিত্য এবং ইংরেজি শিক্ষায় সকলের প্রবেশাধিকারের পথ সুগম ক'রে। ঠিক আদর্শ পথ কী, সে কথা আলাদা। তবু ঐ আভাসের জন্যই নবযুগে এঁরা প্রাতঃস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে তাঁদের এই কৃতিত্বের কথা একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন। নিজেও তিনি দেশব্যাপী জনশিক্ষা প্রচারের আবশ্যকতার কথা চিরদিন ব'লেছেন। মহাত্মাজিও চলেছিলেন শেষে সেই কাজে, দেশের নিভৃত নিগূঢ়তম প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বিস্তৃততর পরিকল্পনায় পল্লীর জনগণের মধ্যে শুরু হয়েছে তাঁর জাতির বনিয়াদ-ঘেঁষা বুনিয়াদি-শিক্ষার অভিযান।

বাইরের দিক থেকে অর্থ বা বিষয়গত সমতা এবং ভিতরের দিক থেকে নূতন ঐ প্রস্তাবিত সমশিক্ষা প্রভাবে মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্বন্ধটা আপনি সর্বত্র সাম্যের অনুকূল হয়ে আসবে। সাম্যবাদের ক্রমবিকাশের মুখে এরূপ একটি সিদ্ধান্তের পরিণতি বিচিত্র নয়।

কিন্তু এ পথের প্রতিবাদী আছে। অনেকে মনে করেন এইভাবে শিক্ষায় ও ব্যবহারিক জীবনে সর্বত্র সমতা বিধান হলে সভ্যতার মান আর এগোবে না! দেশের হাত-পা সব কিছুই অবশ্য বাড়বে, মাথাও বাড়তে পারে কিন্তু সে মাথায় "মস্তিষ্ক" গজাবে কিনা সন্দেহ; অর্থাৎ প্রতিভার উদ্বর্তন-পথে এতে কাঁটা

দেওয়া হবে। এই প্রতিবাদিদলের শুধু এই বিবেচ্য যে, কোনো একটি-তুটি অঙ্গের বৃদ্ধি হলে, সেটা দাঁড়ায় ব্যারামের লক্ষণে; কিন্তু শরীরের সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টিই তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ, স্বাস্থ্যবান শরীরেরই স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে উদ্যম ও স্ফূর্তি। আর সেই উদ্যম ও স্ফূর্তিযুক্ত সুস্থ শরীরে মনপ্রাণ যে স্বাভাবিক ধারাতেই ক্রমোন্নতি লাভ ক'রে ক'রে সৎচিন্তা ও সুচরিত্রের জন্ম দেয়, একথাও বলা বাহুল্য। সুতরাং সমমানের সমাজে অসাধারণ প্রতিভা একজন তু'জনের মধ্য দিয়ে আকস্মিক ভর ক'রে ঠেলে না উঠলেও সে যে চাপা পড়বে, বা, তার গতি যে বাধা পাবে এ একটা কথাই নয়; এমন কি, সকলের মধ্য দিয়ে সুস্থ আবহাওয়ায় প্রতিভার ব্যক্তিগত বিরাট বিকাশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই নূতন ব্যবস্থায় আগের চেয়ে আরো বেশি ক'রে হবে, সে-রকম ঘটাও কিছু বিচিত্র নয়, কিন্তু স্বাভাবিক হচ্ছে ব্যক্তিগত না হোক সামাজিক প্রতিভামানেরই অপেক্ষাকৃত দ্রুত ক্রমোন্নয়ন। আর, সেটা অব্যাহত থাকলে সমমানের সমাজে কোনো ব্যক্তিরই তাতে ক্ষুব্ধ হবার কিছু থাকবে না, বরং ব্যাপারটা প্রত্যেকের কাছে সবচেয়ে বেশি আনন্দের হবে।

কিন্তু এই সমমানের পথে সমাজকে অতিশীঘ্র এখনই আনতে গেলে, বিপ্লব অনিবার্য। চোখের উপরেই তা দেখা যাচ্ছে। প্রথম সে-বিপ্লব রাশিয়ায় হয়েছে ও দেশে দেশে এখন তা ছড়িয়ে পড়ছে। নিয়েছে তা রক্তাক্ত হিংসার পথ। সেটা অনিবার্য কিনা, সে বিষয়ে আবার সন্দেহ এনেছেন ভারতবর্ষের সীমায় মহাত্মা গান্ধী তাঁর অহিংস গণ-আন্দোলন জাগিয়ে।

ধনিকতার অক্টোপাশী বন্ধন চারিদিক থেকে যেমন সমাজকে মৃত্যু-কবলিত করে চলেছে তাতে তাদের সমূলে উচ্ছেদ না হ'লে যে-কোনো-একটু তার স্ফুলিঙ্গ থেকে আবার সে ধনে-জনে বেড়ে উঠে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দেয়, বারে-বারেই তার এই লীলা ইতিহাসে প্রত্যক্ষ হচ্ছে। সে অবস্থায়, নূতন মানব-সমাজকে অব্যাহত শান্তিপূর্ণ ও উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ দেওয়ার জন্যই এই স্বভাব-মাংসাশী বাঘ-ভাল্লুক ও ডায়নোসেরাস-ড্রাগনের দলকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়োজন অনিবার্য। প্রকৃতিতেও প্রশান্ত আবহাওয়ার পূর্বে যেমন ঝড়বৃষ্টির লণ্ডভণ্ডতা কিছু অনিবার্য, সমাজেও তেমনি স্বাভাবিক ধারাতেই, এই নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রথম পর্বে কিছুটা যুদ্ধবিগ্রহ চলবে, নয়তো ধনীরা স্বেচ্ছায় কোনো সাধু কথা শুনবে না, শুনলেও মানবে না,—সে তাদের স্বভাবই নয়। মার্কস্-নিয়ন্ত্রিত রাশিয়া-পন্থীদের এই যুক্তি। মানুষগুলির উপর তাদের আক্রোশ

নয়, মানুষগুলি ধনিকতার যে নীতিকে আঁকড়ে আছে, সেই নীতির উচ্ছেদই তাদের লক্ষ্য। কিন্তু মানুষ ও নীতি যেখানে অবিচ্ছেদ্য, সেখানেই মানুষ হচ্ছে বলি। আগাছা এবং হিংস্র পশুর দল না গেলে, নূতন ফসলের মরশুম মারা যায় যে!

ভারতবর্ষে মহাত্মাজি বলেন, সাম্য চাই; কিন্তু কোনো মানুষকেই শত্রু ভেবে বা হিংসা ক'রে প্রাণে মেরে নয়, সাম্য চাই প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তার বুদ্ধি-বিচারের স্বাধীন অবকাশ অব্যাহত রেখে দিয়ে। জীবনযাত্রামানের সঙ্গে সঙ্গে সমানই চাই মতেরও সাম্য ঘটানো। সে-সাম্য আসবে সেবাতে, আত্মসংগঠনে, মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাকে বদলে দিয়ে। এতে অন্যের সুবিধার্থ বা অন্যের দানবীয় অবিচার অত্যাচারের স্বভাবগত জের স্বরূপ প্রয়োজনস্থলে দুঃখবরণ করতে হবে নিজেকে নীলকণ্ঠের মত, নিজের উপর ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র-মন্থনের বিষের হাত থেকে বিশ্বকে রাখতে হবে বিমুক্ত। এ-ও নিশ্চয় একরকম বিপ্লব, এতেও মৃত্যু কিছু অনিবার্য, কিন্তু এতে অপরকে হননের হিংসা নেই। আর এ মৃত্যুর পরিমাণ হিংসাত্মক যুদ্ধের অনুপাতে নগণ্য। আত্ম-আচরণের ফল দর্শিয়েই প্রবুদ্ধ পরকে বিরুদ্ধ পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত ক'রে স্বমতে আনয়ন করা এর প্রধান কথা। এতে সময় লাগলে নাচার; কেননা সময়ের চেয়ে বড় জিনিস,—শান্তি-আদর্শের অব্যাহত সূচির গতি। এই অহিংস নীতির উপরেই মানবসমাজের সেই সত্যিকারের শান্তিপূর্ণ উন্নতির অব্যাহত গতি নির্ভর করে।

রাসকিন বলেন, ধনীরা গরীবদের ভাতে মেরেছে, এ কথার চেয়ে বেশী সত্য হচ্ছে, তারা তাদের শিক্ষায় মেরেছে। বলা হয়ে থাকে, গরীবরা শিক্ষা নিতে অক্ষম। রাসকিনের প্রশ্ন হচ্ছে, কেন অক্ষম ? সে দোষ কার ?

এরা সংসারের বাইরের জীব নয়। এখানেই যখন এরা জন্মেছে, তখন মানব-সমাজেরই এরা। দোষ হোক, গুণ হোক, শক্তির যে-কোনো রূপই হোক, দুই উপায়ে সে দোষ বা গুণ মানুষের মধ্যে বর্তায় : এক, বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারে, আর হচ্ছে, শিক্ষায়। এই দু'য়ের যে-কোনোটার জন্যই মানব-সমাজ প্রতিটি মানুষের জন্য জবাবদিহির পাত্র।

ধনী বা দরিদ্র যে কেউ হোক, সবাই এই দুই উপায়ের কোনো-না-কোনোটা অবলম্বন করেই সমাজে এসে দাঁড়িয়েছে। এজন্য গরীবদের বা দুর্বৃত্ত দোষীদের দোষ দেওয়ার আগে সমাজের নিজের কর্তব্যটা ভাবতে গেলেই, ধনীরাও তাঁদের কর্তব্যদায় এড়াতে পারবেন না।

রাসকিন্ গরীবদের বলেছেন,—"তোমরা রুটির জন্য কোলাহল তুলেছ, তা তুলতে পার, কিন্তু কুকুরের মতো চেয়ো না, চাও শিশুদের মতো,—আর, খাওয়া-পরার জন্য তোমাদের দাবী জানাতে চাচ্ছ, জানাও—কারণ, সেই দরকার তোমাদের আছে, কিন্তু তার চেয়ে জোর দাবী করো পুণ্য-পবিত্র হওয়ার জন্য, পূর্ণ-জীবনের জন্য।"

এখানে 'শিশুদের মতো চাওয়া'র কথা ব'লে রাসকিন্ সমাজে ধনী-দরিদ্র সকলকেই সমাজের একটি পারিবারিক সম্বন্ধের আত্মীয়রূপে দেখার কথাই বলেছেন। ধনীরাও মানুষ এবং তাঁরাও তাঁদের কর্তব্য ক'রেই সমাজে চলবেন, বড়ো ভাইয়ের মতো তাঁদের সেই কর্তব্য রয়েছে এই গরীব ছোটোদের উন্নয়নে। দয়া নয়, সে কর্তব্য তাঁদের জৈব ধর্মগত স্নেহের আত্মীয়তার অনিবার্য দায়।

"কিন্তু তথাকথিত ধনীরা যখন হাবেভাবে নাক সিট্‌কে একথাটা বলতে চান যে, গরীবরা হবে আবার মানুষ, এরা হবে সৎ পবিত্র, তবেই হয়েছে ! এরা এই লম্বা লম্বা পোশাক এবং সুগন্ধি-প্রসাধন-বিরহিত দল !—নোংরা কাপড়, নোংরা বুলি যাদের, নাম-গোত্রহীন যত সব অপমানকর চাকরি করে খাচ্ছে যারা, এরা চায়

পূর্ণ-জীবন! কালিপড়া চোখে মিট্-মিটে দৃষ্টি, কুঁকড়ে-যাওয়া শরীর, মন যাদের ধীরে ধীরে যাচ্ছে নেতিয়ে—এরাই হবে পবিত্র—কামক্লেদে পঙ্কিল যাদের ভাবনা, হীন যাদের মন, দেহে যারা অসৎ, আত্মা যাদের স্থূল!”—রাসকিন বলেছেন, “সব কথাই সত্য; হতে পারে তারা এই রকমই, কিন্তু এই এরাই হয়তো হতে পারত এমন সৎ, এমন পবিত্র, এমন পূর্ণজীবন, আজকের পৃথিবীতে যা দুর্লভ। যা বলা হচ্ছে তারা তাই-ই সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি সত্যি তাই হয়, তবে একথাও তার চেয়ে বেশী সত্য যে, আমরা যারা তাদের এমনিভাবে থাকতে দিয়ে বর্জন করে রেখেছি, এই আমাদের চেয়ে তারা অবশ্যই বেশী পবিত্র।”

এইখানেই প্রতিপক্ষের আপত্তি দেখা দেবে,—কেউ কাউকে কি অমন নীচ করে রাখতে পারে? যারা আছে তারা অমনি থাকবার উপযুক্ত, এবং তারা নীচে থাকবে ব'লেই পড়ে আছে। সৃষ্টিতে কোথাও সব সমান নেই; নিম্নতর গুণের উপরেই শক্তি-সংঘাতে উচ্চতর গুণের উদ্বর্তন দেখা দিয়েছে। বাঁদরের থেকে যেমন মানুষ। মানুষের মধ্যেও ঐ নিয়মেই কতকগুলি মানুষ মানুষ হয়েও বাঁদরের মতো নীচস্তরের লোক হয়ে আছে, আবার কতকগুলি তারি মধ্যে থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রকৃত মানুষ। প্রাকৃতিক নিয়মই হচ্ছে শ্রেণীর এই সংঘাত, উদ্বর্তন এবং অসাম্য। ছোটোরা যে অবস্থার মধ্যে জন্মেছে, তার মধ্যেও কারো হাত ছিল না, যে অবস্থার মধ্যে তাদের চলাফেরা করতে হয়, সেও তাদেরই ক্ষমতা-যোগ্য অবস্থা। যে যার সম্ভবমতো স্তরে থেকে জীবন চালিয়ে যাবে শক্তির চর্চায়, এই হওয়া উচিত ন্যায্য নীতি। যেমন-যেমন যার শক্তি বাড়বে বা কমবে তেমনি-তেমনি তার স্তরেরও পরিবর্তন হবে। এর মধ্যে আর অন্য কথা নেই। এতো অমোঘ প্রাকৃতিক বাস্তব সত্য।

যে যে-অবস্থার লোক সে সে-অবস্থার মধ্যে থাকবে, এর মধ্যে দয়ামায়ার তো কোনো প্রশ্ন নেই। সবই অচেতন শক্তির খেলা মাত্র। যারা ছোটো তারাও যেমন সেই শক্তির অচেতন অবস্থা, তেমনি বড়রাও তাই। শক্তির অনিবার্য স্বাভাবিক সংঘাতে সব সৃষ্টি-বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়ে চলেছে। ছোটো বড়ো তার নমুনা মাত্র। এই নীতির বলেই, ধনীদের গরীবদের প্রতি কোনো কর্তব্য-দায় নেই, বরং সংগ্রামে টিকে থেকে শক্তির বিকাশ সাধনে আরো ধনী হওয়াই ধনীদের একমাত্র কর্তব্য, এবং এই পৃথিবীতে এই কর্তব্য নিয়ে মানুষের চির-অধিকারে তারা সমান অধিকারী। শক্তি-সাধনাই হল একমাত্র ধর্ম।

মানুষের এই মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতিও রাস্কিনে কিছু যে না পাওয়া

যাচ্ছে এমন নয়, বিশেষ ক'রে যেখানে তিনি ধনীদের হয়ে বলেছেন,—ধনীরা ধনসম্পত্তি জমিয়েই কিছু গরীবদের রুটি মারেনি, তারা ধনসম্পত্তি অন্যায়ভাবে খাটিয়েই যত অনাসৃষ্টি ঘটিয়েছে। ঐশ্বর্য হচ্ছে শারীরিক শক্তির মতো। একজন বলবান লোক গায়ে তাগদ বাড়িয়েই লোকের অনিষ্টকর হয় না, বলের অনিষ্টকর ব্যবহার দ্বারাই তা হয়। একজন সবল ব্যক্তি কোনো দুর্বলের হাত মুচড়ে দিচ্ছে দেখে অমনি একজন সমাজতন্ত্রবাদী হয়তো চেঁচিয়ে উঠবেন,—"ভেঙ্গে দাও বলবান লোকটার হাত।" কিন্তু আমি বলব,—"তা নয়, তাকে তার বলের সদ্ব্যবহার করতে শেখাও।" রাসকিনের মত হচ্ছে—মানুষের পক্ষে শক্তির সাধনা বা সঞ্চয় দোষাবহ তো নয়ই, বরং সেটাই ধর্ম, কেবল দেখতে হবে সেটা যেন সকলেরই বিশেষ ক'রে দুর্বলদের সাহায্যে লাগে, তবেই হবে তার সদ্ব্যবহার; আর তার এই সদ্ব্যবহারটাই বরাবর লক্ষ্য করতে হবে; লোকের অনিষ্ট সাধনই হচ্ছে অসদ্ব্যবহার,—সেই অসদ্ব্যবহার রোধ করে চলা চাই।

বিলাসিতা সম্ভব, এবং সেই বিলাসিতা কাম্যও, যখন তা সকলের সাহায্যে সকলের জন্য উপভোগ্য হবে। ঠিক নিজের জন্য যে সুখ-সুবিধা বিলাসিতা লোকে চায়, সেইটি সমাজের শেষপ্রান্তের লোকটিরও জন্য যখন সুলভ হবে, তখনই তা আনবে জগতে প্রকৃত শান্তি, তার আগে নয়। এই শান্তিপূর্ণ আদর্শ-সমাজ সৃষ্টির জন্য রাসকিনের মতে প্রথমতঃ চাই, সমস্ত দেশ জুড়ে সরকার থেকে আবশ্যিক বিদ্যালয় স্থাপন ও তাতে শৈশব থেকে সমস্ত লোকের শিক্ষা গ্রহণ প্রচলন। শেখাতে হবে তিনটি জিনিস,—১। স্বাস্থ্য, ২। শিষ্টাচার ও ন্যায়ান্যায় বিচার, ৩। জীবিকা-বৃত্তি। দ্বিতীয়তঃ সরকার পরিচালিত দ্রব্য সংজনাগার ও শিল্প-কারখানা, যেখানে জীবনযাত্রায় ব্যবহার্য সমস্ত দ্রব্যাদি উৎপন্ন ও বিক্রীত হতে পারে, আর, সমস্ত প্রয়োজনীয় শিল্প-চর্চার সুযোগ থাকে।

ব্যক্তিগত ব্যবসায় বে-সরকারী কোনো যৌথ-শিল্পানুষ্ঠানের পথে সরকারী এই প্রতিষ্ঠানগুলি কোনক্রমেই বাধা সৃষ্টি করবে না, তারা থাকবে ন্যায়ানুগত সুন্দর ও সার্থকভাবে কাজ করার আদর্শ হয়ে; লোকে তাদের কাছেই আসবে এই বিশ্বাসে যে, সেখানেই তারা রুটি কিনতে গিয়ে মূল্যানুযায়ী রুটিই পাবে, তার বদলে ভেজাল কিছু পাবে না। যে জিনিসটা চাইবে এবং যে কাজের জন্যই যাক না কেন, সবই সেখানে ঠিক মিলবে, তাতে ফাঁকি থাকবে না।

তৃতীয়তঃ, পুরুষ নারী এবং বালক-বালিকা মাত্রেই নিকটবর্তী সরকারী বিদ্যালয়ে গৃহীত হবে; যোগ্যতা পরীক্ষা ক'রে তাদের কাজে লাগিয়ে দিতে হবে।

অজ্ঞদের শিখিয়ে পড়িয়ে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, রোগীদের সেবাশুশ্রূষা দিয়ে লালন করা হবে, কিন্তু যারা সক্ষম হয়েও কুড়েমি থেকে কর্মবিমুখ হবে, তাদের কঠিনতম কৃচ্ছ তার কাজে বাধ্য ক'রে ক্রমশঃ কর্মঠ করে তুলতে হবে। যেমনি তারা কাজের নিয়ম মেনে চলতে শিখবে, অমনি সে বাধ্যতা উঠিয়ে নিতে হবে, তারা মর্যাদার সঙ্গে বেতন পাবে।

চতুর্থতঃ, বৃদ্ধ এবং অনাথদের জন্য আরাম ও গৃহের ব্যবস্থা থাকবে। সে ব্যবস্থা মর্যাদাজনক হবে, গ্রহীতার আত্মসম্মানের হানিকর হবে না কোনো দিক দিয়েই।

মোটামুটি এই রাসকিনের পরিকল্পনা। এই সব কথার মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সাম্যবাদীদের সঙ্গে রাসকিন বা গান্ধী-পন্থীদের মিল এইখানে যে, এঁরা সকলেই শক্তির চর্চা চান, শক্তিকে সকলের মঙ্গলমুখী ক'রে,—অন্ততঃ কারো তা ক্ষতিজনক না হয়, সেইটি দেখে। তদনুরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সমাজনীতি সকলেরই কাম্য। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে, রাসকিন ও গান্ধী-পন্থীরা ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, সকলকেই আপাততঃ শক্তির স্বাভাবিক অসমতা রক্ষা করতে দিয়েও শিক্ষায় তাদের সেবামুখী মনোভাব তৈরী করতে চান, যাতে তারা শক্তির স্বাধীন বিকাশ অব্যাহত রেখেও অন্তর থেকে স্বেচ্ছাতেই আহৃত শক্তিকে সকলের সেবায় নিয়োজিত করতে পারেন। সহিংস বিপ্লবকে এড়িয়ে, এই সামঞ্জস্যের পথে ধীরে ধীরে সমাজকে সাম্যবাদ-কাম্য শক্তির সর্বজনীন সাম্যেও না আনা যেতে পারে, এমন নয়; কিন্তু তাড়াতাড়ি সেই শক্তি-সাম্য ঘটাতে গিয়ে সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ বা একটি প্রাণও নষ্ট করার নীতি এরা সংগত বলে স্বীকার করেন না। এজন্য বরং শক্তির ব্যক্তিমুখী বিকেন্দ্রীকরণই হচ্ছে এঁদের সমাজের মূলনীতি। আর, সেখানে সাম্যবাদী চান, বিজ্ঞানানুমোদিত কেন্দ্রিক পন্থায় অর্থ, শিক্ষা ও বংশধারা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মূল থেকেই শক্তিকে সমষ্টির পরিচালনায় রেখে অবস্থার অসমতাকে দূর করতে। এই কাজে তাঁরা প্রয়োজন হলে নির্বিকার চিত্তে হিংসাব্রতী। যদিও তাঁরাও মনে করেন, শেষ এবং স্থায়ী শান্তি আসবে তাঁদেরি সমাজকেন্দ্রিক সমতাবিধানের পথে। মোটামুটি এই রকম বলা যেতে পারে যে, ধনীরা নিয়েছে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অপ্রতিহত শক্তিচর্চার প্রয়োজনসাপেক্ষ হিংসাশ্রয়ী পথ, গরীবরা তেমনি নিচ্ছে, ঐ প্রয়োজনানুযায়ী হিংসার পথেই শক্তির সাম্য বিধানের সাম্যবাদী পথ, আর ক্ষীণ এক মধ্যবিত্ত প্রধান চিন্তাশীল সম্প্রদায় চলেছে গান্ধী ও রাসকিনের দুকূল-রাখা শান্তিবাদী শক্তিসমন্বয়ের বিকেন্দ্রীকরণের

পথ ধরে। হয়তো এপথ মহত্তম ব'লেই দুরূহতম এবং সেই জন্যই এর অনুবর্তীদের সংখ্যা এমন পরিমিত।

সব পথেই অবশ্য মানব-চেষ্টা আজ সক্রিয়। সিদ্ধি এবং তার থেকে বিশ্বশান্তি ও উন্নতি কোন্ পথে অপেক্ষা করছে সে বিষয়ে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত এখনই করা সম্ভব নয়। রাসকিনের শেষ কথারই প্রতিধ্বনি করে বলতে হয়, নীতিরই সত্যতাটা মাত্র বলার মতো, সফলতার কথা বিচিত্র মানব-জগতে হলফ করে কিছু বলা চলে না।

গান্ধী-রাসকিন-পন্থা ঈশ্বরমুখী। সর্বগুণময় সর্বব্যাপী যে সমগ্র সত্তা, তাই ঈশ্বর। সাধনা দ্বারা শক্তিকে যে পরিমাণে আয়ত্ত করা যায়, ততই ঈশ্বর লাভ হয়। তবে তাঁদের মতে কারো অনিষ্ট ঘটিয়ে শক্তির সাধনা সেই ঈশ্বরের পথে অগ্রসর করে না, সকলের শুভ সাধনাতেই তা করে। প্রেম ও অহিংসাই এ পথের সাধনবৈশিষ্ট্য। সামঞ্জস্যই হচ্ছে সত্যপ্রণালী।

জড়বাদী সাম্যপন্থীরা যেখানে অর্থকেই সমাজ-নিয়ন্ত্রণের মূল শক্তি ব'লে স্থির ক'রে বিশ্বকল্যাণে বাইরের আর্থিক সাম্যবিধানের উপরেই আপাততঃ একান্ত জোর দিচ্ছেন,—সেখানে গান্ধী-রাসকিন পন্থীরা ভিতরকার বুদ্ধি ও অনুভবের কেন্দ্র মানুষের চৈতন্য-শক্তিকেই সর্বমঙ্গলের মূল ব'লে জেনে প্রীতি ও সেবা-নিষ্ঠ শিক্ষা ও পরিবেশের প্রবর্তন দ্বারা প্রতি ব্যক্তির মধ্যে সেই চৈতন্যের বিকাশ সাধন ক'রে আদর্শ সমাজ গড়তে উদ্যোগী।

শক্তিবাদী ও সাম্যবাদীদের হিংসাশ্রয়ী পথ প্রতিপক্ষের হিংসাকে জাগিয়ে দিয়ে পাশব আদিমতাকেই জীইয়ে রেখে চলেছে। গতানুগতিক ধারায় যুদ্ধের পর যুদ্ধ তার একই বাঁধা অনিবার্য পরিণাম; আর সেখানে হিসাব নিয়ে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, অহিংস পথ যুদ্ধের প্রবৃত্তি দমিয়ে সমাজকে চালিয়ে নিচ্ছে ক্রমে সংগঠনের দিকে।

সত্য এই যে, শ্বাপদের যুগ আর নেই। কিন্তু মানুষ প্রধানতঃ শ্বাপদ বৃত্তি দিয়েই শ্বাপদকুলকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে সেই বৃত্তির সংক্রমণ এড়াতে পারেনি। তাই আজো এই সভ্যতার ফাঁকে মানুষের শ্বাপদবৃত্তির উন্মত্ততা দৃশ্যমান। অতীত ধারাকে বর্জন করে নূতন পথে নূতন চেষ্টায় অগ্রসর ব'লে অহিংস সামঞ্জস্যবাদীরা হয়েছে ক্রিয়াশীল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে অতীত ধারাকে অনুবর্তন করে ব'লেই হিংসাত্মক শক্তিবাদী ধনিকতা ও সাম্যবাদ প্রতিক্রিয়াপন্থী।

নীতিগতভাবে এ জন্যই গান্ধী-রাসকিনের প্রেম ও অহিংসার পথ শ্রেষ্ঠ। এ পথ বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, নানক-বাহিত শাশ্বত ধারার পথ। কালে কালে যতই পাশব বলের প্রতিক্রিয়াশীল সর্বগ্রাসী সর্ব-অতিক্রমী মাথা-উঁচানো অভ্যুত্থান-আড়ম্বর দেখা দিক, তার যুগযুগ লীলায়িত মদমত্ততাকে স্তিমিত করে দিয়ে মহা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানব-সাধনার এই চির প্রাগ্রসর স্রোতনাই এগিয়ে চলেছে অতি সংহত ধৈর্য বীর্য ও প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, চলেছে পূর্ণতর নবজীবনের নির্দেশে।

সব মানুষ এবং পৃথিবীর অন্য-সব-কিছুকেই আয়ত্তে রেখে সকলের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব করার যে হিংস্র শক্তিলুব্ধতা, পশুর পরের ধাপে উত্তীর্ণ হয়েও, মানুষ যে তার হাত থেকে রেহাই পায়নি, তার প্রমাণ দিয়েছে, পুরোহিত ও সামন্ততন্ত্র-প্রধান সমাজ; তারপরে রাজা-জমিদারের ধারা বেয়ে সেই শক্তি-পুঁজিত্বের দুর্নিবার স্পৃহা এসে পড়েছে বণিক ও ধনিককুলের মহলে। কিন্তু একে একে সকলেরই বনিয়াদি তোড়জোড় ধূলিসাৎ হয়ে পড়েছে পৃথিবীব্যাপী জনসাধারণের আত্মশক্তি-সচেতনতার কাছে। কেউ আর কাউকে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মনে করছে না, হতেও দিচ্ছে না, আর তেমনি সেই কর্তাত্বির আশাটাই এখন লোকের মধ্য থেকেও কমে যাচ্ছে। আজ পৃথিবীর এই পরিবর্তন খুবই সুস্পষ্ট। এই ক'রে হিংস্রতার দাঁত-নখগুলির ধার ক্ষয়ে আসছে; যুদ্ধ আরো বাধতে পারে, কিন্তু তেমনি ঐ থেকেই যুদ্ধের সম্ভাবনা দিনে-দিনে কমেও আসবে। এর পরেও যুদ্ধ যা চলবে, সে হবে মস্তিষ্কের যুদ্ধ, দাঁত-নখগুলি কথায়-লেখায় ফুটে বেরুলেও বাস্তবে আর তা স্থূলভাবে আত্মপ্রকাশ করে বীভৎসতা বাড়াবে না; সেগুলি সভ্যতার ক্রমোন্নত মানের চাহিদা ও চাপের কাছে লজ্জিত হয়ে আত্মগোপন করে বেড়াবে, ক্রমে ঐ পথেই হবে নির্মূল।

তার স্থলে দেখা দেবে পূর্বোক্ত বর্ধিষ্ণু নবজীবনের পূর্ণতর নূতন মানব-সমাজ। সেই সমাজে দেখা যাবে সকল চেষ্টার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে গান্ধী-রাসকিনের সেবা ও সামঞ্জস্যের আদর্শ অহিংসভাবে শক্তিবাদী ধনিকদের শক্তি-সাধনাকে করে তুলেছে ক্রমে সর্বজনীন কল্যাণমুখী, এবং ক্রমে ক্রমে তা প্রয়োজন ক্ষেত্রে সহ্য ও সম্ভব মতো সাম্যবাদীদের সাধারণ মৌলিক অবদান ঐ অর্থ শিক্ষা ইত্যাদির সমাজব্যাপী সমমান বিধানেরও পথ অনুসরণ করে শক্তি-সাধনাকে সকলের পক্ষে সুগম করে দিচ্ছে।

কোন্ পথ শ্রেয় এই নিয়ে লোকসমাজ আজ দ্বিধাগ্রস্ত। লোকের কাছে গিয়ে যারা যেটা আগে বিজ্ঞাপিত করছে, লোকে দ্বিধা নিয়েও অগত্যা সেই পথই

অনুসরণ করার জন্য ঝুঁকছে। কিন্তু সব পথের ন্যায্য-অন্যায্যতা খুলে ধ'রে বিশদ বিচারের দ্বারা তুলনায় শ্রেষ্ঠতা দেখিয়ে কোনো একটা পথ তাদের বিবেকের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করে দিলে তারা নির্ভয়ে পরিপূর্ণ আত্মদানে সেই পথ অনুসরণ করবে। কোনো আণবিক বোমার সাধ্য নাই সেই আদর্শ-প্রবুদ্ধ জনপ্রগতি ব্যাহত করে। এ জন্য অস্ত্রশস্ত্র বা যে-কোনো শক্তি সংগ্রহের থেকে এই তুলনামূলক বিচারজাত শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রচারই একমাত্র আবশ্যক হবে। প্রচারের সঙ্গে আদর্শানুযায়ী প্রত্যক্ষ প্রভূত আচার থাকা চাই, তবে প্রচার বেশী কার্যকরী হবে।

শক্তিবাদী ধনিকদের মহলে ব্যক্তির কাছে সমাজের আধিপত্য স্থান পায় না, আবার সাম্যবাদী জনসাধারণের কাছে আমল পায় না ব্যক্তির বেপরোয়া স্বাতন্ত্র্য। গান্ধী-রাসকিনের অহিংস সেবারত সামঞ্জস্যবাদ ধনিকদের ব্যক্তিকেও স্বীকৃতি দেয়, সাধারণের সমাজ তো তার মুখ্য সাধনার বিষয়ই। সমগ্রকে দেখতে গিয়ে অংশ তার দৃষ্টি এড়ায় নি। এ জন্যই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তার কাছে এমন শ্রদ্ধা পেয়েছে। কিন্তু সেই প্রকাশের মোড় ঘুরিয়ে তাকে সমাজ-সেবা-মুখী ক'রে তোলবার জন্য সময় ও পরিবেশ সৃষ্টির ঝুঁকি সে অনেকখানি নেয় নিজের উপর; সাম্যবাদীদের মতো সে অধৈর্য হয়ে নেই। কথা না শুনলেই অমনি সে সাধারণেরই একজনকে বা একটি শ্রেণীকে কোতল করতে উদ্যত হয় না, স্বাধীনতার নামে হরণ করে না অন্যের স্বাধীনতা। বরং তার কার্যপন্থায় তার নিজেকেই কোতল করবার সুযোগ দেয় বিপক্ষীয় অন্যদের। কিন্তু সে সেই ক্ষতিকে ক্ষতি মনে করে না, কারণ, মৃত্যু তার কাছে জীবনেরই জয়যাত্রায় এক জাগরণ-পথ বিশেষ।

তথাকথিত সাম্য নয়, এই সামঞ্জস্যের পথই ভারতের পথ। ব্যক্তির স্ফুরণের সুযোগ রেখে সমাজ যে সকলকে নিয়ে চলতে চেয়েছে, তার সেই প্রবণতার পরিচয় মেলে চাতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রম ব্যবস্থায়। একেবারে আদর্শ ব্যবস্থা না হোক, কিন্তু তারই পাশ-ঘেঁষা এই কাঠামোর উপর সমাজ-ব্যবস্থা বসানো ছিল ব'লে ভাঙা-চোরার হাজার টাল সামলে হাজার হাজার বছর পেরিয়েও ভারতীয় সমাজের একটা বনেদি রূপের প্রতিষ্ঠা আজো সুস্পষ্ট আছে। সময়ের প্রয়োজন-মতো ব্যবস্থার অদল-বদলও তার মধ্যে স্বীকৃত। তার মূল কথা, ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষের যত পার্থক্য; নয়তো মূলতত্ত্বে মানুষ সকলেই সমান। এমন কি, জড়-জীব সবকিছুই সেই তত্ত্বত এক। কাজের প্রয়োজনে যেখানে যাকে মানায়, সেখানে তার আসন, আর সেই তার সম্মান; সুতরাং যতক্ষণ লোকে বেঁচে আছে,

ততক্ষণ সে ব্যবহারের প্রয়োজনানুযায়ী সীমায় সীমা রেখে চলবে-ফিরবে; সে চলাফেরা সবই হবে সমাজের সকলের স্নবিধে লক্ষ্য ক'রে। এই ব্যবস্থায় মানুষ রাজাও হয়েছে, কিন্তু ততক্ষণই তার রাজত্ব যতক্ষণ সে রাষ্ট্রদণ্ডের ট্রাস্টির কাজ সুসম্পন্ন করে সমাজের লোকস্থিতির পক্ষে কল্যাণকর হয়েছে; তার আদর্শ রাম, অশোক, রাজা গণেশ ইত্যাদি; কাজের প্রয়োজনেই এমনি সাম্যবাদী রাষ্ট্রেও আজ পদাধিকারে সভাপতি, সেনাপতি, অধ্যক্ষ ইত্যাদি নামান্তরে নানা ব্যক্তি মর্যাদার স্থান পাচ্ছে। ব্যক্তি যখন ক্ষমতা বা বিষয়ের কর্তৃত্ব আত্মকেন্দ্রিক করে রাখে এবং স্বার্থপর হয়ে অহঙ্কারপূর্ণ ব্যবহার করে, তখনই তা দোষের হয় এবং তখনই তার পরিবর্তনের সময় আসে; নয় তো, সমষ্টির ক্ষমতার ট্রাস্টি হিসাবে চললে বা প্রত্যক্ষ সমাজ-সেবা না হোক, একান্ত নিষ্ঠায় কোনো সাধনা নিয়ে থাকলেই এবং তা সমাজের অনিষ্টকর না হলেই ব্যক্তি চিরদিন সমাজের সমাদরই পেয়ে এসেছে; ভাবী সমাজেও সেভাবে চললে সে সমাদর তার অব্যাহতই থাকবে। সমাজ ও ব্যক্তির এই সামঞ্জস্যের নীতিকে ভিত্তি ক'রেই গান্ধী-রাসকিনের কালোপযোগী নূতন পথ পড়েছে। ভারতবাসীর কাছে পথের কথা খুব একটা কিছু অদ্ভুত নয়, এ দেশের নাড়ির সঙ্গে এর যোগ আছে। ভারতবর্ষই সে জন্য এই পথের প্রকৃষ্ট সাধনক্ষেত্র।

আদর্শ ব'লে গ্রহণ করতে হবে। 'বিশেষজ্ঞতা' মাত্রই গতানুগতিক পণ্ডিতিয়ানা, সাধুয়ানা, শিল্পীয়ানা, অর্থাৎ কৃত্রিম ধনিকতার পথ। তাতে আবার এক বিষময় বিসম সভ্যতার দুঃখদায়ক গহ্বরে নিয়ে ছাড়বে। আমরা চাই সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা। সে-শিক্ষা শুরু হবে জনসাধারণের বোধগম্য মাতৃভাষাতে। এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের সুগমক্ষেত্র যার কাছে যা প'ড়ে আছে সেই বাস্তভূমিরই গভীর ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিয়ে শুরু হবে তার প্রথম পাঠ। ক্রমে আসুক বৃহত্তর দেশ। বই খাতাপত্র ও দোয়াতকলমের উপকরণ-বহুল লেখাপড়া আর নোট টোকার দায় কমে গিয়ে তার স্থান গ্রহণ করুক অঞ্চলের বস্তু ও বৃত্তির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তা না হয়ে, প্রথম থেকেই আমরা শিখতে থাকি আমাদের পক্ষে অজানা অবাস্তব কতকগুলি শুষ্ক সূত্র ও তথ্য মাত্র। সেই মুখস্থ-করা থিওরি ও ম্যাপের পৃথিবী আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মতো হঠাৎ দেখা দিয়ে সেই যে ঘাড়ে চেপে বসে, ইহজীবনে আর তার অনাবশ্যক বোঝা থেকে উদ্ধার থাকে না।

প্রথম থেকেই অত জেনে আমাদের দরকার কী। বয়স যেমন বাড়বে যেমন-যেমন দরকার ঘটবে, কাজের অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আমরা জীবনপথে দেশকালপাত্রকে সাক্ষাৎভাবে বড়ো থেকে আরো বড়ো করে জেনে-জেনে এগোব। যখন যে-টুকুই জানব, সে জানা বইএর পাতার থিওরির জানা হবে না,—জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সত্য ক'রে তাকে পাওয়া চাই—এই হল প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষাপ্রণালীর তাগিদে প্রতিবেশকে ভালো ক'রে জানতে গিয়ে দেখব, শুধু তার বস্তুর সঙ্গে নয়, প্রতিবেশীদের সঙ্গেও হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ফলে মানুষের মধ্যে নির্মম শ্রেণী-সংঘর্ষের সৃষ্টি হচ্ছে না; সাধ্যের মধ্যে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের সমাবেশ থাকায় শিক্ষা এবং জীবনযাত্রা একই সঙ্গে সমান্তর ভাবে চলেছে সুগম হয়ে। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমাজে এই সুগমতার প্রবর্তন করা। কল আমাদের শক্তিকে সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্যের পথে নিয়ে না গিয়ে একঝোঁকা ক'রে তোলে। তাতেই শ্রেণীভেদের সৃষ্টি করে। পরিবেশেরই জোগানো-উপকরণ দ্বারা পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় ও ব্যবহারের সর্বাঙ্গীণ সুযোগ যে-শিল্প আমাদের দিয়ে থাকে সে হচ্ছে আঞ্চলিক কুটীরশিল্প। এজন্যই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছে প্রধানত এই কুটীর শিল্পকেই।

শিক্ষায় কুটীরশিল্প ছাত্রকে উপার্জনের সুযোগ দেয়; একই কালে তা ঐ ক'রে শিক্ষাকে স্বল্প-খরচের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তার ব্যাপক প্রচারে সাহায্য করে।

ব্যাপকভাবে শিক্ষার মধ্যে এবং শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরেও কুটীরশিল্প বা হাতের

কাজের প্রবর্তনাতে এদেশে মহাত্মা গান্ধির উদ্যম সকলের উপরে। সুইডেনের হের অটো স্লোমন শ্লয়েড্-পদ্ধতিতে হাতের কাজকে শিক্ষার অন্যতম বাহন ক'রে সারা পাশ্চাত্য দেশে এক অপূর্ব সাড়া তোলেন। সুইডেনের 'ন্যাস' (Naas Institute) শিক্ষাগারে নানা দেশ থেকে শত শত শিক্ষার্থী গিয়ে শিক্ষালাভ করে আসছে। সে দেশ আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু শিল্পাঞ্চল হিসাবে তার প্রসিদ্ধি আছে; যন্ত্রপাতির প্রচলনও সেখানে খুবই হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও শ্লয়েড্-শিক্ষাপদ্ধতির গুণে সুইসরা তাদের স্বভাবগত নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া ও সৃজন প্রতিভা অক্ষুণ্ণ রেখে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাল রেখে চলতে সমর্থ হচ্ছে। শ্লয়েডের শিক্ষাপদ্ধতি শিখতে এদেশ থেকে শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ সুইডেনের 'ন্যাস' ইন্‌স্টিটিউটে গিয়েছিলেন। তিনি বহুদিন হয় শিক্ষা সমাপনান্তে এদেশে ফিরে এসেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে লেখা "Education and Reconstruction" বইখানিতে একস্থলে তিনি শ্লয়েডের ইতিহাস-লেখকের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তাতে লেখক যা বলেছেন, হাতের কাজ বা কুটীর শিল্পের উপযোগিতা আলোচনাক্ষেত্রে বিশেষ ক'রেই আমাদের তা স্মরণীয়। কুটীর শিল্পের সাহায্যে সুইডিসরা জীবিকানির্বাহ ক'রে চলছিল, এমন সময় সেখানে পৌঁছল কলকারখানা-জাত শিল্পান্দোলনের ঢেউ। তার ফলে শ্লয়েডের কুটীর শিল্পপদ্ধতি দেশ থেকে অন্তর্হিত হল। বড় বড় মাল জোগানদার শিল্পপতিরা কুটীর শিল্পের ছাঁচ সংগ্রহ করে নিয়ে পাইকারি হারে সেই ছাঁচেরই গড়া মাল জোগাতে লাগল। কলের জিনিসে দেশ ছেয়ে গেল। রেল ও খাল-যোগে ঘরে ঘরে সেসব মাল সরবরাহ করা আরো সহজ হল। বোঝা গেল যন্ত্রযুগের মহিমা। তাতে সময় ও পরিশ্রম বাঁচে, এতে সন্দেহ নাই। সেই উদ্বৃত্ত সময় ও শক্তি তখনই লাভের হয়, যখন তা সদ্ব্যবহারে লাগে; বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে যদি তার অপব্যবহার ঘটে—সে ক্ষতি শুধু নৈতিক নয়, জাতীয় আর্থিক ক্ষতিও তার থেকে যা ঘটে তা অবশ্যই গণ্য করতে হবে। কুটীর শিল্প এই দিক দিয়ে মানুষকে সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহারে নিয়োজিত রাখতে পারে। ("It is certainly true that when the handicraft is transformed into machinery work a great amount of time saving can be reckoned upon; and the time saved becomes time gained when it is profitably utilized. If, on the contrary, this be not the case and if the hour which was formerly devoted to productive activities is now being spent in idleness or what is surely worse—in wrong-doing, the hour

saved becomes an hour lost; and that is so, not only from a moral but also from a national-economical point of view.")

হের অটো স্যলোমন (Herr Otto Salomon) আধুনিক যন্ত্রযুগেও শিক্ষার মধ্যে কুটীর শিল্পের উপযোগিতা নিজের অধ্যবসায় দ্বারা প্রমাণিত ক'রে দেখিয়ে সুইডেনবাসীদের জাতীয় সুপ্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীতে পুনরায় অনুরক্ত করে তোলেন। এই ক'রেই তিনি সে দেশকে শিল্পপ্লাবনের মারাত্মক অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন।

আমাদের দেশেও বিদ্যালয়ে হাতের কাজের শিক্ষা প্রবর্তন উপলক্ষে লেখক লক্ষ্মীশ্বরবাবু তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে "Education and vocational training" নামক নিবন্ধে লিখেছেন, "জনশিক্ষা প্রণালীতে হাতের কাজকে প্রাধান্য দেবার যুক্তিস্বরূপ মোটের উপর এই বলা যেতে পারে যে, কিছু-একটা সৃষ্টি করার অনুরাগ এই থেকে বৃদ্ধি পায় এবং তাতেই উদ্যমেরও উন্নতি ঘটে; শিক্ষাব্যাপারে এ জিনিসটার সুফল দুরপ্রসারী। আত্মনির্ভরতা এর প্রধান ফল, শিক্ষাপদ্ধতিতে সেটা শ্রেষ্ঠ লাভ ব'লেই ধরে নিতে হবে। হাতের কাজের শিক্ষায় শ্রমের মর্যাদা বাড়ায় এবং কায়িক শ্রমের কাজে আগ্রহ জন্মায়। (Some of the arguments why the mass education policy should lay much emphasis on the practical aspects are as follows :

"The power of doing increases the love of creating and thus energy is developed an educational factor which ought to be turned into much account. Self-reliance which springs from it must ever be regarded as one of the highest educational gains."

The training of the hands raises the dignity of labour and fosters interests in manual labour.)

এই প্রবন্ধেই অন্যত্র লেখক বলেছেন,— শিক্ষা হিসাবে হাতের কাজ প্রধানতঃ আট থেকে বারো বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের ছেলেমেয়েদের দিয়ে শুরু করানো যেতে পারে। বালকের পক্ষে কায়িক শ্রমসাধ্য কাজের মধ্যে প্রথমেই উপযোগী হচ্ছে কার্ডবোর্ডের কাজ, তারপরে যথাক্রমে আসবে কাঠে এবং ধাতুতে নানা জিনিস তৈরির কাজ। আর, বালিকাদের পক্ষে উপযোগী হচ্ছে রান্না, বাগান তৈরি, চরকায় সুতা কাটা, তাঁত-বোনা, সেলাই-ফোঁড়াই এবং আরো নানা গৃহকর্ম। বড় ছেলেদের সর্বাঙ্গীণ সাধারণ শিক্ষার পক্ষে একটি অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ স্কুলের পাঠ্য-

তালিকায় হাতের কাজের স্থান হওয়া উচিত। এর দ্বারা ছুতোর বা অন্যান্য কর্মিকদের সকলকে বেকার করা উদ্দেশ্য নয়; এতে ছাত্রদের উন্নতি হবে নানাদিক দিয়ে। তাদের নীতি, বুদ্ধি, এবং শরীরের উন্নতি তো ঘটবেই, তা ছাড়াও তারা এর দ্বারা সুশৃঙ্খল হয়ে চলবার শিক্ষা পাবে, কাজে তাদের অধ্যবসায় জন্মাবে; কেননা, এতে চোখের পর্যবেক্ষণ শক্তি বাড়বে, সুকৌশলে এবং সুচারুভাবে কাজ করার মতো হাতের নৈপুণ্য দেখা দেবে, আর একটি ফল হবে এই যে, ভারতে ছাত্র-সম্প্রদায় লেখাপড়া করতে গিয়ে মাত্রাছাড়া কষ্টকর মনঃসংযোগ দ্বারা শরীরে মনে যে প্রতিক্রিয়া ঘনিয়ে আনে, হাতের কাজের চর্চায় সেই কুফলও ঠেকানো সম্ভব হবে। ছাত্রদের কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জিনিস তৈরি করে তোলার দরকার হবে না; কেবল এমন-কিছু নমুনা খাড়া করা চাই যাতে তাদের হাতে-হাতিয়ারে জিনিস তৈরির সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সহজ সহজ কাজ দিয়ে শিক্ষা শুরু ক'রে জটিল কাজে পটু ক'রে তুলতে হবে, ধীরে সুস্থে অথচ ক্রমোন্নত গতিতে।

(Hand-work teaching on educative lines is mainly for boys and girls ranging from eight to twelve years of age or above. The most suitable form of manual labour for lads at that time of life to begin with is card-board work and then wood and metal work in succession, for girls cookery, gardening, spinning, weaving, embroidery and other house-crafts. Educational hand-work claims to have a place in the school curriculum as being an essential factor in all round general education of youth. The object is not to turn out all at once so many carpenters or crftsmen, but it seeks to contribute materially to the pupils' moral, intellectual and physical developements and to encourage him to cultivate orderliness, perseverance in his work, by training his eyes to see more skillfully and aesthetically and also to counteract concentration on intellectual work which school life in India particularly fosters. The pupil is not expected to make a large number of big articles but to be able to give evidence of the possible and attainable accuracy in the execution of the articles. Pupils are to be led from simple tasks to more

difficult and complicated pieces of work by show degrees and evenly progressive succession.)

লেখক তাঁর উক্ত প্রবন্ধের পাদটীকায় প্রোফেসর জেমসের লেখা থেকে উদ্ধৃত ক'রে যা দেখিয়েছেন তাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সে লেখাটুকু এই,—

"সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে যে অসামান্য উন্নতি দেখা গেছে, স্কুলে হাতের কাজের শিক্ষা প্রবর্তনই তার অন্যতম কারণ। এই শিক্ষা যে গৃহস্থালীর কাজে এবং ব্যবসায়ক্ষেত্রে আরো কতকগুলি সুদক্ষ, সুচতুর এবং কর্মক্ষম লোক তৈরী করবে তাই নয়, এ শিক্ষা থেকে এমন কতকগুলি নাগরিক তৈরী হবে বিদ্যাবুদ্ধির দিক দিয়ে যারা সম্পূর্ণ নূতন উপাদানে গঠিত। বীক্ষণাগারের কাজে এবং দোকানপসারের কাজে আমাদের পর্যবেক্ষণ-শক্তি বাড়ে; স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার পার্থক্যবোধ জন্মে; এর থেকে প্রাকৃতিক নিয়মের জটিলতা ভেদ করা যায়, বাচনিক শিক্ষার স্থান দখল করে সুচিরস্থায়ী প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ফলে যাথাতথ্যের অভ্যাস হয়,—কোনো কাজ করতে গেলেই আমরা যথাযথভাবে করি, নয়তো সম্পূর্ণ ভুলভাবেই করে থাকি। সততার অভ্যাস হয়; কেবলমাত্র কথায় নয়, কাজে ক'রে দেখাতে হলে অল্পবিদ্যা বা অজ্ঞান কোনোরূপে ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। এতে আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেয়; ছাত্রের ঔৎসুক্য ও অভিনিবেশ সর্বদা এমন উদ্দীপ্ত থাকে যে, বিধিনিষেধের তথা শাসনের প্রয়োজন সামান্যই থাকে।

(Writes Professor James, "The most colossal improvement which recent years have seen in secondary education lies in the introduction of the manual training in schools, not because they will give us a people more handy and practicable for domestic life and better skill in trade, but because they will give us citizens with an entirely different intellectual fibre. Laboratory work and shopwork engender a habit of observation—a knowledge of difference between accuracy and vagueness, and an insight into nature's complexity and into the inadequacy of all abstract verbal accounts of real phenomena, which, once wrought into the minds, remain there as lifelong possessions. They confer precision; because if you are doing a thing you

must do it definitely right or definitely wrong. They give honesty for, when you express yourself by making thing, and not by using words, it becomes impossible to dissimulate your vagueness or ignorance by ambiguity. They beget a habit of self-reliance: they keep the interest and attention always cheerfully engaged, and reduce teachers disciplinary functions to a minimum." —Talk to teachers)

আমাদের দেশে হাতের কাজের দিকে শিক্ষাক্ষেত্রে যে কতটা উদাসীনতা রয়েছে, অথচ, কতটা যে এদিকে প্রযত্ন প্রবর্তন করা দরকার, রবীন্দ্রনাথের একটি লেখায় তা কিছু প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ্মীশ্বর বাবুর রচিত "কাঠের কাজ" নামক বইখানির ভূমিকায় কবি লিখেছেন, "আমাদের মতে পঙ্গুতাই ভদ্র সমাজের লক্ষণ, হাতপাগুলোকে অপটু করিয়া তুলিলেই ভদ্রতা পাকা হয়। ইহার ক্ষতি ততদিন বুঝিতে পারি নাই যতদিন বাঙালী ভদ্রসন্তানের একমাত্র মোক্ষলাভ ছিল কেরাণীতীর্থে। সেখানে জায়গার টানাটানি ঘটিতেই দেখা গেল তাহার মত অবস্থার প্রাণী আর জীবলোকে নাই। সংসার-সমুদ্রে পুঁথিগত বিদ্যাই যাহাদের একমাত্র ভেলা ছিল তাহাদের এবার নৌকাডুবির পালা। সেই সংকটের তাড়নায় ভদ্রলোকের ছেলেকেও আজ হাতে ও কলমে দুই দিকেই শক্ত হইতে হইবে এই তাগিদ আসিয়াছে। যাহার হাত দুটো কর্মিষ্ঠ নয়, হাতের দিকে সে মূঢ়, তা হোক না সে নামজাদা, বা পণ্ডিত-বংশের কুলতিলক।"

লক্ষ্মীশ্বরবাবুর বইখানিকে কবি স্বাগত করেছেন "কেবলমাত্র জীবিকার জন্য নহে, শিক্ষার জন্য"ও ব্যবহারে এর উপযোগিতা আছে ব'লে। শিক্ষার দিকে হাতের কাজের পক্ষে পূর্বোক্ত প্রফেসর জেমসের নির্দেশিত উপযোগিতার কারণগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে কবির নির্দেশিত কারণের মিল পাওয়া যাবে। দেশে কলকারখানা প্রসারের পাশাপাশি কুটীর শিল্পকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবিকার উপায়স্বরূপ প্রবর্তনের কাজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টাও স্মরণীয়।

"শিক্ষার বিকীরণ" ভাষণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"কেউ কেউ তথ্য গণনা করে দেখিয়েছেন পূর্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে। কিন্তু তার চেয়ে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে জনশিক্ষাবিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে। শোনা যায়, একদিন বাংলা দেশ জুড়ে নানা শাখায় খাল কাটা হয়েছিল অতি

আশ্চর্য নৈপুণ্যে—হাল আমলের অনাদরে এবং নির্বুদ্ধিতায় সে সমস্ত বন্ধ হয়ে গেছে ব'লেই তাদের কূলে কূলে এত চিতা আজ জ্বলেছে। তেমনি এদেশে শিক্ষার খালগুলোও গেল বন্ধ হয়ে, আর অন্তর বাহিরের সমস্ত দীনতা বল পেয়ে উঠেছে। শিক্ষার একটা বড়ো সমস্যার সমাধান হয়েছিল আমাদের দেশে। শাসনের শিক্ষা আনন্দের শিক্ষা হয়ে দেশের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল, মিলেছিল সমস্ত সমাজের প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে। দেশব্যাপী সেই প্রাণের খাদ্যে আজ দুর্ভিক্ষ। পূর্ব সঞ্চয় কিছু বাকি আছে তাই এখনো দেখতে পাচ্ছিনে এর মার মূর্তি।"

আমাদের দেশে আগে শিক্ষা ছিল আনন্দের শিক্ষা। এখন শিক্ষাই নেই,—আনন্দ তো দূরের কথা। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের যোগ থাকা যে সম্ভব হতে পারে, আর সেটাই যে কল্যাণজনক,—কবির কথা থেকে এই কথাটিই আমরা বুঝতে পাচ্ছি। শিক্ষাকে সাধারণের মধ্যে বিস্তারিত ক'রে তার মধ্যে আধুনিক কালেও আনন্দের সমাবেশ কী করে করা যায়, এ বিষয়ে আমাদের উপায় খোঁজা দরকার।

অ-ভারতীয় প্রাধান্য হতে দেশে এ যাবৎ যে-শিক্ষা চলে এসেছে, তার দোষ এই যে, তাতে সমাজের একদিকে খুবই আলো হচ্ছে, আরেকদিকে বাড়ছে অন্ধকার। রাষ্ট্রচালনার সুবিধার্থে তাতে মুষ্টিমেয় লোকের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ঘটলেও বিরাট জনসাধারণের পক্ষে দাসত্ব-চর্চার শিক্ষাই হচ্ছিল এতে বেশি,—তারই ফলে আজ কেরাণীর ভিড়ে দেশ ছাওয়া; বাড়ছে খালি বেকারের সংখ্যা। ভাত-কাপড়ের দেখা নেই, মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই—স্কুলে পড়তে যাবে কে? সমস্যা হচ্ছে, ছেলে মজুরি ক'রে দু'মুঠো খেয়ে বাঁচবে, না, পড়তে গিয়ে শুকিয়ে মরবে। সাধারণ লোকের পক্ষে স্কুল একটা বিলাসিতা বিশেষ। অথচ, শিক্ষা যখন জীবনযাত্রারই একটা অপরিহার্য অঙ্গ, তখন তাকে বাদ দিয়েও তো বাঁচবার জো নেই। জীবিকার জন্য যে-কাজই খোঁজা যায়, সে কাজেরই গোড়াতে চাই কিছু শিক্ষা। তা নইলে বাইরের দুয়ার বন্ধ। ঘরেরও প্রতিদিনকার জীবনযাত্রা অশিক্ষার দরুণ নোংরা, জটিল ও মারাত্মক হয়ে উঠেছে।

দেখা যাচ্ছে, সাধারণের পক্ষে স্বতন্ত্র ক'রে শিক্ষার আয়োজন করা সম্ভব নয়। প্রত্যহের আটপৌরে জীবনযাত্রার মধ্যেই শিক্ষার সহজ সুযোগ সৃষ্টি করে তুলতে হবে।—দেশকে যিনি অভিজ্ঞতা ও দরদ দিয়ে ভিতর থেকে জেনেছিলেন, মানুষের বন্ধু সেই মহাত্মা গান্ধী তাঁর দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণের ফলে উপনীত হয়েছিলেন এই সিদ্ধান্তেই। প্রত্যেকের জীবনটাই একটা স্কুল,—শিক্ষার্থীর আশেপাশে সহজভাবের

যা উপকরণ রয়েছে তাই আপাতত যথেষ্ট ধ'রে নিতে হবে। তারই সাহায্যে তাকে প্রত্যক্ষ থেকে ক্রমে অপ্রত্যক্ষ বৃহত্তর পৃথিবীর দিকে কৌতূহলী করে নিতে হবে। এতে যে-পরিমাণ শিক্ষা হয়, সকলের জন্য সেই ব্যবস্থাটুকুই এখন করা কর্তব্য। শিক্ষার মান এবং আয়োজন যখন বাড়ানো সম্ভব হবে, তখন সকলের জন্যই আবার তা বাড়ানো হবে। এমনি ক'রে আয়করী বৃত্তির আনুষঙ্গিকরূপে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দেশে চালু হয়ে গেলে অধিকারীভেদে বেছে-বেছে উচ্চ-শিক্ষা বিতরণ করা যেতে পারে। গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার এই নীতি বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে শিক্ষাকে জনসাধারণের আয়ত্তে এনে দেবার অন্যতম উপায়, তাতে সন্দেহ নেই। বেঁচে-থাকার-ব্যস্ততা-পীড়িত বর্তমান পরিস্থিতিতে খাওয়া-পরার চেষ্টার সঙ্গে শিক্ষাকে সংগতি দিয়ে এই ব্যবস্থা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে বলতে হবে। দু'পয়সা জমিয়ে যারা ঘরে আছে, যাদের অবকাশ আছে, তারা উপরের শ্রেণী। এ শিক্ষানীতি হয়তো তাদের মনঃপূত হবার নয়। এমন কি এ নীতি তাদের স্বার্থবিরোধী ব'লেও বিবেচিত হওয়া বিচিত্র নয়। এর নিরর্থকতা প্রতিপন্ন করতেও কেহ কেহ তারা এগোতে পারে। কিন্তু তাদের জাত, তাদের স্বার্থ, সর্বহারা জনসাধারণের জাত ও স্বার্থের সঙ্গে এক নয়। এ কথাটি না বুঝে জনসাধারণ সে-প্রচারে বিভ্রান্ত হলে, তাঁরা আবার নিজেদের পায়েই নিজেরা কুঠার হানবে।

কিন্তু উপরের শ্রেণীও মানুষের জাতেরই এক অংশ। বড়ো অংশ না হোক, বিশেষ এক অংশ বটে। যে-ভাবেই হোক, তারা যখন আলাদা স্তরে উঠে আছে, তখন তাদের উপযোগী শিক্ষারও দরকার আছে। কিন্তু সে-শিক্ষা এমন ধরনের হওয়া চাই, যাতে জনসাধারণের সঙ্গে তাদের দূরত্বটা চিরদিন আকাশপাতাল হয়ে না থাকে। শিক্ষণীয় বিষয়ে মানের পার্থক্য থাকলেও মনের পার্থক্য কমে আসবে। শিক্ষার পরিবেশ, উপকরণ, চালচলন এ সব বাইরের ব্যাপারেও যথাসম্ভব সেই মেলামেশার অনুকূল সহজভাব রক্ষা করতে হবে। এইটি করে তুলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ অদ্ভুত, তাতে যে কতটা সামাজিক দুর্দশা ঘটিয়ে চলেছে, তার চিত্র পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের অপরূপ ভাষায়: "একদা একজন অব্যবসায়ী ভদ্রসন্তান তার চেয়ে আনাড়ি এক ব্যক্তির বাড়ি তৈরি করবার ভার নিয়েছিলেন। মালমসলা জোগাড় হয়েছিল সেরা দরের, ইমারতের গাঁথুনি হয়েছিল মজবুত, কিন্তু কাজ হয়ে গেলে প্রকাশ পেল—সিঁড়ির কথাটা কেউ

ভাবেই নি। শনির চক্রান্তে এমনতরো পৌরব্যবস্থা যদি কোনো রাজ্যে থাকে, যেখানে একতলার লোকের নিত্যবাস একতলাতেই আর দোতলার লোকের দোতলায়, তবে সেখানে সিঁড়ির কথাটা ভাবা নিতান্তই বাহুল্য। কিন্তু, আলোচিত পূর্বোক্ত বাড়িটাতে সিঁড়িযোগে উর্ধ্বপথযাত্রায় একতলার প্রয়োজন ছিল। এই ছিল তার উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।

'এদেশে শিক্ষা-ইমারতে সিঁড়ির সংকল্প গোড়া থেকেই আমাদের রাজমিস্ত্রির প্ল্যানে ওঠেনি। নীচের তলাটা উপরের তলাকে নিঃস্বার্থ ধৈর্যে শিরোধার্য ক'রে নিয়েছে; তার ভার বহন করেছে, কিন্তু সুযোগ গ্রহণ করেনি; দাম হারিয়েছে, মাল আদায় করেনি।" (শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ)

একখানি চিঠিতে কবি লিখেছিলেন, ভদ্র ঘরের ছেলেদের কিছুটা অভদ্র, এবং অভদ্র ঘরের ছেলেদের কিছুটা ভদ্র ক'রে দু'য়ে মেলাবার জন্যই তিনি গড়েছেন তাঁর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়। বুনিয়াদী শিক্ষার বুনিয়াদ হচ্ছে হাতের কাজ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ে বিদগ্ধদের উপভোগ্য চারুশিল্পের সঙ্গে সাধারণের জীবিকা-উপযোগী কারুশিল্পের শিক্ষার ব্যবস্থাও পাশাপাশি রেখে আসছেন প্রথম থেকেই। দর্জির কাজ শেখবার জন্য সেলাইয়ের কল দিয়েছিলেন ছেলেদের হাতে; বই বাঁধাই, তাঁত, কাঠের কাজ; এর সঙ্গে ছিল তরকারীর ও ফুলের বাগান করা; বিজ্ঞানের বোধ জাগ্রত করতে চেষ্টা করেছেন উইণ্ডমিল, এঞ্জিন ও দূরবীক্ষণাদি যন্ত্র আমদানি করে। ভুবনডাঙায় ও সাঁওতালপাড়ায় নৈশবিদ্যালয়ে পড়াতে যেত তাঁর ছাত্ররা পালা ক'রে। আর-একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অগ্রগামী; মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রচারের কথা তিনি বিশেষ ক'রে বলেছেন বরাবর। কার্যক্ষেত্রে তিনি উচ্চ মধ্যবিত্তদের শ্রেণী অবধি পৌছেছিলেন,—তাদের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থাই তিনি প্রবর্তন ক'রে যেতে পেরেছেন। জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্তি তাঁর আদর্শ হলেও এখনো তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি সমাজের সর্বস্তরের উপযোগী হয়ে ওঠেনি। তেমনি গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষায় উচ্চশ্রেণীর যোগ ঘটতেও সময় নেবে। ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতন এবং ওয়ার্ধায় সাময়িক বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়েও পারস্পরিক যোগাযোগে এমন একটা শিক্ষানীতি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা জাগছে যেটা পরিণতি লাভ করলে ভদ্রাভদ্রের হৃদ্যতার পক্ষেই শুধু প্রাণময় হবে তা নয়, কাজের পক্ষেও সুবিধেজনক হয়ে কল্যাণকর হবে। শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা ওয়ার্ধায় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েছেন। এর থেকে সেখানে শিল্পরুচির প্রসার হওয়া স্বাভাবিক; শ্রীনিকেতনে তেমনি বুনিয়াদীশিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠছে।

বলরামপুর ও বিনয়ভবনের যোগাযোগটুকুও উল্লেখযোগ্য। একদিকের সাধনা স্বাবলম্বন, আর একদিকের সাধনা হচ্ছে সৃষ্টি,—দুয়েরই মূলে রয়েছে সমবায়ের সেই ভারতীয় আদি মন্ত্র "সহনাববতু"—সকলে এক সঙ্গে চলবার কথা। রবীন্দ্রনাথ এই সমবায়ের কথা বলেছেন, গান্ধীজি সকলকে মিলিয়ে কাজেও তাই করতে চেয়েছেন। এখন তাঁদের অনুবর্তীরা মূল এই প্রেরণাটিকে কার্যকর করে তুলতে পারলেই হয়।

জাতীয় রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা এই দুই প্রতিষ্ঠানের পিছনে থাকবে, দুয়ের প্রসার ও সামঞ্জস্য সাধনে যত্নের অভাব হবে না, এইরূপ আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষা না ক'রেও যে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রেরণা নিয়ে জনসংযোগ ও জন-শিক্ষার উপযোগী নানা অণু-প্রতিষ্ঠান আপনা থেকেই এদের আশেপাশে গড়ে না উঠবে এমন নয়। বস্তুত সে রকমটি হলেই এদের সঞ্জীবন-ক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিচয় মেলে। বাস্তবত সেরূপ ঘটনাও বিরল নয়। ভদ্রাভদ্রে মেলামেশার একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস ঘটেছে শান্তিনিকেতনের আশেপাশে। ক্লাশ বা কারখানার অনুষ্ঠানিক ছাপ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে, একেবারে গা-ঢালা আসরের আমেজে শিক্ষা ও মিলনের প্রয়াসে দানা বেঁধে উঠেছিল—"বোলপুর রবীন্দ্র উৎসব সংঘ" নামক প্রতিবেশী একটি প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে দেখা দিয়েছিল—বুনিয়াদী শিক্ষারই নীতি-অনুসারে উপকরণ ভার-বর্জিত জন-সংযোগ। জন-শিক্ষার এ একটি আরো সহজতর পদ্ধতি। রবীন্দ্র-সংগীত ছিল তার উপলক্ষ। ক্রমে সংগীতের সহজ আবেদনের সূত্রে সাহিত্য ও সামাজিক সেবার নানা প্রয়াসও প্রবর্তিত হয়েছিল। ভুবনডাঙার "সর্বজনীন দুর্গাপূজা" এই সংঘেরই পরোক্ষ প্রবর্তনার অন্যতম ফল। পারিপার্শ্বিক সমাজের মধ্যে সেবা ও সংগঠনের উদ্যম সঞ্চারিত হচ্ছিল এর থেকে অবলীলাক্রমেই। মহাত্মা গান্ধীর জীবদ্দশাতে এই সংঘ সোদপুরের অনুষ্ঠানে তাঁর সাক্ষাৎ-আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছে। শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠিত "বিশ্বশান্তিসম্মেলনে"ও এই সংঘের অনুষ্ঠান হয়েছে। তা ছাড়া, অল্পকালের মধ্যে, কলকাতা, মেদিনীপুর, বীরভূম ও বিহার প্রদেশের কহল-গাঁ নামক নানাস্থানে জনসাধারণের মধ্যে এই সংঘ সংগীত, অভিনয় এবং আলোচনার আসর জমিয়ে আনন্দ ও ঐক্যানুভূতিসৃষ্টির চেষ্টা করে আসছে। এটি হল রবীন্দ্র-সংস্কৃতির প্রভাব।

অপর পক্ষে বিশ্বশান্তিসম্মেলনের ওয়ার্ধা অধিবেশনের কালে সেখানেও গ্রামের ছেলে-মেয়েরা সংঘবদ্ধ হয়ে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সংবর্ধনার অনুষ্ঠান করেছিল,—

সাধারণের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনার উদ্রেক যে সম্ভব হয়েছে, তা নিশ্চয়ই সেবাগ্রামের প্রভাব বলতে হবে। এজন্য যে শৃঙ্খলা, শালীনতা ও বিশ্বমানবীয় সমবায়বোধ আবশ্যক, তার প্রসার সহজভাবেই আশেপাশে হচ্ছে। এ রকম নানা উপলক্ষে, জনসাধারণের মধ্যে দেশের গণ্ডী ছেড়েও বিশ্বের মানুষের সঙ্গে "সহনাববতু"র ভাব ক্রমে-ক্রমে প্রসারিত হলে শিক্ষার সে-একটা পরম সার্থকতা ঘটাবে।

উপরোক্ত বাস্তব দৃষ্টান্তের সাহায্যে এ কথাই বলবার বিষয় যে, সাধারণের মধ্যে সংস্কৃতি ও সামাজিকতা বিস্তারে সংগীতের উপযোগিতা অসাধারণ। সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রাসাদের একটি ভাষণের অংশবিশেষও এখানে উদ্ধৃত করা চলে। কলকাতায় নিখিল-ভারত সংগীত সম্মেলনের অষ্টম বার্ষিক (১১।১২।৫২) অধিবেশনের উদ্বোধন কালে এই মর্মে তিনি বলেন—"ভারতের অন্যান্য কলার মত ধর্মের সহিত সংগীত-কলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যদিও সমস্ত লৌকিক অনুষ্ঠান ও কার্যোপলক্ষে সংগীতের ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জন্মকালে, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি আচার অনুষ্ঠানে গান গাওয়া হইয়া থাকে। আবার চাষী মাঠে কাজ করিবার সময় গান গাহিয়া শ্রমের লাঘব করিয়া থাকে। ধর্ম সংগীতের মূলে থাকায় ভারতের সন্ত কবিগণের কাব্য-সংগীত জনচিত্তে আলোড়ন তুলিয়াছে। গায়ক যদি কলাবিদ্ হন এবং তিনি যদি গানের মধ্যে ভক্তিরস ঢালিয়া দিতে পারেন তবে শ্রোতা ভক্তির সুর-তরঙ্গে না ভাসিয়া থাকিতে পারেন না। আমার মনে হয়, ধর্ম-সংগীতই ভারতের অন্যান্য ভাষারও শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং তাহাই সর্বাধিক প্রচলিত।

ইহা ছাড়া সংগীত চিত্ত-বিনোদনেরও প্রধান সূত্র। তবে সংগীতের বিশেষত্ব এই যে, সংগীতে চিত্ত বিনোদনের সঙ্গে শিক্ষালাভও হইয়া থাকে।......

গত সাত-আট শতাব্দী ধরিয়া সংগীত হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সাধনে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করিয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যাহাই হউক না কেন ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান ছিল না।

সংগীত জনগণকে যে-ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারে অন্য কোন কিছু তাহা পারে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন, আইন অমান্য অন্দোলন, সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সময় সংগীত যে কত কাজে লাগিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। বন্দেমাতরম্ সংগীত কি আমাদের দেশে যাদুমন্ত্রের মত কাজ করে নাই? আজিও বন্দেমাতরম্ গাহিলে আমাদের হৃদয়

কি সাড়া দিয়া উঠে না? গ্রাম্যগীতি, লোক-সংগীত আমাদের সমাজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া আছে।

শিশু শিক্ষায় সংগীতের যে বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ একমত। 'এই দিকে এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই।"

রাষ্ট্রপতির ভাষণে সংগীতের যে কার্যকারিতার উল্লেখ হয়েছে, তা আমাদের বিবেচনার যোগ্য। অন্যান্য দেশে সংগীত, নাট্য ও শিল্পকলাকে এখন জনশিক্ষার কাজে বিশেষ যত্নের সহিতই প্রয়োগ করা হচ্ছে। হাতের কাজও যেমন একদিকে চলবে, সংগীতও চলবে অন্যদিকে—কোনোটির গুরুত্বই অল্প নয়। দেহের সঞ্চালনের সঙ্গে মনেরও স্ফূর্তি হওয়া চাই। একক সংগীতের অভ্যাসে একাগ্রতা ও ছন্দ-সুষমা বোধ জন্মে, সমবেত-সংগীতের অভ্যাসে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার শৃঙ্খলা ও উদ্যম বৃদ্ধি পায়। মিলন এবং আনন্দ হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার প্রধান কথা। সেইদিক দিয়ে সহজ দান জোগাবার এই উপলক্ষটিকে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা তো কোনো মতেই উপেক্ষা করতে পারে না। বস্তুত, বুনিয়াদী শিক্ষায় সংগীত তাই প্রধান স্থানই গ্রহণ করেছে। শান্তিনিকেতনের জীবন সংগীতময়। সকলের সঙ্গে সহজে মিলতে হলে শান্তিনিকেতনকেও আগে পথ খুঁজতে হবে তার সংগীতের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ সর্বাঙ্গীণ সমাজের যোগ সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর গানের ভূমিকার উপরেই সবচেয়ে বেশি ভরসা রেখে গেছেন। তারপরে রয়েছে তাঁর অন্যান্য শিক্ষা।

শিক্ষার ধারাবৈচিত্র্য

অশিক্ষিতদের অশিষ্ট আচরণ বা অহিতকর কাজ দেখলে অস্বাভাবিক কিছু লাগে না, কারণ সেটা তাদের অজ্ঞানতাগত বলেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা যারা লাভ করেছে তাদের দায়িত্ব আছে। ঐরূপ অকাজ শিক্ষিতদের কাছ থেকে কেউ আশা করে না, স্বভাবের বিকৃতি বা অন্যায় আচরণের জন্য সব সময়েই তারা সমাজের কাছে জবাবদিহির পাত্র। অশিক্ষিত হাজার জনের অসদাচরণের চেয়ে একটি শিক্ষিত লোকের কদাচার ঢের বেশী প্রভাব বিস্তার করে। এই হিসাবে গাণিতিক সংখ্যায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্যায়-আচরণকারীর দল অশিক্ষিতদের চেয়ে কম হলেও, গুণিতিক সংখ্যায় তারা একগুণে হাজারগুণ হয়ে অধিকতর ক্ষতিকর।

আজকাল অনেকক্ষেত্রে শিক্ষিতদের মধ্যে জাল-জুয়াচুরি, উৎকোচ গ্রহণ, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা এবং মিথ্যাচার, জাতিবৈর, কুকর্মে-যোগসাজন, হানাহানি ইত্যাদি মারাত্মক দোষের আধিক্য দেখে স্বতঃই এ প্রশ্নটি ওঠে,—পৃথিবীব্যাপী শিক্ষার বিরাট প্রসারের সার্থকতা কি এই?

এসবের মূলে রয়েছে দুরাকাঙ্ক্ষা। মানুষের আকাঙ্ক্ষা যদি স্বাভাবিক জীবন-ধারার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে চলত, তবে মানুষের মধ্যে অকারণ মনঃক্ষোভ ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হত না। স্তর চিনিয়ে দিয়ে এই দুরাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেয় আধুনিক সামাজিক পরিবেশে এবং শিক্ষাতেই। মানুষের শিক্ষার মান এই জন্যই মানুষের বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে মানানসই হয়ে চলা সংগত। তাতে অবাস্তব আকাঙ্ক্ষার দুশ্চেষ্টা ও অশুভ পরিণতি থেকে মানুষ রক্ষা পেতে পারে। পরিবেশের সঙ্গে আজকালকার শিক্ষা সেই তাল রেখে চলেনি।

ভারতে শিক্ষা একদিন এই নীতি মেনে চলেছিল। ভারতে শিক্ষার স্থান সেকালে ছিল গুরুগৃহে। সেখানে নিছক বিদ্যা বা গুণ শিক্ষাই শিক্ষার সব ছিল না, সেটা আংশিক দিক ছিল মাত্র। গোচারণ থেকে বেদপাঠ, দিনচর্যা ও চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই ছিল সেই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষা বাল্যে কৈশোরে বা যৌবনের প্রারম্ভেই শেষ হত না, তা ছিল জীবনের সর্বস্তরে সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। ব্রহ্মচর্য অন্তে গার্হস্থ্য, পরে বানপ্রস্থ হয়ে সন্ন্যাসে গিয়ে জীবনের

ক্রমবিকাশের ধারা এই জন্মের মতো একটা নির্দিষ্ট সীমা লাভ করত মাত্র। শিক্ষাকে এত ব্যাপক করে লোকে এদেশে দেখেছে যে শেষপর্যন্ত পরমাত্মায় গিয়ে পূর্ণতা লাভ না করা পর্যন্ত জন্ম-জন্মান্তরেও মানুষের শিক্ষার শেষ নেই, এই বিশ্বাসই প্রাচীন ভারতের মানুষের মনে বদ্ধমূল ছিল। অর্থাৎ আজকের মতো সেদিন জীবনের থেকে শিক্ষা আলাদা ছিল না শুধু বিশেষ বিদ্যাটির কোঠায়,—ছিল না তা বাঁধা শুধু বিদ্যার সূত্র ও ব্যবহারবিধি আয়ত্ত করার মধ্যেই। কিন্তু এ সবটাই ছিল মাত্র দ্বিজদের শিক্ষার বেলা। অদ্বিজদের শিক্ষার ইতিহাস ভারতে অস্পষ্ট।

তবে শিক্ষা তাদের জন্য মাথা-খাটানো কষ্টসাধ্য পথ ছেড়ে নিয়েছিল অন্য পথ। 'বিদ্যালয়ে এসে পুঁথিগত-শিক্ষা-লাভ-করা' শিক্ষিত উচ্চ-বর্ণদের কাছ থেকে তাদের অধীত বিদ্যাই মৌখিক উপদেশ বা অনুশাসনের আকারে অদ্বিজরা পেত। আর ছিল ডাক, কবি, যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি শিক্ষামূলক ও আমোদজনক অনুষ্ঠান,—গানে, গল্পে, ছড়ায় সহজ ভাবে চোলাইকরা ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি সর্বাঙ্গীণ জ্ঞানের মোটামুটি পরিচয় তার মধ্য দিয়ে সাধারণের কাছে গিয়ে পড়ত। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ছোটোবড়ো সমাজের সকলেরই সেই শিক্ষাসূত্রে এক আসরে ব'সে মিলনও ঘটে যেত এই সঙ্গে। বৈশ্য শূদ্র—সমাজের এই নিম্ন দুই অদ্বিজ বর্ণ প্রাত্যহিক সংসারের বস্তুগত কাজ-কারবারের সীমাতেই ছিল বেশী আবদ্ধ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার দিকটা ছিল একরকম তাদের এলাকা-বহির্ভূত গৌণ ব্যাপার। সেটা তাদের রুচি ও অভ্যাসের পক্ষে সহজ সুগম ছিল না বলেই, শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের জন্য ছিল এই পথ-বদলের ব্যবস্থা। তবে, বৈশ্যরা অনেক সময় দেখা যায় দ্বিজ-সংস্কারে অধিকারী হয়েছে, কেবল শূদ্রেরাই বরাবর হয়ে আসছে সর্বক্ষেত্রে অপাংক্তেয়।

ভারতের এই সনাতন পথে একটি দোষের কারণ ঘটেছিল। জ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের বিধান বা ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী হয়ে পরিচালিত হওয়াতে নিম্নবর্ণের স্বাধীন বিচার-বিবেচনা প্রয়োগের শক্তি ছিল অপেক্ষাকৃত পঙ্গু। মূল পুঁথির রহস্য তাদের অনধিগম্য হয়ে থাকায়, ঐখানে উচ্চেনিম্নে পরস্পর একটা ঠকানো ও ঠেকানোর বিকৃতি প্রবৃত্তির ছিদ্রপথ সর্বদাই ছিল গুপ্ত হয়ে। পাশ্চাত্য ব্যবস্থায় এল সমান আক্ষরিক অধিকার। ফলে নিম্নরা বই প'ড়ে জ্ঞানে-গুণে নিজেরাই সবটা আয়ত্ত করে নেবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। তারা পুঁথিগত জ্ঞানলাভ করল বটে, কিন্তু সেই জ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগের অধিকার পেল না নিজেদের সামাজিক পরিবেশের অসংগতি ও স্বভাবগত কতকগুলি ত্রুটির জন্য। অনেক স্থলে উচ্চে-

নিয়ে নানা বিষয়ে অধিকার-লাভ নিয়ে লাগল রেষারেষি। অবিশ্বাস ও বিদ্বেষে পরস্পরের যোগসূত্র হয়ে গেল ছিন্ন। শিক্ষায় ভারতের অধিকারবাদের প্রচলিত ধারা আর সক্রিয় রইল না। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা এসে এদেশের বহুদিনকার শিক্ষার ভিত্ ও সমাজ-শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করে দিল।

এদেশের মতো না হয়েও পাশ্চাত্যেও এক ধরনের জাতিভেদ আছে—তা আছে তাদের আর্থিক অবস্থা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে। বড়োলোক ছোটো-লোকে, লর্ডে ও কমন্সে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতে তাদের সামাজিক অবস্থা ধাপে-ধাপে বিভক্ত। তবে সে-ভেদ সকলের পক্ষেই সাময়িক এবং সবই পরিবর্তন-সাপেক্ষ; আর সে-পরিবর্তনের চেষ্টার স্বীকৃতি থেকেই সকলের সমান অধিকার নিয়ে শিক্ষা হয়েছে সেখানে সর্বজনীন।

কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রেণীভেদ জিইয়ে রেখে, পরিবেশ ও শিক্ষায় সম-অধিকার-বিধির ফল পাশ্চাত্যেও ভুগতে হচ্ছে। এত যে যুদ্ধ-বিগ্রহ—সে তো মানুষের ভিতরকার ভণ্ডামি, হিংসাদ্বেষ ও লোভেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি! এ সব বিপত্তি পাশ্চাত্যের মতো বা পাশ্চাত্য-প্রভাবান্বিত দেশ ও সমাজের মতো এমন ঘটছে আর কোথায়! আর কেনই বা তা ঘটছে? সামাজিক পরিবেশ ও প্রবৃত্তিগত অধিকার খতিয়ে না দেখেই সকলকে সমশিক্ষা-বিতরণ এর মূল কারণ কিনা, তা বিশেষ ক'রেই বিবেচনার বিষয়।

একটি হাসপাতালে চিকিৎসার্থী জমেছে পঞ্চাশ জন। সবাই রোগী ব'লে সবাইকে তো সেখানে এক কুইনিন-মিক্শ্চার দেওয়া চলতে পারে না; সেই এক ব্যবস্থা দিলে জ্বরের রোগীর ক্ষেত্রে তাতে কাজ করবে, কিন্তু পেটের অসুখ বা ফোট-পাঁচড়ার বেলায় হবে তা নিষ্ফল। রোগ বুঝে বুঝেই ডাক্তারকে ব্যবস্থা দিতে হয়। শিক্ষাতেও তেমনি হওয়া উচিত, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে এখন সে-ব্যবস্থা নেই। দু'টাকা বেতন দিলেই সবাই ক্লাসে পড়তে পারে একই রুটিন-মাফিক্ পড়া। যে-কেউ ছাপার বই পড়তে পারল, বড় কথা, বড় খবরের সেই হল বাহক। বুঝুক না বুঝুক দু-কথা বলতে বাধা নেই কারোই, কিন্তু সে-কথা অনুযায়ী কাজ করার স্বাভাবিক তাগিদ আছে অল্প লোকেরই মনে। এজন্য বিদ্যা বাড়ে কিন্তু চরিত্র গড়ে কম।

গুরুগৃহ বা নালন্দা বিক্রমশিলার মতো শিক্ষাবাসের সম-পরিবেশে দৈনিক জীবনযাত্রাতে সম-অবস্থায় থেকে অধ্যাপকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তখনকার মতো বিদ্যা ও জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করার রীতি এখন দ্বিজ বা উচ্চবর্ণদের

ক্ষেত্রেও যেমন সেরূপ নেই, সেই সঙ্গে নেই জনসাধারণের শ্রুতিশিক্ষার সেই আনন্দ-প্রবাহটি। সামাজিক অধিকার ভেদে শিক্ষাস্থলেও পর্যায় ভেদ করে বিশেষ বিশেষ পাঠ ও সংস্কার বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জন্য আগে সাধারণত কিরূপ বিধিবদ্ধ করে দেওয়া ছিল,—শূদ্রের বেদ-পাঠের অনধিকারের কথা ও একলব্যের কাহিনী থেকে তার আভাস মেলে। এখনকার শিক্ষালয়ে সেই অধিকারীভেদ-মূলক শিক্ষাপ্রথাও উঠে গেছে।

ভারতের বিদ্যালয়ের যে শিক্ষা ছিল বিশেষ শ্রেণীক শিক্ষা, এখন পাশ্চাত্য প্রভাবে সে শিক্ষা হয়েছে সর্বশ্রেণীক, সেই সঙ্গে হয়েছে তা প্রধানত অর্থকরী-বৃত্তিমুখী। মানুষের ভদ্রতা, সততা, ত্যাগ, শৌর্য-বীর্য, সহিষ্ণুতা, আত্মীয়তা—হৃদয়ের এ সকল শক্তি ও উদারতা—সব ছাপিয়ে উঠেছে 'উদরতা'র কথা। ওই সব ভালো ভালো শব্দ ও তার ব্যাখ্যা বিশদভাবেই লেখা আছে ছাপার বইতে; বিদ্যালয়ে কার্যক্ষেত্রে তার ব্যবহারের শিক্ষাতাগিদ সক্রিয় না থাকলেও জমি যাদের তৈরী, বীজ পেয়ে তাদের ক্ষেত্রে ফল ফলেছে ঐ পুঁথিপড়া ও শিক্ষকের তত্ত্বালোচনাটুকু থেকেই। তত্ত্বের—ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাজাত শিক্ষার অভাবে বাকি সকলের পক্ষে মনের প্রসারের ফল দেখিয়ে আধুনিক শিক্ষা তত এগুতে পারছে না।

চিরদিনই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষ দৈহিক শক্তিতে এবং আচারে সীমাবদ্ধ,—সেখানে তারা পরস্পর পৃথক। একমাত্র মনের ক্ষেত্রেই সকলে চিন্তায় ও জ্ঞানে অপেক্ষাকৃত সীমামুক্ত এবং সকলের সঙ্গে নিজেকে মানুষ এক ক'রে ভাবলে ভাবতে পারে সেখানেই। একটি প্রাচীন বাংলা কাব্যে এই সত্যটিকে উদ্ঘাটিত ক'রে জীব ও শিব তত্ত্বাকারে বলা হয়েছে। তাতে আছে,—

জন্ম-মৃত্যু নাঞি তার শিব মোক্ষধাম,
অবস্থিতি সদা তেঞি সদাশিব নাম।
জিহেঁা জীব তিঁহো শিব শিব জীবময়,
তার মধ্যে সজীব কেবল শিব হয়।
জীবরূপে পাশবদ্ধ স্থিতি চরাচরে,
শিবরূপে পাশমুক্ত চিন্তামণি পুরে।

মানব-সমাজ-ব্যবস্থায় ভারতীয় হিন্দুর সনাতন সিদ্ধান্তটি মোটামুটি এই। বনেদী পাশ্চাত্য-সমাজও বৃত্তি এবং বৈষয়িক অবস্থায় সকলের স্বাতন্ত্র্যের ব্যবস্থা চলতে দিয়ে এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বজনীন অধিকারের পথ খোলা রেখে বাস্তবত এই ভারতীয় সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করছে যে, আচারব্যবহারে লোক

সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা

এক

মানুষের আজ জিজ্ঞাসা হচ্ছে, সমাজ ও সভ্যতার লক্ষ্য হবে কোন্ জিনিসটি —গুণ, আত্মীয়তা, না কেবল জৈবধর্ম? অথবা, এই তিনেরই সামঞ্জস্য?

এর মধ্যে গুণ বা ক্ষমতার সাহায্যে আমরা পৃথিবীর জ্ঞান ও বাস্তব ঐশ্বর্য বাড়িয়ে থাকি, সে সঙ্গে নিজেরাও নানাদিকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করি। আত্মীয়তাও একপ্রকার গুণবিশেষ; সে গুণ আমাদের সকলের সঙ্গে মেলায়, কোনও গুণ থাকুক না থাকুক, আত্মীয়কে নিজের মত করেই আমরা অনুভব করতে পারি। আর, জৈবধর্ম আমাদের ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে আপনা থেকে আমাদের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বৃত্তি ও অনুভবের মধ্যে টেনে নিয়ে চলে। এই তিনটি জিনিসের প্রবর্তনা স্বল্পাধিক সকলের মধ্যেই মিশিয়ে আছে। কিন্তু ঘটনাচক্রে ও পরিবেশের প্রভাবে এই তিনের মধ্যে কোন কোনটার চর্চা কম বেশি হয়ে থাকে এবং সে অনুযায়ী প্রাণিসমাজ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মানুষের সভ্যতায় আজ এই বিশেষ দিকের চর্চার আধিক্য দেখা যাচ্ছে খুব স্পষ্ট করেই। আত্মীয়তা হয়ে গেছে গৌণ। গুণ এবং জৈবধর্মের চর্চাই হয়ে উঠেছে মুখ্য। কোন একটা গুণের সাহায্যে সকলকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠে জৈবধর্মের পরিতৃপ্তি সাধন করাই জীবনযাত্রার সাধারণ আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুণের মধ্যেও বিশেষ বিদ্যাচর্চার দিকেই গেছে শিক্ষিত শ্রেণীর ঝোঁক।

"জিয়োগ্রাফি অব হাঙ্গার" নামক গ্রন্থে মনস্বী কাস্ত্রো বলেছেন—"সম্প্রতি ইউরোপ এবং আমেরিকায় এক বিশেষজ্ঞের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারা নিজ নিজ খণ্ড বিষয় সম্বন্ধে প্রচণ্ড বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারেন, কিন্তু সাধারণ সংস্কৃতি বা রাজনীতি বিষয়ে ইহাদের দৃষ্টিশক্তি খুব কম। ওর্টেগা ই কাসেট বলিয়াছেন, ইহারা এক নূতন বর্বর জাতি, যত বেশি বিদ্যা অর্জন করিয়াছে, ততই কিন্তু ইহাদের সংস্কৃতি কমিয়া গিয়াছে (the new Barbarians—men ever more and more learned and less and less cultured)। সব চেয়ে দুঃখের কথা, ইহারাই এখন আমাদের সমাজের শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত। এই সব সংকীর্ণদৃষ্টি বিশেষজ্ঞ—men who know more and more about less and less—সভ্য জীবনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক জীব। বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে বুভুক্ষাকে সবদিক দিয়া বিচার করিতেছে এমন লোকও চোখে পড়িল না।"

এখানে পাশ্চাত্ত্য দেশ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, আমাদের সম্বন্ধেও তা খাটে, কারণ আজ আমরাও ঐ সভ্যতার বাহক বা উপজাত বিষয়মাত্র। বিশেষজ্ঞ হবার জন্যই আমাদেরও ঝোঁক। আমাদের শিক্ষাই বিশেষ করে সেই ঝোঁক ধরিয়ে দেয়। এই ঝোঁক নানারকমেই হয়ে থাকে,—যেমন বৈষয়িক বিদ্যায়, তেমনি আধ্যাত্মিক বিদ্যায়। এর ফল মানুষের শ্রেণীবৈষম্য। সেই বৈষম্যের মাত্রা বেড়ে যেতে যেতে মানুষকে মানুষের নিকট থেকে এতই দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে যে, আজ সমাজে মানুষের কাছে মানুষের মূল্যই গেছে কমে। মানুষ এখন একটা তত্ত্ব মাত্রে এসে ঠেকেছে, একজন ব্যক্তিহিসাবে জীবের অনুভূতিবৃদ্ধির অবকাশ সমাজে ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। বিশেষ বিশেষ শক্তি দক্ষতা দ্বারা সে আপনাকে সকলের চেয়ে প্রকাশমান করে না তুললে কেউ তাকে গণ্য করে না, তার অস্তিত্ব হয় বিপন্ন। বাঁচবার উপায় এখন বিশেষ শক্তির সঞ্চয়। বিশেষজ্ঞতার ঝোঁক ধরেছে সেই সোজা বৃদ্ধির চেষ্টা থেকেই।

জন্মক্ষণে প্রথম আমরা যেদিন পৃথিবীর মুখ দেখি, সেদিন আমাদের বিশেষ কোন ঝোঁক বা গুণের উৎকর্ষ দেখা দেয় না। মায়ের আত্মীয়তাই আমাদের জীবন বাঁচায়; আর সেই জীবনের ভিত্তিতেই ভাবীকালের আমাদের যত দোষ-গুণ প্রকাশ পেতে থাকে। এই প্রাকৃতিক ধারার নির্দেশ অনুসারে ধরে নিতে হয় আত্মীয়তাই সৃষ্টির মূল। সৃষ্টির উপকরণ অন্যান্য বিশেষ বিশেষ বিদ্যা ও গুণগুলি হচ্ছে আত্মীয়তারই ডালপালা।

সুতরাং মানুষের দেখা উচিত, সব কিছু চর্চার মধ্যে আত্মীয়তা যেন সর্বত্রই অক্ষয় থাকে,—তার পরিপন্থী কিছু করা না হয়। জননীরূপে আত্মীয়তাই আমাদের জীবনের মূলে নিহিত থেকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধির এই সুচির ইঙ্গিত বহন করছে। যার থেকে উৎপত্তি, তার মধ্যেই লয়;—ঘুরে ঘুরে এই হচ্ছে চক্রাবর্তনের ইতিহাস। যে-সৃষ্টিপ্রবৃত্ত গুণের মূলে বা চরম লক্ষ্যে আত্মীয়তা নেই, জীবনের সে পরিপন্থী। সুতরাং সকল গুণকে আত্মীয়তার অনুকূল করে অনুশীলন করাই হচ্ছে মানুষের শাশ্বত আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,—

> "চান ভগবান প্রেম দিয়ে তার
>
> গড়া হবে দেবালয়,
>
> মানুষ আকাশে উঁচু করে তোলে
>
> ইঁট পাথরের জয়।"

তার মানে, মহাকবিরও মত, জগতে প্রাণের চেয়ে বস্তুর প্রভাব বাড়ছে ও

আত্মীয়তার চেয়ে বাড়ছে কৃতিত্বের মূল্য। সমাজের এই কৃতিত্বকে এখন আত্মীয়তার অনুকূল করে নিয়ন্ত্রিত করার উপরেই সামাজিক কল্যাণ নির্ভর করছে।

সমাজের উপরে নীচে ছোটয় বড়য় সর্বদিকে আত্মীয়তার অনুভূতি দিয়ে ভরিয়ে রাখতে হলে মানুষের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ অভিজ্ঞতার সংযোগ চাই। শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হলেই সমাজে সর্বমুখীন অভিজ্ঞতার বিস্তার সম্ভব হতে পারে। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার অভাবে সম্পূর্ণ দৃষ্টি নেই কারও চোখে। তাই অভিজ্ঞতার অভাবে পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধার যুক্তিগুলি পরস্পরের বোধগম্য হয় না, সহানুভূতিও জাগে না। পরস্পর মিলন ও একাত্মতার সৃষ্টি হবে কি করে।

আজ শিক্ষা বলতেই কতকগুলি স্কুল-কলেজ, বোর্ডিং খেলার মাঠ, লাইব্রেরি, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও পুঁথিপত্রের বাঁধাধরা ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকঘণ্টার জন্য এদের যোগাযোগ বর্তমান থাকে। দেশে-বিদেশে সর্বত্রই মোটামুটি এই ব্যবস্থা চলছে।

সর্বাঙ্গীণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্র প্রচলিত শিক্ষায় প্রশস্ত নয়। যে লোক যে বিষয়ের চর্চা করে তার মনের চলাচল সেই বিষয়ের কোঠাতেই বাঁধা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ধর্ম, রাজনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি, চিকিৎসা, আমোদপ্রমোদ —নানা বিভাগে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা ও জীবনের অভিজ্ঞতা বয়ে চলেছে। বিশেষ শিক্ষা বিষয়বস্তুকে বিশেষ বিশেষ দিক দিয়ে একপেশে করে দেখতে শেখাচ্ছে। এ শিক্ষা কলের কাজ করছে। তার ছাঁচ একই রকমের। —সর্বত্র খোপকাটা। তার পাল্লায় যে একবার এসে পড়েছে তার সবকিছুকেই সে তার সেই বিশেষ গড়নের ছাঁচে ফেলে একাকার করে গড়ে ছাড়বে—এই তার বিশেষ লক্ষ্য। ডাক্তার ডাক্তারিই শিখবে, আর, ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া আর কিছু জানবে না।

এইভাবে আজকাল শিক্ষা চলছে আর্টস্ বা সায়েন্স, সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক নানা স্বতন্ত্র সব বিভাগে। বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করাই তার উদ্দেশ্য। তাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে পুরাকালের ভারতীয় জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রথায় কি দোষ ছিল? তাতে বংশানুক্রমে জাতীয় বৃত্তির অনুশীলনের থেকে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির কাজ আরও পাকা রকমে হত; সুতরাং সেটাই বরাবর আদর্শরূপে অনুসৃত হবার কথা। কিন্তু আধুনিক সমাজ তা স্বীকার করেন কই! জন্মগত জাতিভেদের স্থানে এখন কর্মগত শ্রেণীভেদের সৃষ্টি হয়েছে। যতই এসব পরিবর্তন হক, বিশেষ চর্চার রীতি সমাজে পূর্ববৎ অব্যাহতই আছে। এবং সে-সঙ্গে বিষয়সম্পদ এবং অভিজ্ঞতাও এক-এক কেন্দ্রে গিয়ে কায়েমীভাবে পূর্ববৎই সংহত হচ্ছে। সর্বসাধারণে

তার নাগাল পাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"শক্তি ব্যক্তি-বিশেষে একান্ত হয়ে উঠে মানুষকে যেন বিচ্ছিন্ন না করে· শক্তি যেন সর্বদাই নিজের সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করতে পারে।" কবি যতই আমাদের উপদেশ দিন—সমাজে শক্তি বিশেষ-জ্ঞান ও বিষয়সম্পত্তির সাহায্যে ব্যক্তিবিশেষেরই মধ্যে একান্ত হয়ে উঠে মানুষকে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। তিনি যে বলেছেন—"শক্তি········ ব্যক্তি বা দলবিশেষে সংহত না হয়ে যেন সর্বসাধারণে ব্যাপ্ত হয়"—সে কথাকে কার্যকরী করতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এমন ধরণের শিক্ষা দেওয়া চাই, যার ফলে প্রত্যেকের মধ্যেই সর্বমুখী শিক্ষার অভিজ্ঞতা কিছু-কিছু সঞ্চারিত হয়। জীবনের ও সমাজের আদর্শ যদি প্রথম থেকে এইরূপ সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অপরিহার্যতা স্বীকার করে চলে, তবে নিশ্চয়ই সে-অনুযায়ী শিক্ষার বিস্তারিত কার্যক্রম সমাজে পরিকল্পিত হবে।

একদিকে বিশেষ কতগুলি লোক বিশেষজ্ঞ ও বিত্তশালী হচ্ছে, অপরদিকে অধিকাংশ লোক বোকা ও বেকার থাকছে। এর চেয়ে, সমগ্র জনসাধারণ যদি জীবনের সর্ববিষয়ে মোটামুটি শিক্ষিত হয়ে খেয়ে পরে স্বাস্থ্যবান অবস্থায় দিন কাটাতে পারে সেটাই দেশের পক্ষে অধিকতর লাভজনক।

জার্মানীতে আগে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিত কর্মিক সৃষ্টি হত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তাদের নিয়ে গিয়ে নিজেদের দেশে মোটাবেতনে কাজে লাগাত। পরিচালনার দক্ষতাগুণে তারা সে-সব দেশের লোককে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পবাণিজ্যাদি নানাদিক দিয়ে সমুন্নত করে তুলত। কিন্তু জার্মানীর দুর্দশা ঘুচত না কিছুতেই। হিটলার যখন তাঁর নূতন পরিকল্পনা প্রবর্তন করলেন, জার্মানীর সমস্ত লোক সে পরিকল্পনায় শিক্ষিত হল। দেশের অবস্থা গেল বদলে। সংঘবদ্ধ শিক্ষিত জার্মান জনসাধারণ পৃথিবীজয়ের অভিযান শুরু করল। অতি অল্পদিনের মধ্যে শক্তি ও সম্পদের যে বিপুল প্রকাশ তারা দেখাল, তা সকলেরই জানা আছে। সংকীর্ণ জাতীয়তার অনুসারী সামরিক উন্মাদনা জার্মানীকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে তার আত্মবিলোপ ঘটাল, বিশ্বেও তাকে নিন্দিত করল। কিন্তু তার আপামর সর্বাঙ্গীণ সমাজের শিক্ষা ও সংগঠন চেষ্টার বিস্ময়কর ফল সে যা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তা অবশ্যই চিরকাল সকল দেশের পক্ষে অনুসরণযোগ্য আদর্শ হয়ে থাকবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সোভিয়েট রুশিয়ার সমৃদ্ধির ইতিহাসেও দেখা যায়, জনসাধারণের সংগঠনের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিচিত্র সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে। এ-সব সার্থকতা ও ব্যর্থতার ইতিহাসের থেকে মহাকালের ইঙ্গিত

আসছে যে, যতদিন জনসমাজ সর্বাঙ্গীণভাবে সুগঠিত না হবে, ততদিন দেশের কোনদিকের জাগরণই পূর্ণরূপে কার্যকর হবার নয়। সবদিকে সমুন্নত জনসমাজ গড়ে তোলবার জন্যই চাই তাদের সকলের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা। এক্ষণে জ্ঞাতব্য— সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা জিনিসটি কি?

এক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তক গান্ধীজীর একটি বাণী বিশেষ করেই স্মরণীয়। তিনি বলেন,—"Man is neither mere intellect, nor the gross animal body, nor the heart nor soul alone. A proper and harmonious combination of all the three is required for the making of the whole man and constitutes the true economics of education." (Intellectual development or dissipation—Basic Education.) মানুষ হচ্ছে দেহ মন ও আত্মার সমবায়সম্পন্ন একটি সর্বাঙ্গীণ জীব। সেই হেতু তার শিক্ষার মধ্যেও দেহ, মন ও আত্মা—এই তিনেরই অনুশীলনের উপযুক্ত উপায় সন্নিবেশিত করতে হবে, মহাত্মাজীর বাণীর মর্ম এই। একযোগে এই তিন বিষয়ের অনুশীলনই আদর্শ শিক্ষা বা সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা।

মানসিক বা আধ্যাত্মিক সাধনায় যতই যিনি উন্নত হন, যতক্ষণ তিনি দেহ-ত্যাগ না করছেন ততক্ষণ দেহের দায়িত্ব তাঁকে স্বীকার করতেই হয়। ঠিক তেমনি একজন লোক যতক্ষণ দেহে বেঁচে আছে, ততক্ষণ তার মধ্যে মন ও আত্মার প্রসারের সম্ভাবনাও সে বহন করছে। সে সম্ভাবনাকে বাস্তবত সফল না করে দিনাতিপাত করা মনুষ্যজীবনকে পঙ্গু করে আংশিকভাবে কোনমতে বেঁচে থাকা মাত্র।

কেবল দেহসর্বস্ব হয়ে বেঁচে থাকাই যাদের লক্ষ্য এরূপ সমাজের পক্ষে খাওয়া-পরা, স্বাস্থ্য ও আত্মরক্ষার কৌশল জানাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলে বিবেচিত হতে পারে; কিন্তু তার উপরে যারা মনের প্রসারও চায় তাদের পক্ষে দৈহিক চর্চা ছাড়াও আরও নানা বিষয় চিন্তা করা, রচনা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে! এই শ্রেণীর শিক্ষায় লেখাপড়ার সাহায্যে জ্ঞান-বুদ্ধির চর্চাই প্রাধান্য পায়। আরও ঊর্ধ্ব ওর আছে। বিচারশীল সংবেদনপূর্ণ স্তরে মনকে যদি প্রতিষ্ঠা দিতে হয়, তবে ধ্যানধারণা শমদমতিতিক্ষাদি অভ্যাসের অপেক্ষা করে। কারণ এরূপ আত্মজ্ঞানধর্মী, তাদের কাছে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও তদনুযায়ী আচরণই শিক্ষার বিশিষ্ট এক অংশ অধিকার করে বসে। কোন একরকমের শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষার স্থান গ্রহণ করতে পারে না। এই ধরণের প্রত্যেকটি শিক্ষাকে বলা যায় বিশেষ বা একপেশে শিক্ষা।

দেহ, মন, আত্মা—এই তিনের মধ্যে কোন-একটির বিশেষ চর্চাকে পেশারূপে অবলম্বন করে সমবায়-পদ্ধতিতে পরস্পরের শ্রমজাত ফল অর্থের মাধ্যমে বিনিময় দ্বারা জীবনের পুষ্টি সাধন করতে গিয়ে, আজ দেখা গেল সমাজে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মানুষই কেবল আমদানী হচ্ছে। একদল মানুষ দৈহিক খাটুনি নিয়েই দিন কাটাচ্ছে, তারা চাষাভূষাকুলীমজুরের দল; অন্যদলের তেমনি চলছে মানসিক খাটুনি, তারা ব্যবসা বা চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের দল। আর একদলের পক্ষে আধ্যাত্মিক চর্চার পরে আর অন্য কাজের অবকাশ হচ্ছে না,– অনেক গুরু-পুরোহিত মহান্ত সাধুসন্ন্যাসীকে এই দলে ধরা যায়। আরও একদল আছে, ভিখিরি আর জমিদার মহাজনের দল, এদের দুই শ্রেণীরই পেশা কোন বৃত্তির চর্চা না করে চেয়ে চিন্তে বা জোর জুলুম করে আয় সংগ্রহ করা। এদের সকলেরই জীবন পূর্ণাঙ্গ আদর্শের মাপকাঠিতে ব্যর্থ, বিড়ম্বিত বলে বিবেচিত হবার যোগ্য।

সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা ধরাবে মানুষকে সব রকমের রুচি। যত দিক দিয়ে যার মূল্য আছে, সে মূল্য জানা ও সে মূল্য চুকিয়ে দেওয়াই তার কাজ। সে যে পরিমাণে চায় লেখাপড়া, কিংবা শিল্পবিদ্যার চর্চা, সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণেই চায় দৈহিকশ্রমে জীবিকার্জন ও আত্মীয়তার প্রসার। সে জানে কল্যাণের উপায় হচ্ছে—সবদিক দিয়েই হিসাব করে চলা। পরিবেশের সব বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যতটা দূর অবধি যে বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আয়ত্ত রেখে চলা যায়, এক এক বিষয়ে ততদূর অগ্রসর হওয়াই নিরাপদ। কেননা, মানুষের একদিককার প্রগতি বা কর্মের দৌড়ই আজ অন্যদিককার দুর্গতির কারণ হয়ে উঠছে। বিদ্যা বা বিষয় বাড়াবার ঝোঁকে পড়ে চারদিকের আনুষঙ্গিক দায়িত্বের পরিমাণও লোকে এত বাড়িয়ে ফেলেছে যে, সেটা শেষে সামলে ওঠা হয়েছে দায়;—বর্তমান শিক্ষা ও সভ্যতায় মানুষের অবস্থা হচ্ছে সাপের ছুঁচো গেলার মতো। সর্বত্র এই বেহিসাবের দৌড় চলছে। উন্নতির মান অভিশাপস্বরূপ হয়ে যত সব ভারবাহী সাধারণ মানুষের দম বের করে ছাড়ছে।

বর্তমানে এমন হয়েছে যে, সারা দেহটা আমাদের হলেও আমরা কেবল মস্তিষ্কের চর্চাকেই শিক্ষিত হবার একমাত্র উপায় বলে ধরে নিয়েছি। লেখাপড়াটা রপ্ত হলেই হল, শরীর রুগ্ন থাক, চরিত্র কলুষিত হক,—তাতে তেমন কিছু আসে যায় না; শিক্ষিতের আভিজাত্য ও সুযোগসুবিধা থেকে তাতে বঞ্চিত হওয়ার তেমন আশঙ্কা নেই। পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে, তবে যদি জোটে চাকরি। সুতরাং দেশে চাই একান্ত করে বিদ্যার প্রসার, হচ্ছেও তাই। পাস করে চাকরি

জুটলেও হয়তো বা ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুণ জীবনের সুখ চিরতরে যায় নষ্ট হয়ে। ... রক্ষার জন্যও সুগঠিত দেহ দরকার। এজন্য দৈহিক চর্চার দরকার। ... বাস্তবে এত ঘা খাওয়া সত্ত্বেও আজকাল বেশির ভাগ শিক্ষিত লোককে আজও মাথার কাজের দিকেই ঝুঁকতে দেখা যায়। হাতের কাজের দিকে যায় দায়ে ঠেকে। বিদ্বানদের মান উঁচু। কর্মিকরা এখনও তার কাছাকাছি যেতে পারেনি। কিন্তু আসলে মান অধিকার করছে সেই বুদ্ধিমানরা, যেন তেন প্রকারেণ যারা সুযোগের ব্যবহার করতে পারে। বিদ্যা তাদের সেই পাটোয়ারী বুদ্ধিকে আরও খুলে দেবার সাহায্যে লাগছে।

মাথার কাজের দল আর হাতের কাজের দল—দুই আলাদা শ্রেণী। পরস্পরের মধ্যে কাজের যোগ ঘনিষ্ঠ না থাকায়, স্বার্থ নিয়ে, ব্যবহার নিয়ে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে, সর্বাঙ্গীণ শিক্ষায়। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে শিশুকাল থেকে যদি তার শিক্ষা হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে এগোতে থাকে, তবে সকলেই হাত ও মাথার কাজে কেবল যে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে তাই নয়, ভাবী গোটা জীবন ভরেই জীবনযাত্রার প্রতিপদে হাত ও মাথার কাজকে তারা অবিচ্ছেদ্য জানবে। সকলেই এইভাবে এক শিক্ষাধারায় বর্ধিত হয়ে বিশেষ কোন কাজ বা বিশেষ কোন কাজের মানুষকে ছোট বা বড় বলে দেখে শ্রেণীভেদের বৈষম্য বোধ করবে না। অহংকার হিংসা ঘৃণা প্রভৃতি শ্রেণী-সংঘর্ষ সৃষ্টির কারণগুলির মূলোচ্ছেদ তার থেকেই ঘটবে। এ বিষয়ে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর অভিমত উল্লেখযোগ্য। শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ তাঁর সদ্য প্রকাশিত "Education and Reconstruction" নামক গ্রন্থের "হাতের কাজের শিক্ষাগত মূল্য" (Educational Value of Manual Training) আলোচনার নিবন্ধটিতে বলেছেন, "হাত ও মাথার কাজের মধ্যে পারস্পরিক যোগ যখনই অস্বীকার করা হয়েছে, এবং এর মধ্যে কোন একটাকেই মাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তখনই সমাজের ঐক্য গেছে ভেঙে, অসন্তোষ ও পরস্পরকে অবিশ্বাস করা শুরু হয়েছে তখন থেকেই। পৃথিবীব্যাপী বর্তমানে যে সংঘর্ষ চলছে, এর মূলে নিহিত রয়েছে এই একই কারণ। সম্ভবত সেইদিনই এ সংঘর্ষের সূত্রপাত, যেদিন একদল লোক বলতে শুরু করল যে তারাই সমস্ত সমাজের হিতাহিতের কথা ভাববে, আর অন্যরা কেবল তাদের হুকুম তামিল করে চলবে। আজ যারা শ্রমিক নামে অভিহিত হচ্ছে, প্রথম প্রথম তারা সানন্দেই তাদের কাজের ভার গ্রহণ করল ; কিন্তু যেমন তাদের চেতনা জাগল, তারা তখন দেখতে পেল যে

যাদের তারা খাওয়া-পরা জোগাচ্ছে, তারাই তাদের ঘৃণার চোখে দেখছে। সমাজের এই মর্মান্তিক অবস্থা দেখে জন রাস্কিন মন্তব্য করতে বাধ্য হলেন যে— "আমরা আজকাল সবসময়ই বিদ্যাবুদ্ধি ও হাতের কাজকে পৃথক করে দেখে থাকি। একজন কেবল সবসময় চিন্তার কাজ করবে, আর একজন সারাক্ষণ খাটবে; তাদের একজনকে বলব ভদ্রলোক, অন্যজনকে বলব হুকুমের চাকর; কিন্তু উচিত হচ্ছে যে, শ্রমিক যে সেও কিছুসময় ভাববে এবং যে ভাবুক সেও তেমনি কিছুসময় গায়ে খাটবে। এই করে ঠিক যা হলে ভদ্রলোক বলা যায়, দুজনেই তাই হবে। কিন্তু আমরা দুজনকেই অভদ্র করে তুলবার আয়োজন করছি; একজন আর একজনকে হিংসা করছে, অন্যজনও তার ভাইকে ঘৃণা করছে এবং এর দ্বারা মানুষের গোটা সমাজটাই কতকগুলি অসুস্থমন ভাবুক এবং দুর্গত শ্রমিকে ভরে উঠল।"

Whenever this mutual relationship of hands to head has been denied and all the importance given to one, there the socicty has broken its unity and created discontent and want of faith in one another. At the root of the conflict that is going on at the presant moment throughout the world lies the same truth. Perhaps the seed of the conflict was sown that very day when came out a class of people who said that they should think for the whole community and the rest should do what they bade. At first the latter who are now-a-days termed as labourers, gladly undertook the burden assigned to them, but when their consciousness awakened they found that the very men whom they provided with their living looked down upon with contempt. This pitiful state of society made John Ruskin make the following remark, "We are always in these days endeavouring to separate intellect and manual labour; we want one man to be always thinking, another to be always working and we call one a gentleman and the other an operative, whereas the workman ought often to be thinking and thinker often to be working, and both should be gentlemen in the best sense. As it is it makes both ungentle, the one envying, the other despising his brother and the mass of the society is made up of morbid thinkers and miserable workers."

দুই

যে বিষয়ের চর্চায় অর্থাগম হবে, লোকে এখন সেই বিষয়ের চর্চাতেই ঝুঁকছে। অর্থ, বিশেষ শিক্ষা, শ্রেণীভেদ, পরনির্ভরতা, অসহায়তা, অভিমান, সংবেদনহীনতা ও প্রতিযোগিতা—এ সবই পরস্পরের হাতধরা। এ সকলেরই পরিণতি শ্রেণী সংঘর্ষে। এরা সভ্যতাকে বাইরে যতই এগিয়ে দিক, ভিতরে আত্মীয়তার অভাব সৃষ্টি করে অধিকাংশ সম্পদই অধিকাংশ লোকের নাগালের বাইরে রেখে দিচ্ছে। এদের উপযোগিতায় সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। বিশেষ শিক্ষা, বিশেষ বৃত্তির পথ বা এদের আনুষঙ্গিক অর্থমূল্য বিনিময় ব্যবস্থা আমাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া দূরে থাক্, এরা যখন সকলকে দেহে বেঁচে থাকার প্রাথমিক নিরাপত্তাটুকু জোগাতেও ব্যর্থ প্রতিপন্ন হচ্ছে, তখন এ সব পথের অনুসরণ করার আর কোনো যুক্তিই থাকতে পারে না। যারা খেতে না পেয়ে মরেই গেল, তাদের কাছে কোনো সভ্যতা বা সম্পদের কী সার্থকতা থাকতে পারে? মানুষের সৃষ্টির কাল থেকে তিন লক্ষ বছর কেটে গেল। (The universe around us. P 13 Geans) ভবিষ্যতেও যে এই শিক্ষা থেকে মানুষের পক্ষে সর্বাঙ্গীণ রকমের লাভ কিছু হবে, তার আশায় আর সময়ক্ষেপ না করাই বোধ হয় শ্রেয়।

অনেকে মনে করেন, শিক্ষার ধারা যা চলে আসছে, মোটামুটি তাই চলা ভালো। পাশ্চাত্ত্য এই ধারা অনুসরণ করেই আমরা একদিন পাশ্চাত্ত্যের সমকক্ষ হলে ও হতে পারি। না হতে পারলে পৃথিবীর প্রতিযোগী শক্তিদের গ্রাস থেকে আমাদের রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হবে। যথাশীঘ্র বিজ্ঞানে আমাদের উন্নত হওয়া চাই। তা না হলে পরিকল্পনাগুলিকে সার্থক করা যাবে না, বিশেষ করে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সামরিক সংগঠনে আমরা স্বাবলম্বী হতে পারব না। যার যার শক্তি নিয়ে নানা দিক থেকে সকলে এসে সমবেত হোক; বিজ্ঞানচর্চা, বস্তু উৎপাদন এবং সমবায়ই দেশকে বাঁচাবার প্রকৃষ্ট পথ।'

দেখা যাক, এ মত বস্তুতঃ কতদূর সত্য। আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি বিজ্ঞানচর্চায় সমুন্নত, তারা উৎপাদন দ্বারা ঐশ্বর্যশালী, সমবায়ও যার যার স্বদেশে কম নেই। তবু জাতিহিসাবে তারা পরস্পরে মিলতে পারল না তো। মানুষের সর্বাঙ্গীণ ধ্বংসের বিভীষিকা জাগিয়ে রেখে এক দুর্বার সংগ্রামের দিকেই তারা

মরীয়া হয়ে ছুটে চলেছে। প্রবল রাষ্ট্রশক্তিগুলির সাম্রাজ্যলিপ্সু অভিযানের মুখে পৃথিবীর স্বতন্ত্র জাতি বা রাষ্ট্রগুলির বশ্যতা স্বীকার অনিবার্য হয়ে উঠল। শক্তি ও সমবায়ের এই তো আধুনিক পরিণতি। সমবায়ের নামে সবাই অবশেষে পৃথিবী-ব্যাপী মাৎস্যন্যায়ের আমদানি করছে। শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির স্বরূপ যারা আগে থেকে বুঝতে পারে না, বড় বড় কথার ভুলে তারাই বেঘোরে মারা পড়ে।

শিক্ষায় যাঁরা প্রচলিত পক্ষপাতী, তাঁদের কথায় মনে হয়, আপাতত আত্মরক্ষার প্রশ্নই আমাদের কাছে বিবেচ্য। আত্মরক্ষার জন্য বিজ্ঞান ও সমবায়ে শক্তিই অন্যতম সহায়। কিন্তু বিজ্ঞান ও সমবায়ের সর্বগ্রাসী পরিণতি যখন চোখের উপরেই প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, এবং তার কবল থেকে আতঙ্কিত আমাদের আত্মরক্ষা পথ খোঁজা যখন জরুরি হয়ে উঠছে, তখন এহেন পথ আদর্শ কিনা, এ প্রশ্নেরও বিচার আবশ্যক।

বিজ্ঞান আমাদের বাস্তব শক্তির অধিকার জোগায়। এর প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু প্রধানত বিজ্ঞানের অনুশীলনই আমাদের বাঁচতে পারে কিনা, সে বিষয়ে নানা কারণেই সন্দেহ জাগে। বস্তুর মধ্যে যত শক্তিই থাক, মানুষের চেতনাশক্তি দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত না হলে তার মূল্য সম্যকরূপ প্রকাশ পায় না। ব্যবহারের দ্বারাই জিনিসের যা কিছু মূল্য দাঁড়ায়। ব্যবহারের কর্তা মানুষ। সংসারে মানুষের চেতনার চেয়ে বড়ো শক্তি আর নেই। সকল মানুষকে যদি সর্বাঙ্গীণ শক্তিসম্পন্ন করে তোলা যায়, তবে আমরা যে আত্মরক্ষার দিকে অপ্রস্তুত থেকে যাব, তা কী করে বলা যায়।

যে পরিমাণে আমরা বিজ্ঞানচর্চা ও সামরিক বিভাগের কাজে অর্থ-সামর্থ্য প্রয়োগ করি, সর্বাঙ্গীণ মানুষ গঠনে কি তার সিকিমাত্রও চেষ্টা করেছি? সামরিক শক্তি, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি বস্তুআশ্রয়ী। আমরা বরাবর বস্তুর উপরে নির্ভরশীল। মানুষের মনের শক্তির উপর নির্ভর করে সেদিক দিয়ে সহ্য ধৈর্য ইত্যাদি সত্যাগ্রহের উপযোগী শিক্ষায় তৈরি হতে কেউ এগোয়নি।

উন্নতমনা একটি মানুষের ব্যক্তিত্ব হাজার হাজার সৈন্য এবং অস্ত্রবলের চেয়ে অধিকতর কার্যকর হয়ে থাকে। তার নিদর্শন এ যুগেও রয়েছেন গান্ধিজী। তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। গোলাগুলির পথ তিনি একান্তভাবেই ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর চরিত্র এবং আচরণ মানুষকে গোলাগুলির চেয়ে বেশি শক্তি জুগিয়েছিল।

বৃটিশশক্তি এ দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হল, দেশে বিজ্ঞানের প্রসারে সামরিক বা শিল্পশক্তির প্রাচুর্য ঘটেছে দেখে নয়,—তাদের টনক নড়েছিল দেশবাসীর মধ্যে

স্বাধীনতাস্পৃহার অদম্য প্রগতি দেখে। যে মনের উপর তারা উপনিবেশের ভিত ফেঁদেছিল সে মনই যখন বদলে যেতে লাগল, তখন আর ভরসা রইল না; এমন কি মিত্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতাও কোন কাজে লাগল না।

আরেক দিকে দেখি, বস্তুবাদের অনুগামী রুশিয়ার সমৃদ্ধির মূলেও রয়েছেন মার্কস্, বস্তু নন্, তিনি একজন মননশীল সচেতন মানুষ। তিনি সমাজ গঠনের নূতন সূত্র ধরিয়ে দিয়ে গেছেন। সেই সূত্র অনুসারে লোকে বস্তু-ব্যবহারের আবশ্যকীয় ব্যবস্থাদি করে নিচ্ছে। সৃষ্টির আদিতে যদিও বস্তুরই আবির্ভাব হয়েছে মনের আগে, কিন্তু এ কথা সত্য, মানুষের স্তরে সৃষ্টি এসে পৌঁছবার পর, বস্তুর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতায় মানুষের মনও বিশেষ অধীশ্বর হয়ে আছে। সুতরাং বস্তু যেমন মনকে গড়ে, তেমনি মনও বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে,—এ দু'কথাই সমানভাবে সত্য বলে মানতে হয়।

মনকে গড়বার কাজে বস্তুর প্রভাব কার্যকর হয় বলে বস্তুর পরিচয় ও ব্যবহার-কৌশল আমাদের আয়ত্ত করা চাই। মানুষের সর্বাঙ্গীণ সংগঠনের কাজে বিজ্ঞানের শিক্ষা সেজন্যই অপরিহার্য। কিন্তু জানতে হবে যে সর্বজনীন প্রীতি, চরিত্র, কর্মোদ্যম ও সদাচরণই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আত্মরক্ষার পক্ষে শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। এর সঙ্গে বস্তুনিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা যুক্ত থাকলে তবেই সেক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ মানুষের উদয়ে সমাজের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধিত হতে পারে। এজন্য, দৈহিক শ্রম, বিজ্ঞান, চারুকলা এবং গৃহস্থালীর মত সমভাবেই মনঃশক্তির রহস্য অনুসরণ করে চিত্তসংযম, চিত্তপ্রসারণ এবং চিত্তরঞ্জনের শিক্ষা আবশ্যক।

অপরপক্ষে, সৃষ্টির ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, বিশেষ গুণের একপেশে চর্চা নিয়ে আর সকল জীব ও পদার্থই যার-যার বিশিষ্ট ভূমিকায় স্থাণু হয়ে রইল বা পৃথিবী থেকে কালক্রমে অবলুপ্ত হয়ে গেল; একমাত্র মানুষই তার সর্বাঙ্গীণ চর্চার গুণে সকলের উপরে উন্নত হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে এও আজ দেখা যাচ্ছে, মানুষের মধ্যেও বিশেষ চর্চা যে-যে শ্রেণীকে পেয়ে বসেছে তারা বিশেষ সুযোগক্রমে কিছুদিনের জন্য জাঁকিয়ে উঠলেও সৃষ্টিধারায় টিকে থাকতে পারছে না। তাদের প্রভাব দুদিন বাদেই স্তিমিত হয়ে পড়ে, তারা ক্ষায়িষ্ণুর দলে চলে যায়।

সিংহ ব্যাঘ্রের দল কেবল লাফিয়ে পড়ে গায়ের জোর ঘাড় মটকানোর এক-পেশে বৃত্তিরই চর্চা করে যাচ্ছে, তাতে তাদের ঠাঁই হল আজ কোণঠাসা হয়ে পশুশালায়, সার্কাসে, আর সুদূর সংকীর্ণ লুপ্তপ্রায় বনেবাদাড়ে। মানুষ দশ রকমের জায়গা থেকে দশ রকমের শক্তির যোগাযোগ-কৌশলের অধিকারী

হয়েছে। তাই গায়ের জোরে দুর্বল হয়েও সে ভয়ংকর সব জীবজন্তু এমন কি পরমাণু প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের উপরেও কর্তৃত্ব করে চলেছে। বিচিত্র শক্তির সামঞ্জস্য সাধনের কৌশল আয়ত্ত করাই আবার যথেষ্ট নয়, সে তো বুদ্ধির কাজ; পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য-ছাড়া বুদ্ধির এই একপেশে চর্চাই কেমন যে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, মানুষের অতুলসমৃদ্ধির অবস্থায়ও নিজেদের মধ্যে আজকের পাশবিক আচার ও যুদ্ধবিগ্রহাদিই তার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ। মানসিক চর্চাদ্বারা বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞানের সাহায্যে সে বস্তু ও ক্রিয়ার উপর আধিপত্য স্থাপন করেছে বটে, কিন্তু তেমনি আবার দেহ ও আত্ম-শক্তির দিক দিয়ে সাধনার অভাবে দুর্বল থাকার দরুন উল্টো নিজেই নিজের সৃষ্ট বস্তু ও ঘটনার দাস হয়ে পড়েছে। সমগ্র সত্তার সম্পূর্ণ পুষ্টিকর দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, এরূপ বিশেষ দিকে উন্নতিই সামগ্রিক অবনতি ডেকে আনছে। প্রাকৃতিক শক্তির স্বাভাবিক নিয়মশৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে কোনও বিষয়ের অপরিমিত চর্চার প্রতিক্রিয়া কীভাবে যে অন্যদিক দিয়ে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে বৈজ্ঞানিক নানা বিষয়ের প্রবর্তনার ফল থেকে তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আধুনিককালে আণবিক শক্তির উদ্ঘাটন হওয়াতে মানুষ খুবই শক্তিশালী হল সন্দেহ নাই। বাস্তব জগতে এর দ্বারা কত দিক দিয়ে কত সমৃদ্ধির পথই না তার খুলে গেল! কিন্তু বিশৃঙ্খল পরিবেশের অবস্থাগতিকে সে শক্তি বিশেষ করে আণবিক বোমার উদ্ভাবনেই প্রযুক্ত হওয়ায় মানবসমাজের পাড়ায় পাড়ায় সৃষ্টি করে তুলল মানসিক ঈর্ষা বিদ্বেষ, ভয়, লোভ ও মদমত্ততা। প্রতিবেশী হয়ে দাঁড়াল প্রতিদ্বেষী। অণু পরমাণুর ভিতরে অপরিসীম শক্তি আছে, কিন্তু লোককল্যাণে প্রযুক্ত না হলে সমাজের কাছে তার কোনও সার্থকতা থাকে না, প্রভূত অকল্যাণেরই উৎপত্তি হয়। বাহ্যপ্রাকৃতিক শক্তিসীমা লঙ্ঘনের প্রতিক্রিয়া যে আন্তঃপ্রাকৃতিক শক্তির সীমায় বর্তে থাকে, এইখানেই তার প্রমাণ মেলে। তেমনি আন্তঃপ্রাকৃতিক জগতের আধ্যাত্মিক চর্চা দ্বারা লব্ধ বিশেষ বিশেষ সিদ্ধাই বা বিভূতিগুলি নিয়েও মানুষ যে কতদূর নিচে নেমে যায় এবং সামাজিক পরিবেশকে কিরূপ কলুষিত করে তোলে, তার পরিচয়ও এদেশে দুর্লভ নয়। এসব দেখেশুনেই আরও মনে হয়, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সীমা-ভাঙা কোনও বিশেষ শক্তি আপাতত যতই আমাদের সুখৈশ্বর্যশালী করে তুলুক তার পরিণাম তার দিক দিয়ে যাচাই করে দেখার খুবই দরকার আছে।

মূলে স্মরণ রাখা চাই যে বস্তু ও মন পরস্পরের প্রভাবাধীন বলে প্রত্যেকেরই বিশেষ গুণাগুণ মানুষের বিশেষ পরিবেশের পার্থক্য ঘটায়। কোনও একদিককার বিশেষ চর্চা বা সমৃদ্ধি নিয়ে থাকলে মানুষের চলে না, বাহ্যিক ও আত্মিক সর্বাঙ্গীণ উন্নতি যে ব্যবস্থাতে ঘটে, তারই চর্চা করা প্রশস্ত। সাধারণ ভাবে বলা যায়, বাইরে দেহের দিকে স্বাস্থ্যহীনতা থাকলে তাতে মানসিক দিকেও বিকৃতি ঘটায় রুগ্ন মন নিয়ে মানুষ কোনও মহৎ কাজ করতে সমর্থ হয় না। ম্যাট্‌সিনি লিনকূলন, রুজ্‌ভেল্ট ইত্যাদি ব্যতিক্রম মাত্র। স্বাস্থ্য, বিদ্যা বা বস্তুর প্রাচুর্য বা দৈন্য মানুষের পরস্পরের মধ্যে বাস্তব যে পার্থক্য জন্মায়, তাতে তাদের আত্মিক দিকের সম্বন্ধেও পরিবর্তন আনে। আত্মিক অনুশীলনের অভাব যেখানে ঘটে সেখানে সংযম ও সমবেদনার শক্তি লুপ্ত হয়ে যায়। সমবায় বাইরের ঠাট বজায় রেখেও ব্যর্থ হয় আন্তরিক প্রেরণার অভাবে।

সমুদ্র ভরা জল রয়েছে; মেঘের বর্ষণ দ্বারা যতক্ষণ দেশে দেশে তার বিস্তার না ঘটে, ততক্ষণ সারাদেশ মরুভূমিই থেকে যায়, সমুদ্রেরও তাতে সমৃদ্ধি ঘটে না। জাতিহিসাবে মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ, বিদ্যা বা পার্থিব যে-কোনও বস্তুর বিপুল অধিকার পেলে কী হবে, সে বস্তু যার কাছে জমা হচ্ছে সেখানেই পড়ে পড়ে পরিমাণ বাড়াচ্ছে মাত্র; অভাবী মানুষের প্রয়োজনে তাকে লাগায় কে? আত্মিক সেই সমবেদনা ও ইচ্ছাশক্তির প্রবর্তনার অভাবে একদল মানুষ সম্পদশালী হয়েও মানবজাতির সর্বনাশের কারণ হয়ে আছে। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাভ্যাসের দ্বারা সুস্থদেহে সমভাবে সর্বজনীন অনুভূতির এই দিকটা অনুশীলিত হয়ে জীবনের পাত্রে যখন মানসিক চর্চার ফলস্বরূপ ঐ বিজ্ঞানের সৃষ্ট বস্তুসম্ভার এসে জমা হবে, কেবলমাত্র তখনই মানুষের স্বভাবজাত প্রেরণায় তার সুষ্ঠু বিতরণ দ্বারা সমাজ যথোচিত সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে।

আজ মানুষ বস্তুর মতো মাত্র শক্তির আধার হয়েই রইল। এযে জড়ত্বেরই সুস্পষ্ট লক্ষণ। জন্মত মানুষ চেতনাবান জীবের স্তরে পৌছবার সৌভাগ্য লাভ করেও নিজের কর্মপ্রণালীর প্রতিক্রিয়ায় আত্মধর্ম খুইয়ে জড় বিষয় প্রাচুর্যের প্রভাবে বস্তুর নিয়ন্ত্রণহীনতা-ধর্মই প্রাপ্ত হচ্ছে। তা না হলে, নিশ্চয়ই সে চারদিকের অভাব দেখে সমাজসেবায় নিজের চেতনা ও বস্তুশক্তিকে সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ধন্য হত, বিষয় জমাবার ঝোঁক তাকে এমন পেয়ে বসত না। সর্বাঙ্গীণ বোধের শিক্ষারও যেমন অভাব, সমাজে সর্বাঙ্গীণ মানুষেরও তেমনি অভাব হয়ে আছে।

মানুষের মধ্যে যখন কর্ম, জ্ঞান ও অনুভূতির বৃত্তিগুলির সমাবেশ হয়েছে, তখন মানুষের কর্তব্য শুধু কেবল কাজ করে যাওয়া নয়, কেবল জানাও নয়, কেবল আবার ভাবাবেগে চালিত হওয়াও নয়,—তিনের সামঞ্জস্য সহকারেই সংসারের বিষয়ব্যবস্থা করে চলতে হবে। প্রাকৃতিক জড় বস্তুর সম্বন্ধেও ঐ রীতিই অনুসরণীয়। তাকে কেবল দরকারের বিষয় বলেই দেখবার নয়; মানুষে দেখছে বলেই, মানুষের মানবিক সম্বন্ধের রসাবেশটুকু যদি তাতে লাগে তবে অস্বাভাবিক হয় না। রবীন্দ্রনাথ মানুষকে চিন্ময় লোকের অধিবাসী বলেও, মৃন্ময় লোকের বৃক্ষবন্দনা করেছেন; বৃক্ষরোপণ-উৎসবও তাঁরই প্রবর্তনায় দেশে প্রসার লাভ করল। একই দৃষ্টি থেকে অতীতের আর্যঋষিগণ ওষধি-জল-বনস্পতিতে একই প্রাণের আবির্ভাব লক্ষ্য করেছেন। কেন না, বস্তুজগতকে মানুষের প্রাণের জগত থেকে তাঁরা আলাদা করে দেখেননি। দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করে চলতেই তাঁরা চেষ্টা করেছেন। সুতরাং বিজ্ঞানের প্রতিক্রিয়া অবশ্যই আমাদের শিক্ষণীয়, তার দ্বারা এই চেতন-অচেতনের যোগরহস্য আরও ভালো করে জানা যাবে এবং ব্যবহারিক জীবনে সে-যোগ সম্পাদন করাও সুসাধ্য হবে।

তবে, বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে প্রাকৃতিক বস্তু-শক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত হবে না, যাতে মানুষের সুখসম্ভোগ বা কোনো সুযোগ সুবিধাপূর্ণ স্বার্থের জন্য প্রাকৃতিক শক্তিকে অত্যধিক খাটাতে হয়। বিজ্ঞানের অসংগত ব্যবহারের প্রমাণ বুঝতে হবে সেই অবস্থাটাকেই, যখন মানুষের সর্বাঙ্গীণ বৃত্তির ব্যবহার কোনোদিক দিয়ে ক্ষুণ্ণ হতে থাকবে। বনের উচ্ছেদ করে একদিন মানুষ আপন বসতি বাড়িয়ে চলছিল, আজ দেখছে বসতির জন্যই বনেরও কিছু সমাবেশের দরকার। প্রকৃতির সঙ্গে এরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা, এবং শারীরিক চর্চার দ্বারা স্বাস্থ্যের ও জীবিকার উন্নতির জন্য কৃষি, গো-পালন ও গৃহকর্মাদির অভ্যাস খুবই উপযোগী। শিক্ষার মধ্যে এ কাজগুলির গুরুত্ব এ কারণেই অধিক। প্রাকৃতিক সংযোগের আবশ্যকতা উপলব্ধি করলেই গ্রামীন সভ্যতা ও সমাজের তাৎপর্যও স্বীকৃত হবে, শহরের ভিড় কমবে। সে-সঙ্গে কৃত্রিম কল-কারখানা-আশ্রিত একঝোঁকা বস্তীজীবনের বস্তুনির্ভর স্বভাবের সহায়তা থেকেও মানুষ মুক্তি পাবে।

মানুষের এই অসহায়তা সৃষ্টির মূলে রয়েছে—বিশেষ-শিক্ষা। লেখাপড়া বা কোনো-একটা বিশেষ বৃত্তিতে কোনও একদিক দিয়ে বড় হয়ে উঠতে না পারলে আয়ের পথ খুলবে না। উপার্জনের পরিমাণ ভালো না হলে কোনও এককালে উচ্চ শিক্ষিতের সভ্যসমাজে চলাফেরার সুযোগ-ও বন্ধ। মনের কোণের নিগূঢ়

আশা-আকাজ্ক্ষা মানুষকে জীবিকার নাম করে ঘোরায় হাটে-ঘাটে ঐ শিক্ষা ও আভিজাত্যের পিছনেই।

শহরকেন্দ্রিক আধুনিক উচ্চ সমাজের অপরিহার্য বিষয় বিজ্ঞান। সকলের পক্ষে তা বস্তুর সুবিধাগুলিকে পাইকিরি হারে সুলভ করে দিচ্ছে। কিন্তু এদিকে মানুষ হারাচ্ছে তার স্বাভাবিক শক্তির জোগান। এখন বিজ্ঞানের যোগে ট্রাক্টরে শস্য বাড়াচ্ছে। লোকগুলি হচ্ছে কর্মহীন। বহু মানুষের কাজ একটি কলে সম্পাদন করে মানুষের বুদ্ধি ও জড় বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তির আশ্চর্য পরিচয় সে প্রকাশ করছে। সে-প্রকাশ সর্বদিকে সামঞ্জস্যযুক্ত না হওয়ায় আশ্চর্য শক্তিসম্পদই আশ্চর্য-রূপে মারণ-অস্ত্র হয়ে উঠছে। মানুষগুলি দুমুঠো খেয়ে বাঁচতে পারত, যদি তারা কলের শক্তির পাইকিরি জোগানের আশ্চর্যের মোহে না বিকিয়ে দৈহিক শক্তির ব্যবহার-সীমা মেনে কুটির শিল্প ও চাষাবাদে লেগে থাকত। তা না করে, লোকে চাইছে—কোনো-একটা বিশেষ সুযোগে বিশেষ কোনো-একটা পথে পারিপার্শ্বিক অন্য সকলের চেয়ে কতক্ষণে বিশেষ উন্নতির স্তরে উঠে যাবে। যতক্ষণ সে-সুযোগ মিলছে না, ততক্ষণই কেবল সমাজের আশ্রয়ে সমবায়ের আদানপ্রদাননীতি সে মেনে যাচ্ছে। সুযোগ-সন্ধান-রত এই দুর্নিবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ক্ষুধা,—এ ক্ষুধাকে জাগাচ্ছে এক-একটা কলের বিশেষ শক্তির বিরাট সম্ভাবনাময় প্রদর্শনীতে। সমাজের মধ্যে আছে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ সমবায় ও আত্মীয়তার বাঁধন ; কলের মধ্যে আছে বিষয় ও বস্তু-সমাবেশের বিস্ময়করতা। লোকে এখন ব্যক্তিগত আত্মীয়তার চেয়ে বস্তুগত বিস্ময়ে আকৃষ্ট। বস্তুর মধ্যে যখন বিশেষ শক্তির বিস্ময়কর সমাবেশ ঘটানো হয়, তখনই তা বিজ্ঞানের যুগে 'কল' আখ্যা পায়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যখন এই বিশেষ শক্তির বিপুল প্রকাশ ঘটেছে, তখন সেই ঘটনা-কেন্দ্র নাম পেয়েছে, রাজা, পুরোহিত, সমাজপতি, শ্রেষ্ঠী, পণ্ডিত, গুণী, গুরু ইত্যাদি। ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের মধ্যে শক্তির কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে বিশেষ-পথের কাজ। সমাজ-জীবনের সর্বাঙ্গীণ সুস্থবিকাশের পক্ষে তা বিরুদ্ধ। চোদ্দটা বিষয়েই যখন পারিপার্শ্বিক সমাজের সাহায্যের অপেক্ষা রেখে চলতে হচ্ছে, তখন সে-অবস্থাতে দু'একটা বিষয়ের দিক দিয়ে বড়ো হয়ে গিয়ে সমাজকে না-মানা অযৌক্তিক ; এবং তাকেই স্বার্থপরতা বলে সমাজ নিন্দিত করে থাকে। এরূপ আকস্মিক বিশেষভাবের শক্তির উন্মেষ ঘটানোর সুযোগ থাকলেও সমাজ সে সুযোগ গ্রহণ করাকে নিষিদ্ধ করেছে,—প্রাচীন সমাজে এরূপ অনেক ট্যাবুর বিষয় আছে। আধুনিক রাষ্ট্রেও সমাজের নিরাপত্তার দিক চেয়ে নানা বাধানিষেধের প্রয়োগ যে না হচ্ছে,

এমন নয়। ধর্মশাস্ত্রে গুরুর অধিকার আয়ত্ত থাকা সত্ত্বে মহাভারতের ধর্মব্যাধ সামাজিক ব্যবহারে মাংসবিক্রেতাই থেকে গেল। পারিপার্শ্বিকের সীমা সে উপেক্ষা করেনি। এখনো এই সমাজের সীমা অতিক্রম করবার দণ্ড পাশ্চাত্ত্য-সমাজে যখন এক-এক সময়ে কারও উপর উদ্যত হয়, তখন এক-এক পরিবারের যে কী সর্বনাশ ঘটে, তা বলার নয়। ইমিগ্রেশন আইনে স্বামীকে ছাড়তে হয় স্ত্রী; স্ত্রীকে ছাড়তে হয় স্বামী। সংসার যায় চুরমার হয়ে। তবে যুদ্ধের পর্বের প্রাক্কালেই এটা বেশি ঘটে। এখন শান্তির সময়, কচিৎই সেরূপ ঘটছে, এই যা রক্ষে। এখন বরং সামাজিক সীমা-মানাটাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে অশিক্ষিতের লক্ষণ। এর প্রতিক্রিয়ায়, পরস্পরের বিশ্বাস নষ্ট হচ্ছে। প্রত্যেকেই জানে, কেউ কারো দিকে ফিরে চাইবে না, সবাই ফিরছে উঁচু ডাল ধরবার ফিকিরে,—কেবল সুবিধে পেলেই হয়। অবিশ্বাসের এই মনোভূমিতে আত্মীয়তার দানা বাঁধবার অবসর কোথায়? ব্যক্তিগত জীবনের সুখসুবিধার স্তর উচ্চতর করবার তাগিদে লোকে সন্তানের সম্ভাবনা পর্যন্ত বন্ধ করে দিচ্ছে। বস্তুর সৃষ্টিতে বাধা নেই,—বস্তুর বরং আদরই বাড়ছে,—কিন্তু মানুষের প্রাণ, যেটা সংসারের দুর্লভতম বস্তু,—সেটার আবির্ভাব হয়ে উঠছে অভিশাপ-বিশেষ। সর্বাঙ্গীণ জীবনের আদর্শ সমাজে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার দ্বারা অনুসৃত হলে, আপনি পরিবেশ উন্নত হত; শ্রমার্জিত পরিমিত বস্তুসম্ভার নিয়ে সরল জীবনযাত্রায়-অভ্যস্ত সমাজে বহু লোকেরই জায়গা হত।

সন্তানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার তত্ত্বাবধানের চেয়ে মায়েদের অধিক যত্ন দেখা যায় সন্তানের খাওয়া-পরার রকমারি ও পরিমাণ-বৃদ্ধি সাধনের দিকে। বড়োদের জীবনেরও পরিণতি সেই ভোগসম্ভারের দিকেই চলেছে। মায়েরা এই বিশেষ ঝোঁকের মোড় না ফেরালে, বড়দের জীবনের দৃষ্টিও পরিবর্তিত হবার নয়। সুতরাং চাই শিক্ষা; সে শিক্ষা মায়েদের হাত দিয়ে ঘর হতেই ছাঁচ নিয়ে বেরনো দরকার। দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা দৈহিক খাওয়া-পরার নীতিযুক্ত সেই শিক্ষার সূত্র গোড়াতেই ধরিয়ে দেওয়া হলে, সকলকেই জীবনের শুরু থেকে খাটতে হবে; তার ফলে 'বাবু' হবার ঝোঁকে কারোরই মনুষ্যত্ব কাবু হয়ে উঠবে না।

তিন

কোন বিষয়কে জানার দ্বারা ও তার সঙ্গে ব্যবহারের দ্বারা সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। আত্মীয়তা প্রসারের উপায়ই হচ্ছে তাই জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। কোন্ এক পথের অভিজ্ঞতা এক ধরণের আত্মীয়তা সৃষ্টি করবে; অনেক সময় এইরূপ একপেশে যোগ একদিন বিয়োগ সৃষ্টিরও কারণ হয়ে ওঠে। এজন্য, সর্বমুখী যোগের চেষ্টাই করা আবশ্যক। সেই যোগই স্থায়ী এবং শুভ যোগ হয়ে থাকে। কেবল মানুষের সঙ্গে নয়, প্রকৃতির সঙ্গেও আমাদের এইরূপ সর্বাঙ্গীণ যোগের সুযোগ রেখেই সেই অনুপাতে জীবনযাত্রার মান ও দায়িত্বের মাত্রা স্থির করতে হবে। বিজ্ঞানবলে প্রাকৃতিক শক্তির জ্ঞান ও তার ব্যবহার আয়ত্ত করাকে দুইভাবের সম্বন্ধে লাগানো যায়। তাকে অধীন ভেবে গরুর মতো চাষে বা গাড়িতে জুড়ে খাটানো যায়, আবার, তার থেকে নানাভাবে উপকৃত বোধ ক'রে মায়ের মতো সেবাও করা চলে; ভক্তির সম্বন্ধ থেকে যে যত্ন জন্মে, তার থেকে আরও উপকার পাবার পথই কিন্তু প্রশস্ত হয়। প্রথমটাতে ঘটে জ্ঞানের ও কর্মের যোগ, দ্বিতীয়টাতে তার উপরেও যুক্ত হয় অনুভূতি। দেহ ও মনের সম্বন্ধ ছাড়িয়ে আত্মার সম্বন্ধ অর্থাৎ আত্মীয়তা জন্মে শেষোক্ত স্থলে। সেই আত্মীয়তাই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার নির্যাস।

সর্বাঙ্গীণ জীবনের ও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার আদর্শের আভাস আমাদের দেশে আদিকালেও দেখা না দিয়েছে এমন নয়। এর অনুকূল বাণী মেলে উপনিষদের মধ্যে। সেখানে বলা হয়েছে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ

পৌরাণিক যুগে এর আদর্শ হয়ে আছেন জনক রাজা। মধ্যযুগে কবীরের বাণীতেও পাওয়া যায় অনুরূপ আদর্শের প্রবর্তনা। তিনি বলছেন—

কহৈঁ কবীর অ্যাস উদ্যম কী জৈ।
আপ জীয়ে ঔর ন কো দী জৈ।

অর্থাৎ, কবীর বলেন এমন উদ্যম করিবে যাহাতে আপন জীবিকা তো হয়ই এবং অন্য সকলকেও সাহায্য দিতে পারে।

(শ্রীক্ষিতিমোহন সেন কৃত বঙ্গানুবাদ)

কবীর নিজেও গৃহস্থ ছিলেন। কাপড় বুনে দিন চালাতেন। এদিকে দোঁহা রচনা করতেন; সাধারণের সঙ্গে তাঁর জীবনের যোগ ছিল। কিন্তু তবু তাঁর আধ্যাত্মিক চর্চার দিকটাই লোকের মধ্যে বেশী স্থায়ী হয়ে রইল। এমনিভাবে বাণীতে আদর্শের আনুকূল্য পূর্বাপর অনেকস্থলে দেখা গেলেও কার্যত সমাজ-জীবনে এ আদর্শ পূর্ণভাবে খুব বেশী প্রকট হতে সচরাচর দেখা যায়নি। কিন্তু স্বেচ্ছায় বা ঘটনাচক্রে পড়ে এ আদর্শের আনুগত্যের দিকেই মানুষ চলেছে—এ কথাও অবধারিত। যত শীঘ্র এ সত্যকে স্বীকার করে এর উপযোগিতা জীবনে যাচাই করব ততই মঙ্গল।

জীবসমাজে মানুষের অবস্থা সকলের চেয়ে জটিল। কারণ, একই কালে মানুষকে দুই দেশে বাস করতে হয়। মৃন্ময় দেশে সীমাবদ্ধ থাকা তার দেহযাত্রা, কিন্তু সে চেতনাবান্ হওয়ায় তার মন দেশেবিদেশে সারা ব্রহ্মাণ্ডের চিন্ময়লোকে বিচরণ করতে পারে। প্রকৃতির নিগূঢ় কারণসমূহের যোগে এক-একজনের জীবনে বাইরের মৃন্ময় পরিবেশের সঙ্গে তার চিন্ময় প্রভাবের যখন অমিল ঘটে, তখনই জাগে প্রশ্ন,—কোন্ পরিবেশের সঙ্গে মানুষ আপনাকে সংযুক্ত করবে, কোন্ দিক্কার দায়িত্ব তার পক্ষে স্বাকার্য হবে। ধরা যাক্, মধ্যবিত্ত সমাজের কথা। তারা শিক্ষিত হয়ে থাকে, লেখাপড়া, শিল্পচর্চাদি সূত্রে বিদ্যাবুদ্ধির রাজ্যেই তাদের মনের আনাগোনা চলে। কিন্তু, আয় কম বলে, তাদের বাস্তবত বাস করতে হয় মনের বিরুদ্ধ পরিবেশে। এরা বিশেষ শিক্ষা ও শ্রেণী-ভেদ-বাদী সমাজে গড়া মানুষ। এ সব ক্ষেত্রে তাই বিশেষ দিককার প্রভাবই প্রাধান্য লাভ করে। বর্তমান সমাজ এই বিশেষ শ্রেণীর বুদ্ধির নির্দেশ নিয়েই চলছে। এখানে কোন একটা বিশেষ বৃত্তি ধরে কেউ বড় হচ্ছে বা বড় হতে হবে বলে জানছে। সর্বাঙ্গীণ জীবনের শিক্ষা এদের মধ্যে নেই,—চালু হবারও সুযোগ কম। এরূপ বিশেষ শ্রেণীর থেকে যখনই যাঁরা সর্বাঙ্গীণ জীবনের আদর্শকে গ্রহণ করতে উদ্যোগী হবেন, তাঁদের চলন্ত জীবন-যাত্রার পরিবর্তন স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। আদর্শবাদী মাত্রেই, যথা—রাস্কিন, গান্ধীজি, বা টলস্টয়াদি, তাই করেছিলেন। সে পরিবর্তনের মধ্যে অনেক অসুবিধা ও ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। এদের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছিল। পরিণত বয়সের জন্য অনেকের পক্ষে এই পরিবর্তন-স্বীকার দৈহিক সামর্থ্যের অতীত হয়ে পড়ে। এজন্য বড়দের কাছে এ শিক্ষার পূর্ণ প্রয়োগ আশা করা না গেলেও, তাদের দ্বারা অন্য অনেক কিছু কাজ সম্ভব হতে পারে। নিজেরা যে সমাজে যে শিক্ষায় যেভাবে বর্ধিত হয়ে যে ফল প্রত্যক্ষ করলেন তার অভিজ্ঞতায় যদি নূতন এই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা ও

সর্বাঙ্গীণ জীবনের আদর্শের মধ্যে তাঁর শ্রেয়তর ফল কিছু আশা করে থাকেন, তবে ভাবী বংশধরদের শৈশব থেকে যথাসম্ভব সেই বিশেষ পথের জীবনযাত্রাতেই গড়েপিটে ঢালাই করে নিতে পারেন ; নিজেরা যে পরিবেশের প্রভাব যতটা মেনে নেবেন, সেই পরিমাণেই তার দায়িত্ব তাঁদের উপর এসে পড়বে। খুব সম্ভব, নিজেরা তাঁরা এতাবৎকাল যেমন চলে আসছেন তেমনি অভ্যস্ত বিশেষ পথেই তাঁরা চলবেন, তাই স্বাভাবিক। তবে ভাল মনে করলে, সর্বাঙ্গীণ জীবনের অনুকূলেও তাঁরা যথাসম্ভব সেই বিশেষ পথের জীবনযাত্রাকেই গড়েপিটে ঢালাই করে নিতে পারেন। ভাবী-সমাজের পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে তা সহায়ক হবে।

সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা ও জীবনের চর্চা এযুগে অভিনব একটি আদর্শ। জীবনযাত্রায় ব্রতী হবার জন্য সবে মাত্র শিক্ষা যারা শুরু করবে, বয়স্কদের চেয়ে এ শিক্ষা তাদেরই পক্ষে বেশি উপযোগী এবং তাদেরই ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্যও বটে। এ শ্রেণীর ছোটদের শিক্ষাজীবন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা স্বাবলম্বনের দ্বারা সম্ভব নয়। অন্যান্য অনেক কাজেই তাদের নানাসময়ে অন্য অনেকের সাহায্য ছাড়া চলা দায়। এজন্য তাদের মাত্র নীতি পালনের অভ্যাসটুকু ধরাতে পারলেই যথেষ্ট হবে।

সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা সর্ববিষয়েই যে ছাত্রকে আজই একসঙ্গে সুদক্ষ করে তুলবে, এমনও আশা করা যায় না। কারণ, বিশেষ শিক্ষা ও বিশেষ জীবনের দ্বারা সমাজ সর্বদিকে আচ্ছাদিত। তারই প্রভাব নূতন প্রচেষ্টায় বারবার নানা বিষয়ে বাধা সৃষ্টি করবে। পরিবেশ-অনুযায়ী যেখানে যত বেশি সম্ভব, তত বেশি বিষয়ে একসঙ্গে কিছু-কিছু করে রুচি ও অভ্যাস প্রবর্তন করতে হবে। এখনই সর্ববিষয়ে সমান অভ্যাস আয়ত্ত হক আর না হক, অন্তত রুচির সম্প্রসারণ চাই-ই। রুচি জন্মালে অভ্যাসটা আপন অধ্যবসায়েও অনেকের জীবনে একদিন না একদিন সম্ভব হয়ে যেতে পারে। সর্বমুখী রুচির সৃষ্টিই আপাতত প্রধান কাজ। তাতে উদার দৃষ্টিও অনুরাগ জন্মাবে। সকল বিষয়ে রুচি ও অভ্যাসের ফলে প্রত্যেকেরই জীবনে কিছু-কিছু সর্বমুখী অভিজ্ঞতারও সঞ্চয় হবে। তার সাহায্যে সকলেই সকলের মূল্য বুঝবে ; সহানুভূতির সঙ্গে পরস্পরের বিষয় বিচার-বিবেচনা করে দেখবার সুযোগ পরস্পরের পক্ষে সুলভ হবে, প্রত্যেকের মধ্যে একাত্মতা সঞ্চারের দ্বারা আদর্শ সমাজের জমি তৈরি করবে রুচির ঐ সর্বপ্লাবী ধারা।

চার

সর্বাঙ্গীণ চর্চার সম্যক্‌ প্রসার যাতে হয়, সেজন্য প্রচলিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা মানের উত্তুঙ্গতা কমিয়ে নিতে হবে। শিক্ষার সময় বাড়ানো চাই। যেটা এখন দশ বছরে দেখার কথা, সেটা শিখতে পনর বছর লাগতে পারে। শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হওয়ায়, আসলে প্রস্তাবিত পনর বছরের শিক্ষা আগেকার দশ বছরের বিশেষ মানের তুলনায় পরিমাণে বেশি এবং গুণের দিক দিয়েও উন্নত ধরনের হবে। তা ছাড়া সে শিক্ষা বাস্তব অভিজ্ঞতায়ও সমৃদ্ধ হবে। শিক্ষার সঙ্গে হাতে কলমে উপার্জনের-ও ব্যবস্থা সমান্তরালে চলতে থাকবে বলে সাংসারিক আয়ের দিক দিয়ে কোনো ক্ষতির কারণ ঘটবে না।

বস্তুত শিক্ষা এবং সংসারযাত্রা বলে খণ্ড খণ্ড কোঠায় জীবনকে ভাগ করা অস্বাভাবিক ব্যবস্থা। এতে জীবনের দায়িত্ব ও আগ্রহ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের শিথিল-প্রযত্ন করে তোলা হয়েছে কিনা বিশেষভাবেই তা বিবেচ্য। এ রকম কোঠা ভাগাভাগি না করে স্বাভাবিকভাবে যে যতটা কাজের যোগ্য হচ্ছে, তাকে সেই পরিমাণেই কাজ করাতে করাতে কাজের সঙ্গেই অভিজ্ঞতা বা বিদ্যা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করবে তাতে ছোটোবেলা থেকেই সর্বাঙ্গীণ জীবনে সহজে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে।

সকলের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ জীবনের আচরণ অনুসৃত হলে এক ধাপ থেকে পরবর্তী উন্নততর ধাপের শিক্ষায় শিক্ষিত করবার লোক সাধারণ শ্রেণীর মধ্য থেকেই দেখা দেবে। ধর্মগুরু, কবি, শিল্পী ও আবিষ্কারক দলের আবির্ভাব আদিকাল থেকে সেই সত্যেরই সাক্ষ্য দান করছে। আজ অবধি বিধাতার অবতার মানুষের রাজ্য এই পৃথিবীতেই সম্ভব হয়েছে। ভিতরের সহজাত প্রবর্তনায় চিরদিনই বিশেষ প্রতিভা নূতন পথ করে নেয়। শিক্ষার পথ বাঁধা পথ, সে হচ্ছে সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা সাধারণের সাধনার জিনিস।

সমাজ গঠন প্রয়াসে যতই কিছু করি না করি, শিক্ষাই হচ্ছে সব পরিকল্পনার মূল জিনিস। সে শিক্ষা সর্বজনের পক্ষে সর্বাঙ্গীণ হওয়া চাই, এইটিই আমাদের একান্ত প্রতিপাদ্য। এ শিক্ষার মধ্যে বিশেষ চর্চারও অবকাশ থাকবে, কিন্তু তা সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের ব্যবস্থার অনুগত হয়ে,—তার প্রয়োজনের বিশেষ হার

হিসাব করে। বস্তু এবং মন—দু'দিককার সম্পদই যখন জীবন-যাত্রার মহোপকরণ, তখন তাদের পরিচয় ও ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞান-চর্চার ধারাও অবশ্যই চলবে। কিন্তু, ব্যবসায়ের বিষয় হবে না এর কোনোটাই। পরস্পরের সম্মতিক্রমে পরস্পরের উৎপন্ন বিষয়বস্তুর বিনিময় ঘটবে সে যেমন ব্যক্তিগত সংসারে, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। এই হবে সমবায়ের অনুশীলন। গোলাবারুদ নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টার দ্বারা দিকে দিকে গোলাবারুদ দিয়ে আক্রমণেরই আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়, এ কথাও মিথ্যা বলা যায় না। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা শুধু সংগঠক নয়, সে জিনিসটি নিজেই অপরপক্ষে একটা মস্ত প্রতিরোধক শক্তি। সেস্থলে সামরিক শিক্ষার সংগঠনী দিক অস্পষ্ট দেখা যায়। তার বিশেষ ব্যবহার নেতিমূলক। প্রতিরোধ বা পররাজ্য গ্রাসেই তা সীমাবদ্ধ। সব দিক বিচার করে দেখলে, মানুষকে সর্বাঙ্গীণ বলে পূর্ণ মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ করে দেবার পক্ষে ইতিমূলক এই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা যে সমধিক উপযোগী, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এ শিক্ষার ফলে, দেহের পুষ্টি, মনের সৃষ্টি এবং আত্মীয়ভাবের প্রসারে শ্রেণীহীন সমাজে সহানুভূতিসমৃদ্ধ মহা এক ঐক্যশক্তির সৃষ্টি হবে; সে যে আত্মরক্ষা এবং আত্মবিকাশের পক্ষে একই সঙ্গে কত বড় দুর্ভেদ্য প্রাকার ও সমুদ্র প্রবাহের কাজ করবে, তার কথা আমরা কি কেউ একবার ভাবি? বিজ্ঞানকে একমাত্র ভরসাস্থল করে ভাবা নেহাৎই সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচায়ক হবে, কেন না, আত্মরক্ষার্থে দৈহিক চর্চা এবং বিজ্ঞান এ সবই যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষারই অন্তর্গত।

আমাদের ভারতবর্ষে সমস্ত লোক এই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষায় সুগঠিত ছিল না বলেই বৈদেশিক আক্রমণে দেশকে বার বার পর্যুদস্ত হতে হয়েছে। বিপুল জনসংঘ; অথচ আক্রমণ ঠেকাবার বেলা বিশেষ এক সামরিক শ্রেণী ছাড়া আর কোনো প্রাণীর দেখা মেলেনি। দিল্লীর মসনদ হাত-বদলের সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরেই মাঠে মাঠে কৃষকদের নিরুদ্বেগ চাষাবাদ চলেছে,—এই চিত্রকে আমরা দেশীয় ঐতিহ্যের গৌরবজনক নজির করে দেখাই। কিন্তু এইটিই যে বিপরীতভাবে সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার একটা মারাত্মক অঙ্গহানির প্রমাণ বহন করছে, তা কে দেখে। সকল রকম দায়িত্বের কাজে সকলেরই শিক্ষিত হওয়া এবং প্রয়োজনক্ষেত্রে একত্র হয়ে দায়িত্ব সম্পাদন করার সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে দেশকে পরাধীনতায় এরূপ পেয়ে বসত না; জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার পাপেও ক্ষয় ধরাত না ভিতর থেকে। এ দায়িত্বের দায় থেকে লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসীদেরও এড়াবার উপায় নেই। বিশেষ চর্চা ধর্মে কর্মে সর্বত্রই মানুষকে মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে ভুল

বুঝিয়েছে ও কর্তব্যপালনে পঙ্গু ও উদাসীন করে রেখেছে। এ কথা সত্য কিনা, এর যাচাই হওয়া আবশ্যক। ঐতিহ্যগত এই ভুল ভাঙলে তবে যদি লোকে পথ বদলায়।

সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা শুধু শিক্ষা নয়, এ জিনিসটাই একমাত্র সার্বজনীন মানবধর্ম। এর যথার্থ আচরণে শ্রেণীভেদ, জাতিভেদ, ধর্মভেদ সব-কিছুর বাধা-বিপত্তি ও গ্লানি আপনা থেকে বিলীন হয়ে যাবে। দেবতার জন্য মানুষকে ঊর্ধ্ববাহু মুণ্ডিতশির হয়ে সংসার ত্যাগ করতে হবে না; নিজের ভিতরেই সে স্বয়ং বিধাতার আবির্ভাব জানতে পারবে। জলস্থল-অন্তরীক্ষের গ্রহ-উপগ্রহ, অণু-পরমাণু থেকে তরুলতা, কীটপতঙ্গ জন্তু-জানোয়ার ও মানুষ অবধি নিয়ে এই যে এক বিপুলা বিচিত্রা শক্তি রূপে অরূপে আবর্তিত হয়ে নিরন্তর অনন্ত পথে লীলায়িত, তার সঙ্গে সর্বক্ষণ সর্বরসে ও সর্বকাজে ওতপ্রোত হয়ে চলতে থাকাটাই লোকের কাছে নিত্য মুক্তি বা সিদ্ধি হয়ে দেখা দেবে;—মুক্তির জন্য বিশেষ আর কিছু করার আবশ্যক হবে না। তখন সকলে জানবে' যে, কোনো বিষয়কে ঋষির মতো অনুভবের মধ্যে পেলেই কেবল চলবে না, শিল্পীর মতো বাস্তবেও তাকে রূপ দেওয়া চাই। কেননা, যতক্ষণ সংসারের সীমায় থাকা যায়, ততক্ষণ রূপেরও সার্থকতা স্বীকার করতে হয়। রূপের মধ্যে অরূপের আভাস দিয়েই সংসার নিজের পরিচয়কে সম্পূর্ণ করছে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ সাধনার ধারা সেই পথই অনুসরণ করে বাস্তবকেও মূল্য দিয়ে সার্থক হবে। এজন্য মানুষের জৈবধর্মের স্বীকৃতি চাই, গুণেরও বিচিত্র বিকাশ আবশ্যক, এবং আত্মীয়তায় আপ্লুত রাখা চাই সমস্ত চেতনা।

পাঁচ

শিক্ষার সমন্বয়

শ্রেণীহীন সমাজের কথা অনেকে বলে থাকেন। সে সঙ্গে তথাকথিত সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও উল্লিখিত হয়। কিন্তু এঁদের মধ্যে কাজে যাঁরা এগিয়েছেন,—তাঁদের উদ্যমও শেষে ঠেকে গেছে এসে কোনো-না-কোনো রকমের শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টির সহায়তাতেই। তাদের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষাকে হয়তো সর্বজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে গেছেন; কেহ নানা বিষয়ের চর্চার আয়োজন একটি কেন্দ্রে সংহত করেছেন; কেহ আবার জীবনকে পারম্পরিক বিকাশের উপযোগী করে গড়তে চেয়েছেন; কেহ শ্রেণী-সংঘর্ষ সৃষ্টি করে শ্রেণী লোপ করার পথ ধরেছেন। কিন্তু এঁদের সকলের সব চেষ্টাই হয়েছে আংশিক ও বিচ্ছিন্ন রকমের। পুরো নয় কোনোটাই। তাই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার চেহারা আজো বাস্তবে চোখে পড়েনি। যতদিন জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যক কাজগুলি সমাজের সকলেই অভ্যাস না করেছে, ততদিন শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। বৈষয়িক সমব্যস্থার আবশ্যকতা আজকাল লোকে অনেকটা স্বীকার করছে, কিন্তু এককালে এটাও কি অবাস্তব ঠেকেনি? আজ এ কথাই যখন লোকের সয়ে যাচ্ছে, তখন আর-একটি কথাও আমাদের জানা ভালো যে, বিষয়ের সমব্যবস্থারই যুক্তিমত গুণেরও সমব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তা না হলে, এক পায়ের সমতা নিয়ে মানুষের এক খোঁড়া সমাজ সৃষ্টি হয়ে যেমন আছে, তেমনি থাকবে চিরকালই। যাঁরা শ্রেণীহীন সমাজের কথা তুলবেন, বিশেষ করে তাঁদের স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষের পক্ষে দু'পায়ের সমতা না আনা পর্যন্ত, সকলের স্বাভাবিক চলার সাম্য আশা করাটাই হচ্ছে অবাস্তব। কবি বলছেন,—

> নর-জনমের পুরা দাম দিব যেই
> তখনি মুক্তি পাওয়া যাবে সহজেই।

কমে হবে না, পুরোপুরি চাই। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষায় জীবিকা ও জীবন বিকাশের সব দিক দিয়ে সমভাবে সুশিক্ষিত হওয়াই সেই "পুরা দাম" দেওয়া। নিতান্ত প্রাকৃতিক বাধায় ঠেকে গিয়ে যেখানে যাকে যতটুকু অসমান হয়ে থাকতে হয়, তা

নিয়ে অবশ্য করবার কিছু নেই। সে বৈষম্যটুকু ছন্দের মধ্যে যতির মতো; সে বাধার সীমাকে মানতে হবে প্রকৃতিরই সৃষ্টিবিকাশের নিগূঢ় তাৎপর্য হিসাবে। কিছু প্রভেদ রক্ষা করে চলতে হবে, কারণ সেটাই স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর। কবিও বলছেন,—

প্রভেদেরে মান যদি ঐক্য পাবে তবে
প্রভেদ ভাঙিতে গেলে ভেদ বৃদ্ধি হবে।

সেই প্রভেদই পালনীয়, যা স্বভাবের দান, এইটুকু স্পষ্ট জানা চাই।

স্বভাবের থেকে প্রভেদ যেটুকু জন্মায়, স্বভাব তার দোষ দূর করে থাকে স্বাভাবিক ধারায়। সন্তান মায়ের চেয়ে ছোটো থাকে বয়সে, দেহের আকারে, ও বুদ্ধির পরিণতিতে। কিন্তু সন্তানের মতো আত্মীয় মায়ের কে আছে? আত্মার আকর্ষণের মধ্যে সে এত আপন যে, মা নিজেকেও ভুলে যায় তার সেবার কাছে। সন্তানও তেমনি স্বাভাবিক টানে মা ছাড়া আর কাউকেই তেমন আপন জানে না। এই সূত্রেই বাকী জীবনের দেওয়া-নেওয়ার যোগাযোগ চলে। কিন্তু মা যদি এই স্বাভাবিক ধারা ছেড়ে বিলাসব্যসন প্রসাধনে বা অন্য কোনো কাজে মেতে গিয়ে ছেলেকে অবহেলা করতে থাকে, তবে ছেলেও মাকে আর ভক্তি করতে শেখে না। পরিণত জীবনে মাকে সে যদি খাওয়া পরা না জোগায়, তাও অস্বাভাবিক হয় না। স্বভাবের এই নিগূঢ় প্রণালী অনুসারেই মানুষেরও পক্ষে স্বভাববৈষম্যবাহী মানুষের গুণের অভাব পূরণ করতে হবে প্রাণের টানের দ্বারা। জীবন তবে সৃষ্টি হবে সেইখানেই। কবি বলছেন,—

আলো যবে ভালোবেসে
মালা দেয় আঁধারের গলে,
সৃষ্টি তারে বলে।

এই করে মানুষের চেষ্টায় যতদূর সম্ভব, সর্বত্র সাম্য ও সমবায়ের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা চাই বৈষয়িক ক্ষেত্রে, রাখা চাই মনের ক্ষেত্রেও।

এ কাজ যতই অসম্ভব মনে হোক, অন্ততঃ এটুকু বুঝবার সময় এসেছে যে, এ পর্যন্ত সমাজ ব্যবস্থা যা সম্ভব হয়েছে, তাও জোড়াতালি মাত্র। এবং সে ছেঁড়াখোঁড়া জোড়াতালির কাজগুলির কথাও যখনই যে বলতে এসেছে, অমনি মনে হয়েছে তা এমনি রকমেরই সম্ভাবনার বাইরে। কিন্তু শেষে দেখা গেছে, উন্নতি তার দ্বারাও ঘটেছে; তবে, সে উন্নতি সর্বদিকে নয়, ঘটেছে বিশেষ-বিশেষ দিকে। সেটা অনেকের লক্ষ্য হয়নি, আর, সেই বিশেষ উন্নতির কাজগুলি থেকেও

কত যে জটিলতা বেড়েছে তার হিসেব কে রাখে। সংসারের হালচালের হিসেব রাখতে না চেয়েও যিনি হিসেব করেই কথা বলতে চেষ্টা করে গেছেন,—একদা সেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

হিতৈষীর স্বার্থহীন অত্যাচার যত
ধরণীরে সব চেয়ে করেছে বিক্ষত।

ভালো লোকে করেছে বলেই তার যে-কোনো কাজ যে ভালোই হবে, এমন মনে করবার কারণ নেই। কোন্‌টা কার পক্ষে ভালো, তবু তা বলা অনেকটা সহজ,—তার তুলনায়,—সকলের সব দিক দিয়ে ভালোর চেষ্টা করাটা কঠিন, সমাজে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার বিস্তাররূপ কাজটা যতই কঠিন ঠেকুক, তাকে এড়িয়ে গেলেও তো চলবে না।

আগে জানতে হবে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা কী জিনিস, কেন তাকে চাই, কী উপায়েই বা তাকে পাই। সব কথা আজই একেবারে পরিষ্কার না হোক, এ নিয়ে সকলের মধ্যে একটা প্রশ্ন দেখা দিলেও অনেকটা কাজ হবে। কারণ, শিক্ষা বলতেই আজ আমরা ঘুরে ফিরে সেই বিশেষ শিক্ষারই রকমারি মাত্র দেখছি। আর, তার ফল আমাদের আর-যাই দান করুক, শ্রেণীহীন সমাজকে সুগোচর করেনি। সমাজকে শ্রেণীহীনতার দিকে ক্রমে-ক্রমে এগিয়ে নেবার জন্য—অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সেজন্য সকলের পারিশ্রমিকের হার বেঁধে দিতে হয় সমান হারে। সকলের স্বাভাবিক চাহিদাগুলি স্বীকৃত হওয়া চাই এবং সেই অনুসারে উৎপাদন-সম্ভারেরও বণ্টন সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই। টাকার হারে গুণের মর্যাদা বিচার হবে না, সে মর্যাদা বিচার হবে লোকসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনায়। বিদ্যা-বুদ্ধি বা মহাপ্রাণতায় যাঁরা লোকোত্তর হয়ে উঠবেন, লোকের শ্রদ্ধাপ্রীতিই হবে তাঁদের ন্যায্য মূল্য। সমাজের শিরোমণি ব্রাহ্মণ একদিন অপ্রতিগ্রহকেই জানতেন তাঁদের ধর্মের অঙ্গ বলে।

জীবনযাত্রা চালাবার জন্য যার-যার সর্ববিধ কাজ আজ আমরা নিজেরাই সমাধা করব আমাদের নিজস্ব পরিবেশে থেকেই। আর, মন দিয়ে পরিবেশের এবং কাজের থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ক্রমে জানতে চেষ্টা করব বৃহত্তর পারিবেশিক বহির্দেশকে। এই কাজ ও অভিজ্ঞতার সম্মিলিত শক্তিই আমাদের অনুভূতির প্রসার ঘটাবে। তা দিয়ে বিশ্বের সকল দিকেই আমরা আত্মবৎ করে সকল বিষয় লাভ করব। "আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।" সর্বভূতকে যে আপনার মতো করে দেখে, ঠিক দেখা সেই দেখতে পায়। একবর্ণে চতুর্বর্ণ,

রবীন্দ্রনাথের 'সোঽহং' এবং গান্ধীজীর 'সর্বোদয়সমাজ' কিংবা আধুনিক সাম্যবাদের 'কমিয়ুন'—যত কিছু প্রবর্তনার কথাই ধরা যাক না, সকলের শেষ-দেখাটি মিলছে গিয়ে ঐ "আত্মবৎ সর্বভূতেষু"তেই। শুরু থেকে এই দেখার শিক্ষাই হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা।

আধুনিক ভারতের অন্যতম সংগঠনকর্তা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী। দু'জনেই ভারতের শিক্ষাধারার সংস্কারকার্যে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী এবং গান্ধীজির নঈ তালিম বা বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে আমরা সেই চেষ্টার পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথ "ছাত্র-সম্ভাষণ"-এ বলেছেন, "সমস্ত দেশের সংস্কৃতি, সৌভ্রাত্র্য, সচ্ছলতা একদা বিকীর্ণ ছিল আমাদের গ্রামে।" মহাত্মা গান্ধীও ভারতের প্রাণকেন্দ্র গ্রামেই খুঁজে পেয়েছিলেন। "শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণে" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আধুনিককালে বর্বর দেশের সীমানার বাইরে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে শতকরা আট-দশজনের মাত্র অক্ষর পরিচয় আছে।" কবি এর পরে আগের কালের কথা উল্লেখ করে বলছেন—"রামমোহন রায়ের বন্ধু পাদ্রি এডাম সাহেব বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায়, বাংলা-বিহারে এক লক্ষের উপর পাঠশালা ছিল; দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছিল জনসাধারণকে অন্তত ন্যূনতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এ ছাড়া, প্রায় তখনকার ধনী মাত্রেই আপন চণ্ডীমণ্ডপে সামাজিক কর্তব্যের অঙ্গরূপে পাঠশালা রাখতেন, গুরুমশায় বৃত্তি ও বাসা পেতেন তাঁরই কাছ থেকে। আমার প্রথম অক্ষর-পরিচয় আমাদেরই বাড়ির দালানে, প্রতিবেশী পোড়োদের সঙ্গে।" একালের কথায় "শিক্ষার বিকিরণে" কবি বলছেন,—"শিক্ষার আলোর জন্যে উঁচু লণ্ঠন ঝোলানো হয়েছে ইস্কুল কলেজে, কিন্তু সেটা যদি রুদ্ধ দেয়ালে বন্দী আলোক হয় তাহলে বলব, আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। সমস্ত পটজোড়া ভূমিকার মধ্যেই ছবির প্রকাশ, তেমনি পরিস্ফুটতা পাবার জন্যে শিক্ষা চায় দেশজোড়া ভূমিকা। ব্যাপক-ভূমিকা-ভ্রষ্ট শিক্ষা কতই অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, কেবল অভ্যাসবশতই তার দৈন্যের বেদনা আমাদের মন থেকে মরে গিয়েছে। এডুকেশন নিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে স্বদেশের যখন তুলনা করি তখন দৃশ্য অংশটাই লক্ষ্য করি, অদৃশ্য অংশের হিসাব রাখিনে।...সমাজ দেশের বিদ্যা আপনিই দেশময় বিতরণ করেছে। না যদি করত তবে সমস্ত দেশ আজ বর্বরতায় কালো কর্কশ হয়ে উঠত। বিদ্যা তখন বিদ্বানের সম্পত্তি ছিল না, সে ছিল সমাজের সম্পদ।....যে রস অনেককাল থেকে নিম্ন স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ

নিশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে পড়ছে না, কেননা, **বিশেষ শিক্ষার** গতিকেই দেশ-দেখা চোখ আমরা হারিয়েছি; গবাক্ষ লণ্ঠনের আলোর মতো আমাদের সমস্ত দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিত-সমাজের দিকে।"

'বিশেষ শিক্ষা' কথাটি আমরা রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটির মধ্য থেকে গ্রহণ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ কেবল এই যুগের আধুনিক স্কুলকলেজের শিক্ষাকে উদ্দেশ করেই শব্দটির ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই শব্দের প্রয়োগ-সীমা প্রকৃত পক্ষে আরও বিস্তৃততর। শুধু আধুনিক নয়, দেখা যাবে, দেশীয় সমাজের শিক্ষাও সমাজে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি করে বিশেষ শিক্ষারই আর এক কোঠায় পড়ে। সে যা হক, এইখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক 'বিশেষ শিক্ষার' মারাত্মক প্রতিক্রিয়াই মাত্র লক্ষ্য করেছিলেন; তিনি বলেছেন,—"একদিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্যদিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হল তার প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে।...আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা।...তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেইজন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।"

রবীন্দ্রনাথ এখানে যে শ্রেণীভেদের উল্লেখ করেছেন, তা একধরণের মাত্র,—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, শহুরে ও গ্রাম্য এই পর্যন্ত। কিন্তু "বিশেষ শিক্ষা"র ফলে জগৎ জুড়ে চিরকাল দু'রকমের শ্রেণীভেদ দেখা দিয়ে আসছে। দেশী বা বিদেশী, পৌরাণিক বা আধুনিক কোনো জাতই কোনো দেশে যে শ্রেণীভেদ এড়াতে পারেনি সে শ্রেণীভেদ বর্ণগত নয়,—তা হচ্ছে **বিষয়গত**। শিক্ষিতদের মধ্যেই এক-এক বিষয় নিয়ে এক একজনের একান্তভাবের বিশেষ চর্চার ফলে বিশেষ-বিশেষ শ্রেণী যে কত হয়েছে, তার সংখ্যা নেই। শিক্ষিত শ্রেণীর ভিতরকার এই বিষয়গত শ্রেণীভেদের রূপ রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেননি। প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিজের বিষয়টিই মাত্র জানে, তারই কথা ভাবে, অন্যের বিষয়ে অভিজ্ঞতা রাখার দরকার বোধ করে না; তার ফলে লোকে নিজের বিষয় ছাড়া অন্য কিছু জানেও না,—অন্যের প্রতি সহানুভূতি বা অন্যের বিষয়ে বিচার-বিবেচনার যোগ্যতাসম্পন্ন মনও পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হয় না। এই অনভিজ্ঞতা ও সহানুভবতার অভাবে দিনেদিনে

এখন, শুধু ছোটো বড়ো সামাজিক শ্রেণীতেই নয়, বিষয়গত শ্রেণীতে-শ্রেণীতেও স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বিশ্বভারতী" প্রতিষ্ঠার সময় শিক্ষার প্রসারের দ্বারা মাত্র শিক্ষিত অশিক্ষিত শ্রেণীর বৈষম্য দূর করতেই সচেষ্ট হয়েছিলেন; বিষয়গত শ্রেণীভেদের উচ্ছেদ বাকিই রয়ে গেল। শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষাকেন্দ্রের পারিবেশিক জনসমাজের সংযোগ স্থাপন করতে চেয়ে তিনি বলেছিলেন, "সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি, ওকালতি, ডাক্তারি, ডেপুটিগিরি, দারোগাগিরি, মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিক্‌বর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রায় কেন্দ্রস্থল অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।" (বিশ্বভারতী, পৃঃ ৯—১০, বৈশাখ ১৩২৬)।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠানে এই উদ্দেশ্যে বিচিত্রবিষয়ের শিক্ষাচর্চার জন্য লেখাপড়ার বাঁধা বিষয় ও ক্লাসের সঙ্গে চিত্র, সঙ্গীত ও হস্ত-শিল্পাদি নানা বিভাগের সমাবেশ করেছেন। কিন্তু নানা কারণে সাধারণ লোকদের পক্ষে সেখানে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণের পথ আশানুরূপ সুগম হয়ে ওঠেনি।

নিজ নিজ পরিবেশে থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষিত হয়ে ওঠার পরিকল্পনা এনে দিলেন মহাত্মাজী। "নঈ তালিমে"র প্রবর্তনায় ঘরে ঘরে শিক্ষার চর্চা হবে; জীবনে যা-কিছুর প্রয়োজন হবে, সকল বিষয়ই সামর্থ্যের হিসাব-মতো সমান যত্নে নিজে সম্পাদন করে নিতে হবে। ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক

কাজকে যেমন অভ্যাস করতে হবে, তার মধ্য দিয়েই আবার জ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষা, রাষ্ট্র, আমোদ-প্রমোদ সকল কিছুই শিখে নিতে হবে; কোনো কাজকেই উপেক্ষা করে চলবার উপায় নেই। এর আনুষঙ্গিক ফল দাঁড়াবে এই যে, সকল মানুষই কার্যত নিজেকে জানবে সে সকল জাতির মানুষ। এমন কি, হাট, ঘাট, তৃণশস্য, জল বায়ু আলো এবং জনপ্রাণী সকলেই তার আত্মীয় হবে।

খাদ্য-উৎপাদনের জন্য সে যখন চাষ করবে, তখন সে নিজেকে জানবে চাষা; যখন পরবার কাপড় বুনবে, স্বাস্থ্যবিধানে নোংরা সাফ করবে, নিজেকে জানবে তাঁতী, মেথর, যখন লেখাপড়া ও ধর্মচর্চা করবে, তখন আবার নিজেকে ব্রাহ্মণ বলেও জানবার সুযোগ পাবে। এর দ্বারা সকলের সঙ্গে সে একাত্মতা লাভ করবে, সকল বিষয়েই নিজেকে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে এবং প্রত্যেক বিষয় ও মানুষের সুবিধা-অসুবিধাগুলি অন্তর থেকে অনুভব করে মতামত গঠন দ্বারা সমস্যা সমাধানে কার্যত সক্ষম হতে পারবে।

সকল রকম বৃত্তি নিজে অভ্যাস করলে স্বাবলম্বনের কাজ হয়। স্বাবলম্বনের নেগেটিভ দিক না ধরে তার পজিটিভ দিক গ্রহণ করাই শ্রেয়। কারও অপেক্ষা কেউ রাখিনে—এ কথা বলা বা ভাবা নেগেটিভ দিক। বস্তুত এটা অসহযোগের দিক। কিন্তু সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার আদর্শ হচ্ছে সমবায়,—সেটা সকলকে নিয়ে স্বাঙ্গীকরণের আদর্শ। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সমবায় আদর্শের প্রবর্তনা একান্ত স্মরণীয়। কেউ কারও অপেক্ষা রাখিনে বললেই একটি বিভেদ ও বিরাগের ভাব সৃষ্টি হয়ে পড়ে। স্বাবলম্বন চাই,—সকলের সব বিষয় জানার জন্য, বুঝবার জন্য, এবং এই করে প্রকৃত যোগে নিজের ভিতরে সকলকে পাওয়ার জন্য। এই অর্থে কাজ করা হচ্ছে স্বাবলম্বনের পজিটিভ দিক।

এইরূপ স্বাবলম্বন অনুসরণ করলে কেবল নিজের নয়, আত্মীয়হিসাবে সকলের দায়িত্বভারই অনুভব করবে প্রত্যেক ব্যক্তি। ইচ্ছা ও শক্তি দিয়ে সকলের সেবা করতে স্বভাবতই সকলের আগ্রহ জন্মাবে। কারণ, শিক্ষার অভ্যাসের দ্বারা সকল রকম বৃত্তিগত-সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা পরস্পরের মধ্যে বর্তমান থাকায় সকলের স্বার্থ ছাড়া নিজের স্বার্থের একান্ত স্বাতন্ত্র্যবোধ লোকের মধ্যে জাগবার অবকাশ ঘটবে কম।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে শিক্ষার বিবিধ আয়োজন আছে; কিন্তু এতটা ঘটে ওঠা সত্ত্বেও বলতে হয়, বিশেষ শিক্ষার নীতিতেই কাজ চলছে সেখানেও। কারণ, বিদ্যাচর্চাসম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের পক্ষে স্বাবলম্বী জীবনযাত্রার ব্যবস্থা এখনো

তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি এবং সকলের পক্ষে সকল বিভাগে গিয়ে সব বিষয়ের শিক্ষা-অভ্যাসও আবশ্যিক করা হয়নি। তা করা হলে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা ও জীবনের আদর্শকেই বাস্তবত সম্পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করা হয়; তাতে 'বিশ্বভারতী' থেকে আদর্শ 'নঈ তালিমে'র শিক্ষার কাজও সুষ্ঠুভাবে চালিত হতে পারে।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে, রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনার প্রভাবে থেকেই, সে উদ্যোগও বিশ্বভারতীর মধ্যে শান্তিনিকেতনে একসময়ে করা হয়েছিল। মহাত্মাজীর পুণ্যস্মৃতিও সে ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। তখন মহাত্মাজীর পুণা-উপবাসের কাল। রবীন্দ্রনাথ পুণা থেকে মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে এসেছেন। শান্তিনিকেতনে তিনি গ্রামের লোকদের আহ্বান করে এনে সকলকে অস্পৃশ্যতা-বর্জন এবং দুর্গতদের মধ্যে সংগঠনের কাজ গ্রহণ করবার জন্য আবেদন জানান। সে সময়ে ঐ কাজের জন্য শান্তিনিকেতনে "সংস্কার-সমিতি" নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। আশ্রমের অন্যান্য ভবনের ন্যায় "সংস্কার-ভবন" নাম দিয়ে দুর্গতদের জন্য একটি আবাসিক শিক্ষার কেন্দ্রও সে সমিতি থেকে শান্তিনিকেতনের "বাগানবাড়ি"-তে স্থাপিত হয়। সেখানকার ছাত্র ও শিক্ষকেরা সকলেই স্বাবলম্বনের নীতিতে নিজেদের পরিশ্রমের সাহায্যে জীবনযাপনের অভ্যাস প্রথম থেকেই গ্রহণ করেন। আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগে যারা বেয়ারার কাজ করত, আর ছিল যারা পরিচারকশ্রেণীর তারা এই আবাসিক ভবনে ছাত্ররূপে বাস করত। দিনে তারা নানা আফিসে যার-যার নির্দিষ্ট চাকুরীর কাজ করত, দুপুরে ও রাত্রে ছাত্রাবাসে ফিরে এসে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়মিত শিক্ষাগ্রহণ করত। এরা ছাড়া, আসত পাশের গাঁয়ের থেকে দুর্গতশ্রেণীর ছেলেরা। ঘর থেকে তারা নিজেদের খোরাকির চাল নিয়ে আসত। আর খাটত সংস্কার ভবনে'র দ্বারা পরিচালিত ভোজনালয়ে, তরকারী মাছ ও মিষ্টি সরবরাহের দোকানে। বিশ্বভারতী শিক্ষা-ভবনের ছাত্রেরাও এই ভবনের কাজের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিল। স্বতন্ত্র কয়জন শিক্ষক ছিলেন এই ভবনের পরিচালনা কাজেই ব্যাপৃত। নিজেদের পারিশ্রমিক 'ভবনে'র দিনের কাজের আয়ের দ্বারা তাঁদেরও সংগ্রহ করে নিতে হত। গ্রামে গ্রামে সমিতির জন্য মুষ্টিভিক্ষার প্রচলন হয়েছিল। গ্রামে গ্রামে সাপ্তাহিক হরিসভা চলত। সেখানে কীর্তন, পাঠ, আলোচনা হত। সংস্কার-ভবনের কর্মীগণ তাতে গিয়ে যোগ দিতেন। এভাবে সমাজ সেবায়ও তাঁরা সক্রিয় ছিলেন। প্রায় ৪।৫ জন কর্মী ও ৩০।৩৫ জন ছাত্র নিয়ে এ প্রতিষ্ঠান প্রায় তিন বছর এভাবে কার্যকর হয়েছিল। তারপর দেখা গেল একই স্থানে পাশাপাশি দু'রকম আদর্শের অনুশীলন

সহজ নয়। এখন যদি সে বাধা দূর করে কাজ চালানো যায়, তবে বিশ্বভারতী ও নঈ তালিমের পরস্পরের যোগেই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।

'নঈ তালিমে'র দিককারও একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থাটির পরিচালনার ভার প্রধানত যে দু'জন কর্মীর উপর মহাত্মাজী ন্যস্ত করেছিলেন, তাঁরা দুজনেই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন কর্মী। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠভবন অর্থাৎ স্কুলবিভাগের পরিচালনায় এঁরা উভয়েই প্রায় একইকালে নিযুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে শ্রীআর্যনায়কম্ ও আশা দেবীর পরিণয়ও ঘটে শান্তিনিকতনেই। পরে সেখান থেকেই এসে এঁরা সেবাগ্রামে শিক্ষার কাজে নিযুক্ত হন। শান্তিনিকেতনের আদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির অভিজ্ঞতা তাঁদের মাধ্যমে গান্ধীজির গোচরে আসা খুবই স্বাভাবিক। এঁরা ছাড়াও প্রায় একইকালে শান্তিনিকেতনের আর একজন শিক্ষক য়ুরোপ গিয়ে সুইডেনের শ্লয়েড-শিক্ষাপদ্ধতি বিশেষভাবে আয়ত্ত করে আসেন এবং সেবাগ্রামে গিয়ে তিনিও কাজের একটি পরিকল্পনা মহাত্মজীকে দাখিল করেন। কিছুকালের জন্য সেবাগ্রামেই তাঁর কর্মস্থল হয়; এই যোগাযোগের প্রভাব মহাত্মাজীর বুনিয়াদী-শিক্ষার বুনিয়াদ গঠনে যে কতটা কার্যকর হয়েছে, তা বাইরে থেকে সঠিক বলা না গেলেও একটা যোগসূত্র এ সব উপলক্ষে বিশ্বভারতী ও নঈ তালিমের তলায়-তলায় ফল্গুপ্রবাহের মতো প্রবাহিত হয়ে থাকবে, এটুকু অনায়াসেই আন্দাজ করা চলে। পূর্বোক্ত শিক্ষক শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ এখন বিশ্বভারতীর 'বিনয়-ভবনে' অধ্যাপনা করছেন। শ্রীআর্যনায়কম্ এবং আশা দেবী আছেন তখন থেকে সেবাগ্রামেই।

গ্রামে গ্রামে 'নঈ তালিমে'র প্রসারের পক্ষে প্রয়োজন এমন শিক্ষকের যারা সর্বাঙ্গীণ শিক্ষায় সুদক্ষ। সে-দক্ষতা অর্জনের জন্য একটা কোথাও বিশ্ববিদ্যালয় ধরনের উচ্চমান শিক্ষাকেন্দ্র থাকা আবশ্যক। তার বিভিন্ন বিভাগে থেকে সর্ববিষয়ে সমানহারের শিক্ষামানে অভ্যস্ত শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে গিয়ে যখন দেশের আনাচেকানাচে শিক্ষাপ্রচারে রত হবেন, তখনই আসবে সমাজের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির সময়। কিন্তু গোড়াতে শিক্ষার্থীদের প্রথম-জীবনে শিক্ষাপত্তন হওয়া চাই, যার যার বাস্তু-পরিবেশ থেকেই। জনসাধারণের জীবন থেকে প্রথম হতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে শিক্ষা নিলে, বাস্তব জীবনের সর্বমুখী সজীব স্পর্শের থেকেই শিক্ষার্থী বঞ্চিত হয়ে পড়বে, আর তার ফলে আবার সেই গতানুগতিক বিশেষ শিক্ষা ও

বিশেষ ধরনের শ্রেণীগত জীবন নিয়ে তাদের গড়ে উঠতে থাকার আশঙ্কা লেগেই থাকবে। এজন্য নঈ তালিমের পদ্ধতিতে পরিবেশে রেখেই কিশোর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়ে দেওয়া দরকার। ব্যাপকভাবের সে কাজের ভার নঈ তালিমের হাতে থাকাই শ্রেয়। তারপরে যুবা বয়সে শিক্ষার্থীকে 'নঈ তালিমে'র বা 'বিশ্বভারতী'র সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার উচ্চতরমানে সুদক্ষ করিয়ে নিলে, তখন জনজীবনে অনভ্যস্ততা বা বিশেষ বৃত্তিমুখী শ্রেণীস্বাতন্ত্র্যের অভিমুখীনতা-দোষ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তখনই সে শিক্ষকের উপযুক্ত হতে পারবে। নঈ তালিম বিশেষ করেই নেবে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের কাজ, গ্রামোদ্যোগের সঙ্গে শিক্ষাকে সে ছড়িয়ে দেবে ঘরে ঘরে। আর, বিশ্বভারতী থাকবে তারই ধারায় পরিণত স্তরের শিক্ষাবিকীরণের কাজে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে ;—নদীর শাখা-প্রশাখার মতো নঈ তালিমে কর্মী-সরবরাহের দ্বারা সমস্ত দেশকে শিক্ষার প্রবাহে সে উর্বর করে তুলবে।

বিপুল ব্যয়, আয়োজন ও আয়তন-বহুল গোটা একটা বিশ্বভারতীকে গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠা দেওয়া সম্ভব নয়। এক-একটি ছাত্রের সুগঠিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়েই মাত্র বিশ্বভারতী আপন সর্বাঙ্গীণ সেবাকে নঈ তালিমের কেন্দ্র মারফতে দ্বারে-দ্বারে পৌঁছে দিতে পারে। নঈ তালিম ও বিশ্বভারতী এভাবে নিজ নিজ উপযোগিতায় পারস্পরিক সমবায় দ্বারা সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাকে সার্থক করে তুলে জগতে নূতন এক আদর্শ-সমাজ গড়বার সম্ভাবনা বহন করছে।

পূর্বে গ্রামাঞ্চলে আমাদের দেশীয় শিক্ষাধারা সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল বটে, কিন্তু তার মধ্যেও এই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা ঠিকমতো কার্যকরী হয়নি। বর্ণভেদ-অনুসারে বৃত্তিবিশেষের প্রাধান্য তাতে রক্ষিত হত। সুতরাং তাকেও স্বল্পাধিক বিশেষ পন্থানুযায়ী শিক্ষাই (Specialization) বলা চলে। তার থেকে সমাজে 'হুজুর' ও 'মজুর'-শ্রেণীরই ভিড় বেড়েছে মাত্র। সংহতির অভাবে সমাজের ধ্বংসরূপ যে আজ দিকে-দিকে প্রকট হয়ে উঠছে, এ সব সেই শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থাই শোচনীয় পরিণাম মাত্র।

বর্তমানকালে বিশেষ শিক্ষার বহু-বিষয়ক ব্যাপকতা ঘটে এক ধরনের নূতন বর্ণভেদ সৃষ্টি হয়েছে বটে, তেমনি দেশীয় বৃত্তিগত বর্ণবৈষম্যের পুরোনো বাঁধুনিতেও আবার শৈথিল্য ধরে এসেছে। এই অবস্থার পটভূমিতেই এখন নঈ তালিম ও বিশ্বভারতীর সমবায়ী উদ্যোগ সুরু হবার উপযুক্ত সময়। কারণ, আগে গ্রামে-গ্রামে সর্ববৃত্তিমুখী এই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা প্রচলনের যে সামাজিক বাধা ছিল, এখন

আর তা নেই। নঈ তালিমের শিক্ষাশিবিরে মেথরের কাজও আজ একজন ব্রাহ্মণের ছেলের পক্ষে শিক্ষণীয় হতে পারে। আবার, শহর-ঘেঁষা শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও নানাদিক থেকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে এই অভিজ্ঞতা জাগছে যে, একমাত্র লেখাপড়া শিখে, কলম পিষে, সমাজের মাথায় চড়ে বসার সুযোগ কমে এসেছে; এখন বেঁচে থাকতে হলে প্রতিবেশী সকলের সহযোগিতা চাই, এবং নিজেরও অভ্যাস থাকা চাই জীবনযাত্রার বিচিত্র কাজে। কাজের সে অভ্যাস না থাকলে কেবল মুখের কথার দ্বারা সমাজের সকলের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা হয় না, কেননা প্রকৃত আত্মীয়তা জন্মে না। আত্মীয়তা না জন্মালে পারস্পরিক হিতাকাঙ্ক্ষাই বা জাগবে কোথা থেকে। এতদিনকার বিশেষ শিক্ষার আমদানি-করা প্রতিযোগিতা ও হিংসার দৌড়ে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা সকলেই অল্পবিস্তর সঞ্চয় করে সচেতন হয়েছে। এখন তাই শিক্ষিতেরাও জনসমাজের উপযোগী হাতে-কলমের কার্যকর বৃত্তিশিক্ষায় স্বেচ্ছাতেই অগ্রসর হচ্ছে। গ্রামের পুরোনো জন-সমাজ এবং শহরের আধুনিক শিক্ষিত সমাজ দুই শ্রেণীর পক্ষেই এই অভিজ্ঞতার চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আসার দরকার ছিল।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসরণে "তপোবনে"-র শিক্ষার দ্বারা সমাজ গড়তে চেয়ে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেদিন ব্রাহ্মণের আদর্শই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল। বিত্তপ্রধান সভ্যতার চেয়ে চিত্তপ্রধান সভ্যতাই তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল বেশি। ১৩০৯ সনে নৈবেদ্য কাব্যে তিনি বলেছিলেন—

> "অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারায়ে।
> তাই মোরা লজ্জানত ; তাই সর্ব গায়ে
> ক্ষুধার্ত দুর্ভর দৈন্য করিছে দংশন ;
> তাই আজি ব্রাহ্মণের বিরল বসন
> সম্মান বহে না আর ; নাহি ধ্যানবল,
> শুধু জপমাত্র আছে ; শুচিত্ব কেবল
> চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার,
> সন্তোষের অন্তরেতে বীর্য নাহি আর,
> কেবল জড়ত্বপুঞ্জ ; ধর্ম প্রাণহীন
> ভার-সম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন।

তাই আজি দলে দলে চাই ছুটিবারে
পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে
লুকাতে প্রাচীন দৈন্য। বৃথা চেষ্টা ভাই,
সব সজ্জা লজ্জা-ভরা, চিত্ত যেথা নাই।"

আধুনিক সভ্যতা ও সমাজের হালচালের ফলাফল সম্বন্ধে তিনি সেদিন শঙ্কিতই ছিলেন। ভারতের সমাজ-জীবনের অতীত ও আধুনিক চিত্র পাশাপাশি অঙ্কিত করে তিনি পাশ্চাত্য প্রভাব বিষয়ে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে তাঁর তখনকার "ততঃ কিম্" ভাষণে বলেন,—

"আমাদের জীবনের সকল দিকেই ··একটা খাপছাড়া জোড়াতাড়া ব্যাপার ঘটিতেছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের আয়োজন আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়াছে; তাহার অসংগত ক্ষীণ অনুকরণের দ্বারা আমরা আমাদের আড়ম্বর আস্ফালনের প্রবৃত্তিকে খুব দৌড় করাইতেছি;··· ইহার মধ্যে শান্তি নাই, গাম্ভার্য নাই, শিষ্টতা শীলতার সংযম নাই, শ্রী নাই। এই নকলের যুগ আসিবার পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক মর্যাদা ছিল যে, দারিদ্র্যেও আমাদিকে মানাইত, মোটা ভাত মোটা কাপড়ে আমাদের গৌরব নষ্ট করিতে পারিত না।··· আমাদের সম্মান বাহিরের আহরণ করা ধন ছিল না, সে আমাদের অন্তরের সামগ্রী ছিল। সেই সহজাত কবচখানি আমাদের কাছ হইতে কে ভুলাইয়া লইল। ইহাতেই আমাদের আত্মরক্ষার উপায় চলিয়া গেছে।···সম্মান এখন বাহিরের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে, তাই উপাধির জন্য খ্যাতির জন্য আমরা বাহিরের দিকে ছুটিয়াছি, বাহিরের আড়ম্বরকে কেবল বাড়াইয়া তুলিয়াছি, এবং কোথাও একটু-কিছু ছিদ্র বাহির হইবার উপক্রম হইলেই তাহাকে মিথ্যার তালি দিয়া ঢাকা দিবার চেষ্টা করিতেছি।···এখন আমাদের ভদ্রতাকে সস্তা কাপড়ে অপমান করে, বিলাতি গৃহসজ্জার অভাবে উপহাস করে, চেকবহির অঙ্কপাতের ন্যূনতায় তাহার প্রতি কলঙ্কপাত করে—এমন ভদ্রতাকে মজুরের মতো বহন করিয়া গৌরববোধ করা যে কত লজ্জাকর, তাহাই আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। আর যে সকল পরিণামহীন উত্তেজনা উন্মাদনাকে আমরা সুখ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহার দ্বারা আমাদের মতো বহির্বিষয়ে পরাধীন জাতিকে অন্তঃকরণেও দাসানুদাস করিয়াছে।

কিন্তু একবার কেহ যদি আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া যথার্থ অধিকারের সহিত একথা বলেন যে, 'অসম্পূর্ণ প্রয়াসে, উন্মত্ত প্রতিযোগিতায়, অনিত্য ঐশ্বর্যে আমাদের

শ্রেয় নহে—জীবনের একটি পরিপূর্ণ পরিণাম আছে, সকল কর্ম সকল সাধনার একটি পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি আছে, এবং সেই পরিণাম এবং পরিসমাপ্তিই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র চরম সার্থকতা;—তাহার নিকটে আর সমস্তই তুচ্ছ', তবে আজও এই হাটবাজারের কোলাহলের মধ্যেও আমাদের সমস্ত হৃদয় সায় দিয়া উঠে, বলে, 'সত্য, ইহার চেয়ে সত্য আর কিছুই নাই।'...ইহাকে আমরা কোনোমতেই অস্বীকার করতে পারিব না; যদি করি, তবে ইহার পরিবর্তে আমরা এমন কিছুই পাইব না, যাহার দ্বারা আমরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব, যাহার দ্বারা আমরা আপনাকে রক্ষা করিতে পরিব। আমরা কেবলই তরবারির ছটা, বাণিজ্যের ঘটা, কলকারখানার রক্তচক্ষু এবং স্বর্গের প্রতিস্পর্ধী যে ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর আপনার উপকরণস্তূপকে উচ্চে তুলিয়া আকাশের সীমা মাপিবার ভান করিতেছে, তাহার উৎকটমূর্তি দেখিয়া সমস্ত মনেপ্রাণে কেবলই পরাস্ত পরাভূত হইতে থাকিব, কেবলই সংকুচিত শঙ্কিত হইয়া পৃথিবীর রাজপথে ভিক্ষাসম্বল দীনহীনের মতো ফিরিয়া বেড়াইব।...ইহার কাছে বিলাসীর উপকরণ, নেশনের প্রতাপ, রাজার ঐশ্বর্য, বণিকের সমৃদ্ধি, সমস্তই গৌণ; মানুষের আত্মাকে জয়ী হইতে হইবে, মানুষের আত্মাকে মুক্ত হইতে হইবে, তবেই মানুষের এতকালের সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইবে—নহিলে ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্।"

রবীন্দ্রনাথ শ্রেণীবিভক্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ যেমন দেখতে পেয়েছিলেন, তেমনি নিজের মধ্যেও বিশেষ শ্রেণীর সাংস্কৃতিক রুচি-বৈশিষ্টের প্রাধান্য তাঁর নিজের কাছে লক্ষ্যগোচর হয়েছিল। শ্রেণীর আশ্রয়ই যে রবীন্দ্রনাথকে নিরাশ্রয় করে তুলেছিল, একথা তিনি জীবনের শেষ পর্বে এসে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আরও বহু লোক থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজীকে নিতে অনুরোধ করেছিলেন 'বিশ্বভারতী'র ভার।

গান্ধীজী ছিলেন শ্রেণীহীন সর্বোদয়-সমাজের প্রতিষ্ঠাকামী। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার মূল নীতিকে জীবনের মূল থেকেই অনুসরণ করতে শেখাবার জন্য তিনি "বুনিয়াদী শিক্ষা" প্রবর্তন করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন জীবনযাত্রায় স্বাবলম্বনকে শেষে গৌণ করে রেখে দিয়ে সমবায় নীতি আশ্রয় করে বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক শিক্ষার কোঠাতেই শক্তি নিয়োগে যত্নবান হন, তেমনি গান্ধীজীকে বাস্তব জীবনযাত্রার খাওয়াপরা ও নৈতিক দিক ধরে সংগঠনের কাজেই লেগে থাকতে হয়,—তিনি সাংস্কৃতিক উচ্চস্তরের বিদ্যানুশীলন বা শিল্প সঙ্গীত-চর্চাকে গৌণ করে রাখেন তাঁর জীবন ও কর্মকেন্দ্র থেকে।

কিন্তু গান্ধীজীর যে চারুকলার প্রতিও অনুরাগ ছিল, তার পরিচয় মেলে। তাঁর আশ্রমে গায়কের কাছে থেকে তিনি নিয়মিত ভজন শুনতেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তিনি একান্তই অনুরাগী ছিলেন। যেখানে যেতেন, সন্ধান করে সে-গান শুনতেন। শিল্পাচার্যদের প্রতিও নানা সময়ে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের পরস্পরের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধের প্রগাঢ়তার কথা সকলেই জানেন। দু'জনেই মনে করতেন, জীবনের সব কিছু বিষয়ের সার্থকতা ভগবৎ-উপলব্ধিতে এবং সকলের সঙ্গে একাত্মতা সাধনে। এই একাত্মতাবোধ বা ব্রহ্ম উপলব্ধি করতে চান একজন বোধির দ্বারা, বিচিত্র বিদ্যার যে-কোনো এক বা একাধিক পথে এগিয়ে যেতে যেতে। তিনি বলেন, "শুধু বন্ধন ছিন্ন করায় নয়—সম্বন্ধের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যেই মুক্তি। যেখানে মুক্তি শুধু ফাঁকা ও বস্তুবর্জিত সেখানে তার কোনো মানে নেই। যা কিছু আছে—সবার মূলে যে সত্য—তার সঙ্গে পূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনা করাতেই আত্মার মোক্ষ—তাকে বর্ণনা করা যায় না, কারণ সে বর্ণনাতীত।" (সভাপতির ভাষণের অনুবাদ—ডাঃ কালিদাস নাগ, রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব ১৩৪২, শারদীয়া বসুমতী ১৩৫৭) মানসিক চর্চার স্তরকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাধনার ক্ষেত্র বলে গ্রহণ করেছেন, শান্তিনিকেতনের দিকে চাইলে এ কথাই লোকের মনে হবে। কিন্তু শ্রীনিকেতনের মধ্যে তিনি কিছু কিছু দৈহিক স্তরের কাজেরও সূত্রপাত করেছেন। সেও আমরা উপেক্ষা করতে পারিনে।

গান্ধীজীর ব্রহ্মানুভূতি-সাধনার ক্ষেত্র কেবল মানুষের মনোলোকে নয়,—তাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার প্রতি কাজের মধ্যেও। চারুকলা বা গবেষণাদির কাজকে তিনি সে-পরিমাণেই অভ্যাসের মধ্যে স্থান দেন, যে-পরিমাণে তা মানুষের বাস্তব জীবনের পারিবেশিক সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে খাপ খেয়ে ব্যবহারে লাগে; ব্যবহারে সঙ্গে মননের সামঞ্জস্য রাখাই তিনি সত্য উপলব্ধির প্রশস্ত উপায় জানতেন। রবীন্দ্রনাথ জানতেন দেহের উপরের বিষয় মন। তাই তিনি দেহের প্রয়োজনের উপরেও মনের প্রয়োজনের বিষয়কে মুখ্য স্থান দিতেন এবং দেহের আগে-আগে মনের গতি বেগবান ও সুদূরপ্রসারী বলে মনের ঐকান্তিক সাধনার দ্বারাই অবলীলাক্রমে আশ্চর্যরূপে নিগূঢ় পথে সর্বানুভূতি লাভ সম্ভব মনে করতেন। এই বোধের থেকে তিনি সমস্ত ভুবনকেই মানুষের স্বদেশ ও সাধনার ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন, আন্তর্জাতিকতা তাঁর মধ্যে এই বোধ থেকেই প্রাধান্য লাভ করেছিল। গান্ধীজী শুধু মনের দ্বারা কোনোকিছু পাওয়াকে সত্যিকার সম্পূর্ণ পাওয়া বলে স্বীকার

করতেন না; যতক্ষণ না কোনো বিষয়কে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় সত্য করে লাভ করা যায়, ততক্ষণ পাওয়া হয় আংশিক, সুতরাং উপলব্ধিও থাকে অপূর্ণ। দুর্গতজনের দুঃখের কথা রবীন্দ্রনাথ যখন অনুভূতি দিয়ে বলেন, তখন চোখে জল আসে; কবির কথায় আমরা আমাদের জীবনও দুঃখীদের সেই দুঃখ ঘোচাতে উৎসর্গ করতে পারি, কিন্তু গান্ধীজী আমাদের ডাক দেন কার্যত সেই জীবনের অংশীদার হতে; তিনি তাদের মতোই পরেন নেংটি, থাকেন কুটীরে, তাদের বৃত্তির সঙ্গে সহযোগিতা করেন চরখাকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করে। যখন সকলকে উন্নততর জীবনের স্তরে উন্নীত করা যাবে, তখন সকলের মতো সকলের সঙ্গে মিলে উচ্চ শিল্পকলা বা বিদ্যাচর্চাকেও সম্যক্ যত্নে জীবনের দৈনন্দিন কাজের অপরিহার্য অঙ্গ করে তোলা যাবে। আপাতত যে-অঞ্চলে যে-শিল্প ও বিদ্যা সকলের মধ্যে সহজভাবে ছড়িয়ে আছে, তারই উন্নতি সাধন করা এবং তার সাহায্যে সে-অঞ্চলবাসীদের জীবিকা ও জ্ঞানপ্রসারণেরও চেষ্টা করাই বিধেয়। কারণ, এতেই লোকে স্থূল প্রয়োজন মেটাবার সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে বিনাব্যয়ে শিল্পরুচির আনন্দলাভ করতে সক্ষম হবে। তা হলেই এর পরে ক্ষেত্র তৈরি হলে উপযুক্ত সময়ে অন্য দশটা দেশের শিল্প ও বিদ্যার যোগ ঘটানো হবে সহজ। নয়তো, অন্নবস্ত্রের ও অন্য দশটা প্রয়োজনের উদ্ব্যস্ততা পিছনে রেখে দুর্বল দেহ ও অসহায়ভাবের ভিত্তির উপর মনের উচ্চতর অনুশীলনী মহল খাড়া করতে গেলে তা নির্ভরযোগ্য হবার নয়। তা সুন্দর হয়ে প্রসার লাভ করতে পারে, কিন্তু সে-প্রসার সাময়িক হবার আশঙ্কাই থাকে বেশি। গান্ধীজী ভিত্তি থেকেই জীবনের উপলব্ধিকে অটুট অক্ষয় করে গেঁথে তুলতে চান। এজন্যই তিনি বিশ্বের বোধ মনে বিস্তারিত করে রাখলেও যার-যার বাস্তব পরিবেশের মধ্যেই তার তার শিক্ষা ও জীবনকে প্রথম নিবদ্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

মনের প্রসার ও তদ্দ্বারা জগতের আত্মীয়তা অর্জন দুজনেরই ছিল পরম কাম্য। রবীন্দ্রনাথ মনের নিবিড় প্রেরণা দ্বারা ব্যবহারের বিস্তারিত পর্যায়গুলি অতিক্রম করা সম্ভব মনে করতেন। এ জন্য তিনি তাঁর বিশ্বভারতীতে গড়েছিলেন বেশি করে মনের অনুকূল পরিবেশ। গান্ধীজী মনের প্রেরণাকে জীবনের ব্যবহারে পূর্ণতর করবার আবশ্যকতা বোধ করতেন; তাই তিনি গড়েছিলেন তাঁর কার্যক্ষেত্রে বেশি করে বাস্তব-ব্যবহারের পরিবেশ। প্রতিবর্ণে চতুর্বর্ণের বৃত্তির সমাবেশ করে তিনি জীবনে যে সর্বশ্রেণীর একাত্মতা জাগাতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংস্কৃতির পথে সেই জিনিসেরই আয়োজন করে গেছেন। তাঁর মন্ত্র ছিল—

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"। তাঁর ভাষণে, তাঁর রচনায়, বারবার ব্যবহৃত হয়েছে—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" এবং "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"। তিনি বলেন,—

"আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ মধুপান,
দুঃখের বাধার মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।"

তিনি মানতেন,—"Art for Art's Sake", প্রয়োজনের উদ্বৃত্তের মধ্যেই মানুষের সাধনা মহত্ত্ব পেতে পারে। গান্ধীজীর মন্ত্র ছিল—"Truth is God"; এই Truth বাস্তবের প্রতি-তুচ্ছতার মধ্যেও ব্যাপ্ত, সেখান থেকে তাঁকে ব্যবহারে জানা চাই, শুধু মননে নয়। এজন্যই তাঁর বাণী ছিল 'Art for life's sake'। জীবনের প্রয়োজনে যা লাগবে তাই সাধনার যোগ্য। এই প্রয়োজনের বাস্তব স্তর-বিচার (level) নিয়েই দুয়ের সাধনা দুই বিশেষ দৃষ্টি থেকে বাইরের রূপেও পরস্পর পৃথক্ হয়ে রইল।

মানবসমাজ-সৌধের ভিত্তির দিকটা মজবুৎ করে গড়ে-পিটে তুলবার জন্য মালমশলা সংগ্রহের কাজ যখন গান্ধীজী গ্রহণ করলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন বসে গেছেন তার দোতলা-তেতলার বিচিত্র মহল ও চূড়ার অলংকরণের পরিকল্পনায়। তলা থেকে উপর অবধি গোটা ইমারতের সর্বাঙ্গীণ সংস্করণের সামঞ্জস্যপূর্ণ চেষ্টায় অগ্রসর হতে দু'জনার একজনাও যথেষ্ট সময় পেয়ে উঠলেন না।

অথচ, বিত্তপ্রধান সভ্যতার বিশ্বব্যাপী একঘেয়ে একপেশে প্রতিপত্তির দিনে, এই ভারতবর্ষে শোনা গিয়েছিল জীবনের ও শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ চর্চার অনুকূল নূতন একটি সুরের আভাস--এই দুই মহাপুরুষের বাণী ও জীবনীধারা থেকেই। এই দু'জনের সাধনার মধ্যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার অনুকূল অনেক-কিছু উপকরণ ও সুযোগ জমা হয়ে রয়েছে,—সে কথা ভুলবার নয়। আজ দেশ-কাল-পাত্রগত পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে। এসময়ে তাঁদের দানের সদ্ব্যবহার যতটা করা যায়, তা অবশ্যই করতে হবে।

পরিপূর্ণ দৃষ্টি

শিক্ষাসম্বন্ধে নানাজনের নানা দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গিয়ে থাকে। বিচার, অভিমত ও বিশেষ বিশেষ বিধির প্রবর্তনায় শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে পার্থক্য থাকাও বিচিত্র নয়; দেশ-কাল-পাত্র ও রুচিভেদে সে বৈচিত্র্য থাকা স্বাভাবিক; তা সত্ত্বেও সকল ক্ষেত্রেই যে-একটি বিষয়ের অমূল্যতা সকলের দ্বারা অবিসম্বাদিতরূপে স্বীকৃত হবে, সে বিষয়টির কথা শিক্ষাপ্রসঙ্গের শেষ অধ্যায়ের কথা বলে ধরা চলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে সে বিষয়টি হচ্ছে—**"পরিপূর্ণ দৃষ্টি"**। সকল প্রকারের শিক্ষা, বিশেষত সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা আরো সার্থক হয়ে উঠবে—এই পরিপূর্ণ দৃষ্টি লাভে। এই বিশেষ বিষয়টিতে শিক্ষার্থীদের সিদ্ধি কামনা ক'রেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীর সাধনায় আত্মসমাহিত হয়েছিলেন। 'পরিপূর্ণ দৃষ্টি' বলতে তিনি কী বুঝতেন এবং কী অবস্থার মধ্যে থেকে কালের পর্বেপর্বে তিনি কী শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন ক'রে তাঁর সেই পরম লক্ষ্যের দিকে সকলকে অগ্রসর ক'রে দিতে চেয়েছেন, আজ সেই রহস্য অনুধাবন ক'রে দেখার সুযোগ সম্মুখে বিদ্যমান। দেশ ছেয়ে চলেছিল গতানুগতিক শিক্ষাধারার প্লাবন; তার অপ্রতিহত গতিবেগের মধ্যে দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক সাধনা; যেমন তা স্বাধীন প্রবর্তনার চারিত্রশক্তিতে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রমের নিদর্শন,—বহুদিনের বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা ঘাত-প্রতিঘাতের ঘূর্ণিপাক পার হয়ে এসে ধারাপ্রবর্তক মহাকবির প্রেরণালোকগত দিব্যসত্যের বাস্তব আভাসে এই সাধনার ইতিহাস তেমনি গরিমাযুক্ত। শিক্ষা নিয়ে নানা প্রবর্তনার ইতিহাসধারক এমন প্রতিষ্ঠান আমাদের প্রত্যক্ষের মধ্যে বিরল। সেই প্রতিষ্ঠানটির ধারাবাহীদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ববন্দিত মনীষী নানা সময়ে যা বলে গেছেন আশা করা যায় তাঁর সেই ভাষণগুলির আলোচনা অনুসরণেই 'পরিপূর্ণ দৃষ্টি' কথাটির তাৎপর্য ভালো করে বোঝা যাবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দানের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার কালে অন্য শিক্ষাশাস্ত্রীদের প্রভাবের কথা যেখানেই কারও মনে হবে, সেখানে গবেষকদের কাছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উক্তির সারবত্তাও অবশ্যই বিচার্য হওয়া উচিত।

জীবনের প্রান্তে এসে প্রয়াণের পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৩৪৩ সালের ২৭শে বৈশাখ কলিকাতা শাখা আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত জন্মোৎসবের অভিভাষণে কবি বলেন, "আমার চরিত্র প্রকাশধর্মী, তপোবন-বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার মনে যে একটি ছবি ছিল তাকেই আমি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম—এর মধ্যে বিশ্বমানবের উপকার করবার কোন আগ্রহ ছিল না। আমার মনের এই সুস্পষ্ট ছবি নানা অভাবের মধ্য দিয়ে বাইরে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল—আমি অন্য কারও নকল করতে যাইনি, কোন বিদেশীর শিক্ষাপ্রণালীর অনুসরণ করিনি, সেদিকে আমার দৃষ্টি বা অভিজ্ঞতা ছিল না।" (প্রাক্তনী, পৃ ১২-১৩)

এ কথা ঠিক, 'আশ্রম বিদ্যালয়ের আরম্ভকালে' প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শই কবির 'অন্তরে' ছিল। কিন্তু তখন থেকেই তিনি চেয়েছিলেন এমন করে সে আদর্শকে রূপ দেবেন, যাতে তা প্রাচীনের অবিকল নকল হবে না, তাতে "অনেক বৈসাদৃশ্য থাকবে, এমন কি, অনেক কিছু উল্টোও থাকবে—কিন্তু মূল আদর্শটি অক্ষুণ্ণ থাকবে।"

তপোবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গুরু ও শিষ্যদের দৈনন্দিন সর্বাঙ্গীণ জীবনের সুসম্বদ্ধ ধারা চলেছে; সেখানে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সামগ্রিক জীবনেরই একাংশ মাত্র। দিনান্তে হোমধেনুটি যেমন প্রাঙ্গণে ফিরছে, মাথায় সমিধ্ভার নিয়ে শিষ্যরাও এসে সমবেত হচ্ছে আশ্রমে। জীবজন্তু কীটপতঙ্গ সব মিলে একটি জীবন। ধ্যানে এবং কাজেকর্মে সেই জীবনকে ভিতরে বাইরে উপলব্ধি করাই সেখানকার শিক্ষার সার্থকতা। সকলের এবং নিজেরও ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলি যথাসম্ভব নিজেই সমাধা করে অহরহ কাজের মধ্য দিয়ে গুরুউপদেশলব্ধ জ্ঞানকে হাতেকলমে প্রকৃষ্টভাবে প্রাকৃতিক দানের সঙ্গে স্বাঙ্গীকৃত করে নেওয়ার চেষ্টার মধ্যে শিক্ষার এক প্রাণবান রূপ কবি লক্ষ্য করেছিলেন। "বাল্যকাল থেকে" তার অনুরাগী হয়ে তিনি মধ্যবয়সে সেই শিক্ষারই প্রবর্তন করলেন শান্তি-নিকেতনের "আশ্রম বিদ্যালয়ে।"

এ পর্যায়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি বলেছেন—"এণ্ট্রান্স স্কুল এখানে যে স্থাপন করা হয়েছিল, সে একটা অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শকে গড়ে তোলবার জন্য।" (প্রাক্তনী, পৃ ৩৪, ৮ই পৌষ ১৩২৬) শিক্ষাকে কবি প্রথম থেকেই প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী 'কৃচ্ছ্রসাধ্য' করে তোলেননি। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছি তাঁর বিশ্বাস ছিল, "আনন্দের ভিতর দিয়ে মুক্তির হাওয়ার মধ্যে শিশুচিত্ত যেমন বিকশিত হয়, তেমন আর কিছুতে হওয়া সম্ভব

নয়।" যার যার স্বভাবজ সৃষ্টিপ্রতিভা-বিকাশের প্রেরণা জুগিয়ে তার সঙ্গে খেলাধুলা, গান বাজনা, নৃত্যগীত অভিনয়, উৎসব, সভাসমিতি, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির ব্যবহার, বিবিধ হাতের কাজ, কৃষি, উদ্যানরচনা সবকিছুর সাহায্যে এ পর্যায়ে কাজের বৈচিত্র্য ও বিনোদনে শিশুদের চিত্ত ভরিয়ে তোলা হয়। আরেক রকমের বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তব্যবস্থার প্রবর্তনা দ্বারাও আনন্দ এবং মুক্তির আবহাওয়া সৃষ্টির সহায়তা করা হচ্ছিল। সংঘজীবন যাপন এবং জনসেবার ছোটোখাটো উপলক্ষও এ সঙ্গে ছিল। প্রতিবেশী পল্লীবাসীদের যোগ থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল না। এই সময়কার একটি বর্ণনায় কবি আপন অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন,—'যে সব ছেলে এসেছিল তারাও যে সব রত্ন তা নয় ; কোথাও যাদের গতি নেই, বাপ-মা ত্যাগ করতে পারলে বাঁচে তারাই প্রথমে এসেছিল এখানে। একজন অভিভাবক আমাকে বলেছিলেন তাঁর ছেলের সম্বন্ধে, 'এ অত্যন্ত অবাধ্য, এঁকে যথাসাধ্য মারবেন, আমি খাটের খুরোতে বেঁধে একে মেরেও কোন ফল পাইনি, তাই আপনার হাতে দিচ্ছি।' কোন কোন ছাত্র এমন দুর্দান্ত ছিল যে তারা সাপ দেখলেই ধরতে যেত, কেউ বা কাচ খেতে চাইত, কেউ তালগাছের চূড়ায় উঠে বসে থাকত,—সেখান থেকে পড়েও মরেনি। আশ্রম তখন ছোটো খাটো পূর্ববঙ্গ হয়ে উঠেছিল, গোয়ালন্দের ইস্টিশন। অধ্যাপকেরা ধৈর্য হারাতেন, বলতেন,—এরা থাকলে আমাদের কোন দায়িত্ব থাকবে না। অনেকবার তাই আমাকে সে সব দুর্দান্ত ছাত্রদের জামীন হতে হয়েছে—সে রকম ক্ষেত্রে তারা সর্বদাই আমার মান রেখেছে। সর্বদাই আমি তাদের পক্ষ নিয়েছি, আমার কাছে নালিশ হলে প্রায়ই রায় দিয়েছি তাদের পক্ষে।

তৎসত্ত্বেও তখন আমাদের আনন্দের কোন ব্যাঘাত হয়নি, দুঃখ কষ্ট সহজেই সহ্য করতে পেরেছি—নিয়মপালনই তখন একান্ত হয়ে ওঠেনি, তার মধ্যে স্বাধীনতা ছিল। বিদ্যালয়ে তখন হেডমাস্টার বলে কেউ ছিলনা, প্রত্যেক বিভাগে শিক্ষকরাই ছিলেন সর্বময় কর্তা।" (প্রাক্তনী, পৃ ১৬-১৭, ভাষণ ২৭শে বৈশাখ ১৩৪৩)

১৯০১ সনে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯১২ সনে কবি বিলাত ও আমেরিকা ভ্রমণে বের হন। সে সময়ে একটি নূতন প্রেরণা তাঁর মনে আসে। তিনি "যাত্রার পূর্বপত্রে" লিখেছেন, "মানুষের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিদ্যালয়ের সম্বন্ধটা অবারিত করিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি। আমরা সেই বড়ো পৃথিবীর নিমন্ত্রণের পত্র পাইয়াছি,

কিন্তু সেই নিমন্ত্রণ তো বিদ্যালয়ের দুই শো ছাত্র মিলিয়া রক্ষা করিতে যাইতে পারিব না। তাই স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের হইয়া আমি একলাই এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব। আমার একলার মধ্যেই তোমাদের সকলের ভ্রমণ সারিয়া লইব। যখন আবার তোমাদের আশ্রমে ফিরিয়া আসিব তখন বাহিরের পৃথিবীটাকে আমার জীবনের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে ভরিয়া আনিতে পারিব। ...দুইটা চক্ষু পাইয়াছি, সেই দুইটা চক্ষু বিরাটকে যত দিক দিয়া যত বিচিত্র করিয়া দেখিবে ততই সার্থক হইবে।" (পথের সঞ্চয়, পৃ ১-২)

কবির বিশ্বভারতী-সৃষ্টির ইতিহাসে উপরোক্ত কথাগুলির একটি বিশেষ ঐতিহাসিক এবং আধ্যাত্মিক গুরুত্ব রয়েছে। বস্তুতঃ বিরাটকে বিচিত্র করে দেখাই বিশ্বভারতীর সকল কাজ ও ভাবের প্রধান সার্থকতা। দৃষ্টির অন্তরালে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি এখান থেকেই মোড় ফেরবার ইঙ্গিত পেল। এই সময়কার লেখা পত্রগুলিতে দেশের ও বিদেশের সমাজ ও শিক্ষারীতি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা আছে। দেশীয় ধারায় সমালোচনায় কবি বলেছেন, "আমাদের সমাজ আমাদের কালের উপযোগী শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছে না; আমাদিগকে দুই চারি হাজার বৎসর পূর্বকালের শিক্ষা দিতেছে। অতএব মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে সকলের চেয়ে যে বড়ো বিদ্যালয় সেটা আমাদের বন্ধ।...আমাদের বর্তমান সমাজের কোন সজীব দাবি নাই—এখনও সে মানুষকে বলিতেছে, 'ব্রাহ্মণ হও, শূদ্র হও।' যাহা বলিতেছে তাহা সত্যভাবে পালন করা কোন মতেই সম্ভবপর নহে, সুতরাং মানুষ তাহাকে কেবলমাত্র বাহিরের দিক হইতে মানিয়া লইতেছে। ব্রাহ্মণ হইবার কালে ব্রহ্মচর্য নাই; মাথা মুড়াইবার তিন দিনের প্রহসন-অভিনয়ের পর গলায় সূত্রধারণ আছে। তপস্যার দ্বারা পবিত্র জীবনের শিক্ষা ব্রাহ্মণ এখন আর দান করিতে পারে না, কিন্তু পদধূলিদানের বেলায় সে অসংকোচে মুক্তপদ। এদিকে জাতিভেদের মূলপ্রতিষ্ঠা বৃত্তিভেদ একেবারেই ঘুচিয়া গেছে এবং তাহাকে রক্ষা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে, অথচ বর্ণভেদের বাহ্য বিধিনিষেধ সমস্তই অচল হইয়া বসিয়া আছে। খাঁচাটাকে তাহার সমস্ত লোহার শিক ও শিকল সমেত মানিতেই হইবে, অথচ পাখিটা মরিয়া গেছে।...গুরু পুরাকালের বিস্মৃত ভাষায় শিষ্যকে উপদেশ দিতেছে, শিষ্যের তাহা গ্রহণ করিবার মতো শ্রদ্ধাও নাই, সাধ্যও নাই, ইচ্ছাও নাই।" (পথের সঞ্চয়, শিক্ষাবিধি, পৃ ১৮০-৮১) কবি বিলাতের সমাজ দেখে বললেন,—
"...আবার একবার আমাদিগকে নূতন করিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য ভাবিতে

হইবে। য়ুরোপের নকল করিয়া সে কাজ চলিবে না; কিন্তু য়ুরোপের কাছ হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষা করা এবং নকল করা একই কথা নহে। বস্তুত, ঠিকভাবে শিক্ষা করিলেই নকল করার ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অন্যকে সত্যরূপে না জানিলে নিজেকে কখনই সত্যরূপে জানা যায় না...আমরা আদর-আবদারের জীব, আত্মীয় সমাজের বাহিরে আমাদের বড়ো বিপত্তি।... এখানকার সবচেয়ে বড়ো সত্য এখানকার সমাজ। বস্তুত, এখানকার সবচেয়ে বড়ো বীরত্ব বড়ো মহত্ত্ব এখানকার সমাজের ক্ষেত্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে নহে। প্রশস্ত সমাজের উপযোগী ত্যাগ এবং আত্মসম্মান এখানে পদে পদে প্রকাশ পাইতেছে; এইখানে ইহারা মানুষ হইতেছে এবং নানা পথে মানুষের কাজে আপনাকে দান করিবার জন্য ইহারা প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় নিজের দেশেও স্কুলের শিক্ষাকেই শিক্ষা বলিয়া গণ্য করে—বৃহৎ সমাজের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত; এখানেও আসিয়া যদি তাহারা স্কুলের কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেবলমাত্র কলের সামগ্রী হইয়া বাহির হইয়া যায়, এখানকার সমাজে প্রত্যক্ষ মনুষ্যত্বের জন্মস্থানে প্রবেশ না করে, তবে বিদেশে আসিয়াও বঞ্চিত হইবে।" (পথের সঞ্চয়, সমাজভেদ, পৃ ১৬৩-৬৪)

এর পরে কবি কেবল দেশের ছেলেমেয়েদের দিনচর্যা আর বিবিধ বিদ্যাশিক্ষার মধ্যেই আশ্রমের শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন মনে করলেন না। দেশবিদেশের বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত বিরাট মানুষের বিচিত্র পরিচয় আদান-প্রদানের উপায় ভাবতে লাগলেন। কবির দৃষ্টিতে ক্রমে উদ্ভাসিত হল সাংস্কৃতিক যোগের বিস্তৃততর পরিধি। মানুষের যে সত্তা দেশকাল পেরিয়ে বিরাজিত থাকে, এবং পরস্পরের কাছে অপেক্ষাকৃত সহজে ধার দিতে পারে—সে তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ-সমবায়ে গঠিত জাতীয় সংস্কৃতি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় সাধন দ্বারা বৃহত্তর ও গভীরতর করে মানুষের উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রসারিত করবার কথা যখন মনে এল, তখন থেকেই ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীতে পরিণত হতে চলল। এই সময়কার একটি ভাষণে কবি বলেছেন, "গত পঞ্চাশ বৎসরে আমাদের দেশে অনেক এন্‌জিনিয়র অনেক উকিল হয়েছে কিন্তু মাথা হেঁট হয় যখন ভাবি, খালি মুখস্থ করেছি এবং ডিগ্রি পেয়েছি কিন্তু পৃথিবীকে কিছুই দিইনি।...এই পৃথিবীতে যে নজরবন্দী হয়ে থাকব সে তো বিধাতা হতে দেবেন না—মানুষকে তিনি মানুষের সঙ্গে মেলাবেন; যদি এমন প্রাচীর গড়ে যাতে অন্যদেশের সঙ্গে মিলন না হয়, তবে আঘাতের পর আঘাত

এসে সব বাধা ভাঙবে—প্রেমের পথে মিলন না হলে বিরোধের পথে হবে। নিজের নিজের কোণে বসে উৎকর্ষ লাভ করবার দিন গেছে।...

ঐক্যের যোগে হঠাৎ বল লাভ করলে যে জাত সে এসে ভারতবর্ষকে আঘাত করলে—দেশে শক্তির বীরত্বের অভাব ছিল না, কিন্তু বীরত্বে তো বাঁচতে পারিনি; ধর্মভীরুতা কম ছিল না, যথার্থ মনুষ্যত্বও যে ছিল না তা নয়,—কিন্তু কিছুতে কিছু হল না, মার খেলুম। বিধাতা দেখালেন মঙ্গল কোন্ পথে—যাদের ঘর নেই, দুয়োর নেই, সেই যাযাবর জাতিদের মধ্যে কী আশ্চর্য ঐক্য—এত বড়ো প্রবীণ প্রাচীন ভারতবর্ষ তার সামনে দাঁড়াতে পারলে না। কোথায় ছিল তখন ভারতবর্ষ। কেউ অতীত নিয়ে গৌরব করতে ব্যস্ত, কেউ শাস্ত্র-আচার নিয়ে, কেউ বা আফিম খেয়ে ঝিমুচ্ছে। কে বলতে পেরেছে আমার ভারতবর্ষ, কে তার জন্য সর্বস্ব দিয়েছি, সকলকে আপন, বিচ্ছিন্নকে মিলিত করবার জন্য চেষ্টা করেছি? যদি না তা পেরে থাকি তবে হঠাৎ আজ কেমন করে বলতে পারব, ভারতবর্ষ আমাদের।...লণ্ডন-প্যারিসের আমদানি আদর্শের দাসত্ব থেকেও মুক্তি পেতে হবে।...আমাদের নিজের দেশের যা কিছু সাধনা, তার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় সাধন করতে হবে, তারপরে বাইরে হাত বাড়াব, মনের ভীরুতা থাকবে না।...

বিদ্যার দিক থেকে জ্ঞানের দিক থেকে ভারতবর্ষের কি কিছু দেবার নেই?... পূর্বপুরুষদের চিত্তশক্তি আমাদের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। লড়াই করতে পারি না, বাণিজ্য করতে পারি না,—সে লজ্জার বিষয় হবে না, যেদিন গৌরবের সঙ্গে আমাদের সেই চিত্তসম্পদ সকলকে দিতে পারব।" (প্রাক্তনী, পৃ ২৮-৩৩, ৮ই পৌষ ১৩২৫)।

পরের বছরের ভাষণে কবি বললেন, "ভারতবর্ষের যা অন্তরতর বস্তু তার তপস্যা ধ্যান আলোচনা কত যুগ ধরে হয়েছে, কিন্তু আমাদের পিতৃপিতামহের এই জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় নেই।...টোলে পুঁথিপড়া লোকেরা বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি বলেই তাঁরা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ করে জানেন না। আমাদের দেশের জ্ঞানকে সত্য করে ভালো করে জানবার জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যার ক্ষেত্রে উপস্থিত করতে হবে; বিশ্বের সঙ্গে একক্ষেত্রে দাঁড়াবার আমাদের এই যে অনুষ্ঠান, এ সত্যে বড়ো হয়ে উঠবে ব্যাপ্তিতে নয়, এই কথাই আজ আমি বলতে চাই।...ভারতবর্ষের জ্ঞান আজ আপনার রূপকে প্রকাশ করতে চাচ্ছে। এই সব কর্মী সাধক গুরু, সকলে মিলিত হয়ে এটিকে সার্থক কর...।" (প্রাক্তনী, পৃ ৩৮-৩৯, ৮ই পৌষ ১৩২৬)

১৩২৮ সালের ৭ই পৌষে বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়। ১৩২৯ সনের বার্ষিক উৎসবের ভাষণে কবি বললেন,—"আজ আমরা মনে করছি, আমরা নিজের ইচ্ছায় বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করলুম। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এক সময়ে আমরা এই বলে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছি যে এখানে শিক্ষার ব্যবস্থাকে বড়ো করব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার এখানে সমাবেশ হবে; তাহলেই এখানে শিক্ষার যে আয়োজন করেছি তা পূর্ণাঙ্গ হবে।...দেখলুম আমাদের হাতে গড়া পরিধির মধ্যে এ কুলোল না। সমস্ত বিশ্বের অতিথি আজ এর দ্বারে এসে চিত্তের অন্ন দাবি করছেন, এই অতিথিসেবার মহৎ দাবির সঙ্গে আমাদের কার্যের আয়োজনকে মিলিয়ে চলতে হবে। একথা বলতে পারব না যে, আমরা পাঁচজনে মিলে যা গড়ছি তাই চূড়ান্ত; আমার মন অন্তত এমন কথা বলে না।" (প্রাক্তনী, পৃঃ ৪২-৪৩)

১৩৩৯ সনের ৮ই পৌষে শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে সম্মিলিত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের প্রতি ভাষণে কবি বলেন, "যাতে প্রাণের ধর্ম নেই তেমন বিদ্যায়তনে আমার উৎসাহ নেই। আমি ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধির দাবি রাখিনে. যদি হৃদয়ের প্রেমের সূত্রে ভক্তি ও প্রীতির দ্বারা এই আশ্রম দূরে দূরে ভারতের সকল মানুষকে বাঁধতে পারে, যদি এই আশ্রমে বিশ্বপ্রাণের রূপটি ব্যক্ত হয় তবেই যথার্থ সফলতা লাভ হবে।' (প্রাক্তনী, পৃ ২৩)

বিদ্যালয়ের সূচনাকালের দিনগুলিতে ছিল যেখানে মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে জীবনকে বড় করে জেনে বিবিধ বিষয়ের চর্চায় এক-একজনের আত্মবিকাশের আয়োজন, সেখানে পরে এল সংস্কৃতির যোগসাধনা এবং তারই সঙ্গে সে যোগ যাতে ব্যাপক ও বাস্তব সংস্পর্শে আরও সজীব সুদৃঢ় হয়ে ওঠে, সেজন্য বিদ্যার সঙ্গে বিশ্বমানবের সাক্ষাৎ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিরও ব্যবস্থা করা হল। লেভি, উইন্টারনিজ, টুচ্চি, ফর্মিকি, প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ ও নানা দেশের ছাত্রগণ ক্রমে সেই ব্যবস্থায় শান্তিনিকেতনে এসে মিলতে লাগলেন। একটি যৌথ-পরিবারের মতো যোগাযোগে আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে উঠল। সেখানকার পাঠভবন, শিক্ষাভবন, বিনয়ভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবন ও শিল্পভবন প্রভৃতিতে মানুষ মানুষের নানা গুণের ও বিদ্যার বিকাশ দেখে, তেমনি বিদ্যাভবন, চীনাভবন, হিন্দিভবন, গ্রন্থভবনে তারা নানাদেশের পরস্পরকে দেখতে পায় তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে। এ ছাড়া, ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে, খাদ্যভবনে, মন্দিরে, বৈতালিকে, দিনান্তিকায়, বনভোজনে, ভ্রমণে, উৎসবে, সভাসমিতিতে ঘটে নিত্যনৈমিত্তিক সামাজিক ও ব্যক্তিগত

সংস্পর্শলাভ। দূরে অস্পষ্ট দেখার পরদা কেটে গিয়ে এই সত্যই শিক্ষার্থীর চোখে উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দিতে থাকে, "মানুষ সমস্ত মানুষের মধ্যেই সার্থক।" (প্রাক্তনী, পৃ ৪৩)

মানুষ মানুষকে জানবে, দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারে, জানবে তার নানা গুণের পরিচয়ে, কিন্তু যতক্ষণ সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের একাত্মবোধটি এর দ্বারা প্রত্যেকের মনে পরিস্ফুট না হচ্ছে ততক্ষণ কিছুই হল না। আধুনিক কালোপযোগী হাতের কাজ, সঙ্গীত, নৃত্য এবং আরও যে সকল বিদ্যা যখনই যতটা শান্তিনিকেতনে প্রসার লাভ করুক না কেন, সেগুলিকে আশ্রমজীবনের সামগ্রিক ধারা থেকে স্বতন্ত্র করে দেখা বা তার কোন-একটিতে একান্তভাবে কৃতিত্বলাভেই যে এখানকার শিক্ষার সার্থকতা, কবি এরূপ মনে করতেন না। আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রদের লক্ষ্য করে তিনি একদা স্পষ্টই বলেছেন, "এই আশ্রমে আমি একটি সম্পূর্ণ জীবনের আদর্শ গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম—ছাত্র এবং অধ্যাপক মিলে একটি সমগ্র সত্তা সৃষ্টি করে তুলবেন, এই আমার লক্ষ্য ছিল। খণ্ড করে যদি দেখি তাহলে দেখব আমরা এখানে পড়তে এসেছি বা অন্যান্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আমাদের আছে—যেমন অন্যান্য বিদ্যালয়—সেখানে ছাত্রেরা বেতন দিচ্ছে এবং তার পরিবর্তে তারা বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় শিখতে পাচ্ছে; এই দুটোতে মিলে একটা দেনা-পাওনা সম্বন্ধ। এখানকার প্রধান উদ্দেশ্য সকলে মিলে আত্মাকে সৃষ্টি করে তোলা; ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সৃষ্টি।"...(প্রাক্তনী, পৃ ১-২, ৬ই আগস্ট ১৯৩৪)

সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে; আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে তার সীমাটাই বেশি করে চোখে পড়ে; আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন বিষয়বস্তু, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন গুণ, ঋতুপ্রকৃতিরও কত ভিন্নতা; কিন্তু এই ভিন্নতারও বিপুল পরিচয় সব সময়ে সকলের কাছে সুলভ হয় না; এক জায়গায় কোনক্রমে সে পরিচয় যদি না মেলে, তখনও আরেকটি সত্য জানা বাকি থাকে। সে সত্য হচ্ছে বিরাট বৈচিত্র্যের নিরবচ্ছিন্ন সমগ্রতা। যেমন প্রকৃতিতে ও মানবজীবনে, তেমনি মানুষের পারিবারিক ও বিশ্বসামাজিক জীবনে সর্বত্রই যে এক সত্যের সূত্র বিস্তৃত থেকে আমাদের পরস্পরে সম্বন্ধ করে আছে, এইটি অনুভব করতেই যা-কিছু শিক্ষা ও সাধনার দরকার করে। ইতিপূর্বে পাশ্চাত্যভ্রমণের প্রাক্কালে "যাত্রার পূর্বপত্রে" কবি এই সত্য অনুভবের তাগিদই বিবৃত করেছেন। তার পরে প্রকৃতির মধ্য দিয়ে, বিষয় ও গুণের মধ্য দিয়ে, এবং মানুষ ও দেশের মধ্য দিয়ে বিচিত্র পথে

এক বিরাটকে দেখার আয়োজন করে কবি এতকাল যাদের নিয়ে তাঁর শিক্ষা ও সাধনার পরীক্ষায় রত ছিলেন, তাঁর হাতে-গড়া সেই প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে আশ্রমের শিক্ষার তাৎপর্যটির আরো বিশদ ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এ কথা তো সত্য যে, তোমরা যখন আশ্রমে ছিলে, দিনরাত্রি নানা বিচিত্র সুখ-দুঃখ ভোগ করেছ, ভাবী জীবনের কথা চিন্তা করেছ, এখানে তোমরা কেবল বই পড়োনি, সংগীতে উৎসবে জীবন এখানে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। তা'ছাড়া এখানে গ্রামের সেবার যে আয়োজন করা হয়েছে, তারও প্রভাব তোমাদের জীবনে পড়েছে। সব মিলে এখানে একটি সমগ্রতার আদর্শ জাগ্রত রয়েছে।

"বাইরে থেকে এখানে যাঁরা আসেন, তাঁরা আশ্রমের এই বিপুল সমগ্রতার রূপটি দেখতে পান না। যাঁর যেটাতে রুচি শুধু সেইটিই আংশিকভাবে দেখতে পান, চিত্রবিদ্যায় যাঁরা অনুরাগী তাঁরা সেই আয়োজনটিই দেখতে পান, যাঁরা গ্রামসেবায় উৎসাহী তাঁরা সেই ব্যবস্থাই লক্ষ্য করেন। কিন্তু এমন লোক অতি অল্পই দেখলুম যাঁরা এর সমগ্র রূপটি দেখতে পেয়েছেন, এখানে যে একটি প্রাণের বিকাশ স্বতঃই জেগে উঠেছে সেটি অনুভব করেছেন। এইটি দেখতে পান না বলেই তাঁরা যে সমালোচনা করেন তাও আংশিক।

"কিন্তু তাঁরা তো বাইরের লোক। দুঃখের বিষয় হবে, যারা এখানে মানুষ হয়েছে, তারা যদি এর বৃহত্তর রূপটি উপলব্ধি করতে না পারে। সকলের শক্তি সমান নয়, পরিপূর্ণ দৃষ্টি দুর্লভ, সে কথা আমি জানি।" (প্রাক্তনী, পৃ ৩-৪)

কবিকথিত এই পরিপূর্ণ দৃষ্টিলাভই এক কথায় শান্তিনিকেতনের শিক্ষার ফলশ্রুতি। সেখানকার জীবনে সংশ্লিষ্ট থেকে নিজের জীবনে এই দৃষ্টি-প্রদীপের স্পর্শ যিনি সংগ্রহ করে নিতে পারলেন, তিনি পরম বিদ্বান, গুণী বা কর্মীহিসাবে কৃতিত্ব লাভ করে বিখ্যাত হন আর না-ই হন, তাঁর মধ্যেই যে 'বিশ্বভারতী' প্রকাশমান এতে অন্যথা নেই। কবির এই পরিপূর্ণ দৃষ্টির মধ্যেই কালে কালে এসে মিলেছে এবং মিলবে প্রকৃতি ও মানুষ, প্রাচীন ও আধুনিক, তপোবন ও বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, গ্রাম ও শহর এবং তার শিক্ষিত ও সাধারণ সকলেই।

মাতৃস্তনের স্বাভাবিক জোগানে সন্তান বড়ো হয়ে উঠতে থাকে। আশ্রমবাসী শিক্ষার্থীকে বড় করে তোলবার পক্ষে বিশ্বভারতীর মাতৃস্তন্যস্বরূপ জিনিসটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র আয়োজনের জারক রস এই পরিপূর্ণ দৃষ্টি। দেখাশোনা, মেলামেশায় স্বাভাবিক জোগান পেয়ে যতটুকু এ দৃষ্টি খোলে—ততটুকুর জন্যই

এখানকার প্রতিদিনকার প্রতীক্ষা। 'মানস মুকুল' আগুনে ভেজে, তাড়াতাড়ি ফল 'ফলাবার আশা' এখানে প্রকট নয়। প্রণালী যদি বলতে হয় তবে, এই দেখানো শোনানো মেলামেশা করানো এবং এই দৃষ্টির আলোকের প্রতি ঔৎসুক্য বাড়ানোই এখানকার প্রণালী বলতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিধিতে এই দৃষ্টিলাভটি বড়ো কথা। তারপর, তার মধ্যে কখন কোন্ ধর্মভাব, কখন হাতের কাজের শিক্ষা বা সুকুমার শিল্পবৃত্তির প্রসারণ, কখন জনহিতসাধন, কখন যে আবার পাণ্ডিত্যের প্রতিপত্তি,— এমনি আরও কি সব কোথা থেকে এসে কদিন আসর জাঁকালে, বা কোন ফাঁকে তার কোন্‌টা অদৃশ্য হয়ে উবে গেল,—ইতিহাসের পক্ষে সে তথ্যের প্রয়োজন অবশ্যই থাকবে সন্দেহ নাই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের মাপকাঠি তাদের কোনটার উপরেই নির্ভর করে না। বলা যেতে পারে, অন্য অনেক বিষয় ও অন্যের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেও কবি কত-না শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন। তার মধ্যে মন্তেসরির শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেও কবির নির্দেশানুসারে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩১৮ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আলোচনা করেন। এ বিষয়ে এদেশে এ কাজটিকে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা যদি বা বলা না যায়, তবু সে আলোচনা যে সূত্রপাত পর্যায়ের অন্যতম রচনা তা স্বীকার করতে হবে। আমেরিকার মিস্ মার্থা বেরির বিদ্যালয় সম্বন্ধে কবির পাঠসঞ্চয় গ্রন্থের সংকলিত রচনাটিও তাঁর বৈদেশিক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতি সজাগ দৃষ্টির নিদর্শন। বৃটেন ও বেলজিয়ামের শিক্ষাপদ্ধতি তিনি আলোচনা করেছেন। গ্রন্থ পড়েছেন অনেক শিক্ষাবিদের। জাপানের যুযুৎসু শিক্ষাপদ্ধতি, ডেনমার্কের কারিগরিভিত্তিক শ্লয়েড পদ্ধতি শান্তিনিকেতনে স্থান পেয়েছে ; রাশিয়ার শিক্ষাপদ্ধতির আধুনিকরূপ কবি নিজে বৃদ্ধ বয়সে দেখে এসেছেন সাক্ষাৎভাবে।

রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়মুখী সর্বগৃধ্নু গতিশীল চিত্ত কোনো ধারার প্রতি জ্ঞানত উদাসীন থাকবে, এমন হবার কথা নয়। তার সহজাত স্বাঙ্গীকরণের চিত্তবৃত্তির বেগই গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের কর্ম-প্রণালীতে নানা সময়ে নানা পরিবর্তন এনেছে। শ্রীনিকেতনের কর্মপ্রধান শিক্ষা দেখে যেমন কেউ বলতে পারে এটা আমেরিকার আমদানি তেমনি শান্তিনিকতনের জ্ঞানপ্রধান বিবিধ সংস্কৃতি চর্চার বিচিত্র আয়োজন দেখে কেম্‌ব্রিজ-অক্সফোর্ডের অনুকরণও মনে না করতে পারে এমন নয়। আবার, মন্দির, বৈতালিক, উপাসনা, উৎসব-অনুষ্ঠানাদির সমারোহ ভক্তিবাদের জন্য দেশীয় কোন প্রাচীন ধারাকেও স্মরণ

করিয়ে দিতে পারে। মধ্যযুগীয় খৃষ্টীয় মঠধারীদের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে স্বয়ং কবিকথিত ভারতীয় নালন্দা বিক্রমশীলা বা টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষাপদ্ধতির উল্লেখ হওয়াও বা এমন বিচিত্র কি। যিনি যে ধারার ছাপ লাগিয়েই কবির শিক্ষাকে বিশেষিত করুন, সে কেবল তাঁর নিজেরই বিশেষ দৃষ্টির পরিচায়ক হবে মাত্র। কবির কথা যদি এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য হয় তবে সে কথা হচ্ছে এই,—"সামাজিক বিদ্যালয়ের পুরাতন শিকল এবং রাজকীয় বিদ্যালয়ের নূতন শিকল দুই-ই আমাদের মনকে যে পরিমাণে বাঁধিতেছে সে পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না। ইহাই আমাদের একমাত্র সমস্যা। নতুবা নতুন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্থ সহজ হইয়াছে বা অঙ্কক্ষা মনোরম হইয়াছে, সেটাকে আমি বিশেষ খাতির করিতে চাই না। কেন না, আমি জানি, আমরা যখন প্রাণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য শস্তা পথ খুঁজি। মনে করি, উপযুক্ত মানুষকে যখন নিয়মিতভাবে পাওয়া শক্ত তখন বাঁধা প্রাণালীর দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা যায় কিনা। মানুষ বারবার সেই চেষ্টা করিয়া বারবারই অকৃতকার্য হইয়াছে এবং বিপদে পড়িয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি না কেন শেষকালে এই অলঙ্ঘ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল, এবং চলনশীল মনই তাহাকে বুঝিতে পারে।...

"নানা শিক্ষকের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার স্রোতকে সচল করিয়া তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক সামগ্রী হইয়া উঠিবে।...'জাতীয়' নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোন একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানাভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই জাতীয় বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনেই হউক, যখন কোন একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোন ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে জাতীয় বলিতে পারিব না—তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।" (পথের সঞ্চয়, শিক্ষাবিধি, পৃ ১৮২-৮৪, ৩১৭)

বলতে গেলে, কবির মধ্যে অমরা 'যথার্থ শিক্ষকের দেখা' পেয়েছি, যাঁর শিক্ষাপ্রণালী তাঁর নিজেরই প্রেরণাজাত। সকল প্রণালীকে সম্ভবমতো সংগতি দান করে সর্বদিক দিয়ে 'পরিপূর্ণ দৃষ্টি'র প্রসার ঘটানোই সেই শিক্ষাপ্রণালীর

অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পূর্ণতার সাধক রবীন্দ্রনাথের এই কথা ক'টি বিশেষ করে কেবল তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদেরই নয়, আমাদের সকলের পক্ষেই স্মরণীয়: "পাখিরা যে বনস্পতির আশ্রয়ে থাকে, তার যে শাখায় তারা থাকে প্রধানত সেইটাকেই অনুভব করে, নিজ বাসাতেই তাদের দৃষ্টি আবদ্ধ। কিন্তু বনস্পতির যে বিচিত্রতা, ঋতুতে ঋতুতে তার যে বিকাশ তা তারা সম্পূর্ণভাবে দেখতে পায় না। মানুষের মধ্যেও এইরকম আছে, যেটুকু তাদের জীবনের আশ্রয় সেইটুকুতেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। আমাদের অনেক ছাত্র আশ্রমের সম্পূর্ণ রূপটি না দেখে চলে গিয়েছে। অবশ্য এ অপরিহার্য, সকলের শক্তি সমান নয়। আমি যখনি উপলক্ষ্য পেয়েছি তখনি জীবনের এই পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, জীবনের কোন বিশেষ ক্ষেত্রে চেষ্টাকে নিবদ্ধ করিনি।" (প্রাক্তনী, পৃ ৪-৫, ৬ই অগষ্ট ১৯৩৪)

শোনা যায়, শান্তিনিকেতনেরই জনৈক প্রাক্তন অধ্যাপককে একবার কবি তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে লিখেছিলেন,—আশ্রমের শিক্ষায় পশ্চিমের থেকে প্রণালী বিশেষ ধার করতে যেতে হবে কেন, ভারতবর্ষের কি নিজস্ব কোন শিক্ষাধারা নেই যা পরীক্ষা করা যেতে পারে?

. কবি তাঁর শিক্ষার মূলবাণী আলোচনায় বলছেন, "এই সত্য ভারতবর্ষের প্রাচীন মন্ত্রে উচ্চারিত হয়েছে। ঈশোপনিষৎ বলেছেন, আপন আত্মার মধ্যে সকল আত্মাকে এবং সকল আত্মার মধ্যেই নিজের আত্মাকে যিনি দেখেছেন 'ন ততো বিজুগুপ্সতে'—তিনি আর প্রচ্ছন্ন থাকেন না, তাঁর সত্য প্রকাশিত হয়।" (প্রাক্তনী, পৃ ৪৩, ৮ই পৌষ ১৩২৯) সুদীর্ঘকাল অন্তে পরিণত অভিজ্ঞতার শেষজীবনের "মানুষের ধর্মে"র ব্যাখ্যায় কবিকে বলতে শুনি, "আমার যে ব্যক্তিগত আমি তাকে ব্যাপ্ত করে আছে বিশ্বগত আমি।...যে আমি সকলের সেই আমিই আমারও, এটা সত্য কিন্তু এই সত্যকে আপন করাই মানুষের সাধনা। মানুষের ইতিহাসে চিরকাল এই সাধনাই নানারূপে নানা নামে নানা সংকল্পের মধ্যে দিয়ে চলছে। যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার বলে সকলের মধ্যে জানা যে পরিমাণে আমাদের জীবনে আমাদের সমাজে উপলব্ধ হচ্ছে সেই পরিমাণেই আমরা সত্য হয়ে উঠছি।" (মানুষের ধর্ম, ২০শে জানুয়ারি ১৯৩০, পৃ ৫৯) বিশ্বের বিবিধ জ্ঞান, কর্ম ও মানুষের সংশ্রবে ও পরিচয়ে এই সত্যকে কবি নিজে যেমন উপলব্ধি করেছিলেন সকলকে আহ্বানও করে গেছেন এই সত্যের সাধনাতেই। সে সাধনা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি নানা প্রণালী করছেন, 'নকল' করেননি, তাদের থেকে 'শিক্ষা' নিয়েছেন, এবং

প্রয়োজনমতো তাদের সহযোগে নিজের পরিপূর্ণ দৃষ্টির ধারাকেই পরিপুষ্ট করে আত্মাকে সকল আত্মার মধ্যে অনুভবের মূল আদর্শটি বরাবর অক্ষুণ্ণ রেখে গেছেন। সেখানে তিনি প্রাচ্য ও পৌরাণিক, আবার সেখানেই তিনি পাশ্চাত্য এবং আধুনিকও, আর মৌলিকও তিনি সেখানেই সকলের সমন্বয়ী হয়ে।

এখন কোন্ প্রোজেক্ট শান্তিনিকেতনে একটা ফল দেখিয়েছে, কজন নাম-করা লোক এখান থেকে বেরিয়েছে,—এ সকল তথ্যের উপরেই সাধারণের কাছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারার সার্থকতা নির্ভর করে থাকে। ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্র বা শিল্পকলায় সুপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদের সংখ্যা যদিবা কিছু মিলে—এখানকার কোন কোন 'ভবনে'র কাজ যদি সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য হয়ও, তবেও কি তা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার পরিচয় সত্যই দেওয়া চলবে?—নাও চলতে পারে; "পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে" কোনদিকে অভাব নিয়ে, দেখা যাবে রবীন্দ্রধারাবাহীর পরিচয় অনেকেরই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। প্রতিভায় সমুজ্জ্বল কিন্তু জীবনে অনুদার, আবার সহৃদয়তার স্নিগ্ধ কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির চর্চায় নিরুৎসুক,—কত রকমের লোকই না সেখানে থাকতে পারে! এই বিচিত্র মানবসংঘকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সর্বতোমুখী সমাজরচনার কাজ শুরু করেছেন, এও কবির অন্যতম কাব্যবিশেষ। যে একটি প্রেরণা এবং প্রণালীর ইঙ্গিত এর মধ্যে নিহিত আছে, তাঁর কাব্যব্যঞ্জনার মতোই তা বাস্তব বিশ্বে চিরদিন আলো বিকিরণ করবে। তার প্রভাব বিশেষ বিশেষ জীবনে না হলেও সাধারণ সমাজে, শান্তিনিকেতন ছাড়িয়ে সমস্ত দেশে, নিরন্তর হবে কার্যকরী।

—o—